University of Rajshahi Rajshahi-6205 Bangladesh.
RUCL Institutional Repository http://rulrepository.ru.ac.bd
Department of Islamic History & Culture MPhil Thesis

2003-07

Progression of Traditional and Modern Educational Institutions in Faridpur District, 1947-1984 AD.

Hossain, Md. Jahangir
University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1019
Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ, ১৯৪৭-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

ব্যাচ: জুলাই ২০০৩

রোল নম্বর- ৩০

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ মাহফুজুর রহমান

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জুন ২০০৮

উৎসর্গ

পিতা মরহুম মাওলানা আলী আকবর

ও

মাতা মোছাঃ নূরজাহানকে

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ, ১৯৪৭-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
এম. ফিল. গবেষক
ব্যাচ-জুলাই ২০০৩
রোল নং-৩০
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

প্রত্যয়ন পত্র

আমি আনন্দের সাথে প্রত্যয়ন করছি যে, **ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ, ১৯৪৭-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর একক ও নিজস্ব গবেষণার ফলশ্রুতি। আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, আমি অভিসন্দর্ভটি পড়েছি এবং এটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য জমা দেয়ার অনুমতি দান করছি।

২৭.৬.০৮

(ড. মোঃ মাহফুজুর রহমান)
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
এবং
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম মেহেরবানীতে এ অভিসন্দর্ভটি রচনা শেষ হওয়ায় আমি পরম করুণাময়ের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং লাখো কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি।

গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে একজন গবেষককে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানীগুণী ও পন্ডিতগণের পরামর্শ, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা অপরিহার্য। আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমিও অনেকের কাছে ঋণী। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে আমি পরমশ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দকে। শত ব্যস্ত তার মাঝেও তিনি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম থেকে শুরু করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহ ও তার সমন্বয় সাধন, মোটকথা গবেষণার সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণাকর্মটিকে মানসম্মত করার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। তাই আমি তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে যে সুমহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ না করলে অকৃতজ্ঞতার স্পর্ধা দেখানো হবে তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ বি এম হোসেন এবং প্রফসর ইমেরিটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী। তাঁরা আমার গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন ও গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়নসহ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানপূর্বক অভিসন্দর্ভের মান উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। অসাধারণ পান্ডিত্ব ও বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী আমার এই শিক্ষাগুরুর নিকট আমি চিরঋণী। সেই সাথে প্রাথমিক পর্বে গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনের জন্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তিনি এ গবেষণাকর্মে সম্পৃক্ত না থাকলে হয়তো এ কর্ম সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে; যিনি আমার গবেষণার বিষয়ে সুপরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেই সাথে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, প্রফেসর এম. এ. বারী, প্রফেসর ড. সুলতান আহমদ, প্রফেসর এ বি এম শাহজাহান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, প্রফেসর ড. মো. আজিজুল হক, প্রফসর ড. মোঃ ফজলুল হক, প্রফেসর ড. ফায়েকউজ্জামান, ড. মুন্সী মুঞ্জুরুল হক, ড. ইমতিয়াজ আহমেদসহ আমার বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী যারা গবেষণাকর্মটি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন

করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি বন্ধুবর ড. ফেরদৌস আলম ছিদ্দিকী; এম. ফিল গবেষক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম, এম. ফিল গবেষক প্রমুখকে। তারা আমার গবেষণার বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত করার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি নাজমা আখন্দকে; তিনি আমার গবেষণার বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেছেন। স্নেহের সাথে স্মরণ করছি ক্ষুদে সহযোগী নাশিত ও নাবিলকে; তাদের কম্পিউটার গেমস খেলা বন্ধ করে কম্পিউটারে কাজ করার সুযোগ দেয়।

সেই সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বোর্ডের উপ-সচিব ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ফিরোজ, ড. মাসুদ রেজা, মসজিদ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুস সামাদ, ফরিদপুর মহাবিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রউফ খান, ফরিদপুর সরকারী রাজেন্দ্র কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবুল বাসার মোঃ আব্দুল বাতেন মিয়া, জনাব খালেদুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, সরকারী সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ; ফরিদপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক ও আমার সহকর্মী শেখ নুরুল ইসলাম, মোঃ আবু তালিব মিয়া, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আহসান হাবিব, মোঃ রেজাউল করিম মাসুদ, মোঃ আফসার উদ্দীন, মোঃ আনিসুর রহমান, মোঃ জাহিদ হাসান, মোঃ আব্দুল ওহাব প্রমুখ। তাঁরা ফরিদপুর জেলার শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছেন। এজন্য আমি তাদের কাছে ঋণী।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে আমি বহু গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এগুলোর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, আইবিএস গ্রন্থাগার, বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, রাজশাহী ও ফরিদপুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ফরিদপুর পাবিলক লাইব্রেরী, ফরিদপুর শেরে-ই-বাংলা পাঠাগার, সরকারী রাজেন্দ্র কলেজ লাইবেরী, ফরিদপুর জেলা স্কুল লাইব্রেরী, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ লাইব্রেরী, সরকারী ইয়াসীন কলেজ লাইব্রেরী, ফরিদপুর কোর্ট লাইব্রেরীসহ ফরিদপুর জেলা রেকর্ড রুম, ফরিদপুর পৌরসভা রেকর্ড রুম, ফরিদপুর জর্জকোর্ট ও ফৌজদারী কোর্ট রেকর্ড রুম, ঢাকা ন্যাশনাল আর্কাইভস, মাদারীপুর জেলা স্কুল লাইব্রেরী, মাদারীপুর সরকারী নাজিমুদ্দীন কলেজ লাইব্রেরী, গোপালগঞ্জ জেলা স্কুল লাইব্রেরী, গোপালগঞ্জ এস.কে. কলেজ লাইব্রেরী, রাজবাড়ী সরকারী কলেজ লাইব্রেরী, রাজবাড়ী শিক্ষা অফিস, রাজবাড়ী জেলা স্কুল লাইব্রেরী, ফরিদপুর জেলা শিক্ষা অফিস, মাদারীপুর জেলা শিক্ষা অফিস, শরিয়তপুর জেলা শিক্ষা অফিস, শরিয়তপুর সরকারী কলেজ লাইব্রেরী, গোপালগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিস। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও দলিল পত্রাদির সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি। এ সকল প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ফরিদপুর মহাবিদ্যালয় এবং কলেজের গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দের প্রতি। তারা এক বছর শিক্ষা ছুটি ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা আলী আকবর ও মাতা মোছাঃ নুরজাহান বেগমের অপরিমেয় স্নেহ-ভালবাসা, অফুরন্ত উৎসাহ এবং অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়েই আজ আমি এই পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছি। আমি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্বশুর মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া ও শাশুড়ী মোছাঃ হাজেরা বেগমকে; গবেষণা কাজে অফুরন্ত উৎসাহ ও সুপরামর্শ দান করেছেন। আমার স্নেহের ছোট ভাই মোঃ আলমগীর হোসেন, হুমায়ন কবির এবং স্নেহের ছোট বোন বিউটি ও সুইটিসহ আমার পরিবারের সকল সদস্য ও নিকট আত্মীয় স্বজনদের সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি তাদের নিকট ঋণী।

আমার ঋণ স্বীকারোক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমি আমার স্ত্রী জাহানারা আক্তার লিপির (প্রভাষক, কম্পিউটরি শিক্ষা, গেরদা ইসলামী একাডেমী ম্যানেজমেন্ট ও টেকনিক্যাল কলেজ, ফরিদপুর) কথা স্মরণ না করি। সে সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে অসীম উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আল-আক্‌সা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটারস-এর পরিচালক ও সিটি কম্পিউটার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এ্যাণ্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর প্রভাষক শহীদুল ইসলাম, এবং কম্পোজিটর মোঃ এনামুল হক অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে এ অভিসন্দর্ভের কম্পোজ ও মুদ্রণ সম্পন্ন করায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে সুস্থ্য শরীরে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি পরম করুনাময় আল্লাহ্ পাকের নিকট আরও শুকরিয়া আদায় করছি।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন

শব্দ সংক্ষেপ সূচী

অ	=	অনুদিত
আ	=	আনুমানিক
খ	=	খণ্ড
খ্রী	=	খ্রিষ্টাব্দ
দ্র	=	দ্রষ্টব্য
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বাসা	=	বাংলা সাল
ব	=	বঙ্গাব্দ
মৃ	=	মৃত
সম্পা	=	সম্পাদিত
সং	=	সংস্করণ
ডঃ	=	ডক্টর
রাঃবিঃ	=	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
AD	=	After death
BGF	=	Bangladesh District Gazetteer Faridpur
BSR	=	Bangladesh Secretariat Records
JASP	=	Journal of the Asiatic Society of Bangladesh
OIC	=	Organization of Islamic conference.
PC	=	Political Consultation
PTI	=	Primary Training Institute
SDO	=	Shador Subdivision Office
ed	=	Edition
P	=	Page
Pub	=	Publisher/Publication

সূচীপত্র

ঘোষণাপত্র i

প্রত্যয়ন পত্র ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

শব্দ সংক্ষেপ vi

সূচীপত্র vii

প্রথম অধ্যায়: উপক্রমণিকা ১-৮

১.১ ভূমিকা ২

১.২ গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য ৪

১.৩ গবেষণাকর্মের পরিধি ৫

১.৪ যৌক্তিকতা ৫

১.৫ প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পর্যালোচনা ৬

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ৭

১.৮ অধ্যায় বিন্যাস ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: ফরিদপুরের ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯-২৯

২.১ নামকরণ ১০

২.২ ভৌগোলিক অবস্থান ১২

২.৩ আয়তন ১৪

২.৪ নদ-নদী ১৪

২.৫ জাতিসত্তা ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১৫

২.৬ জনসংখ্যা ১৬

২.৭ উৎপাদিত শস্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য ১৭

২.৯ ফরিদপুরে ইসলাম ১৯

তৃতীয় অধ্যায় : ফরিদপুর জেলার উল্লেখপূর্বক বাংলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ৩০-৫৭

৩.১ ভূমিকা ৩১

৩.২ বাংলার সনাতন শিক্ষা ৩১

৩.৩ বাংলার আধুনিক শিক্ষা 33
৩.৪ ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষা ৪৫
৩.৫ ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষা..........৪৯
চতুর্থ অধ্যায় : নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিকাশ ঃ পরিচিতি ও পর্যালোচনা .. ৫৮-১৯০
৪.১ ভূমিকা ৫৯
৪.২ সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি ৫৯
৪.৩ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১২৭
৫ম অধ্যায় : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব ১৯১-২০৬
৫.১ ভূমিকা ১৯২
৫.২ শিক্ষা ও সমাজ প্রসঙ্গ..........১৯৫
৫.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা ১৯৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার ২০৭-২১৪
গ্রন্থপঞ্জি ২১৫-২২৬
পরিশিষ্ট: মানচিত্র ২২৭-২৩৩

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

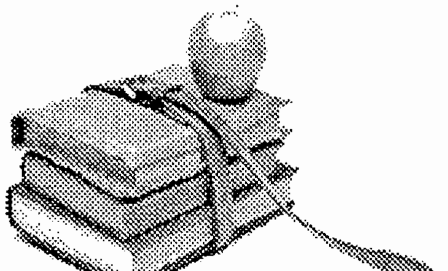

ভূমিকা

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হলে বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল পূর্ববাংলা নামে অভিহিত হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। এ সময়ই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত হয়। ফরিদপুর অঞ্চলটি বাংলার একটি প্রাচীনতম জনপদ। এ জনপদের নাম বঙ্গ। স্বাধীনতা উত্তর ফরিদপুর জেলাটি- ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জসহ মোট ৫টি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে এক অধ্যাদেশ বলে মহাকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করেন। বর্তমান ফরিদপুরসহ রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর নামে মোট ৫টি জেলা গঠিত হয়।

বঙ্গোপসাগর থেকে জেগে ওঠা এ ভূখণ্ডে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ দিকে জনবসতি এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। আজকের ফরিদপুর পূর্বে *বকদ্বীপ, ধলেশ্বর পরগণা, ভূষণা পরগণা, মোজাফফরাবাদ, জালালপুর, ফতেহাবাদ* প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মণাবতীর শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি) নামানুসারে ফতেহাবাদ নামকরণ করা হয়। সুলতানী আমলে ৮২১ হিজরীতে ফতেহাবাদ টাকশালকে কেন্দ্র করে ফতেহাবাদ একটি জনপদে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে অত্র এলাকার বিশিষ্ট অলী শেখ ফরিদউদ্দীন মাসউদ বা শেখ ফরিদ এর নামানুসারে *ফতেহাবাদ* থেকে *ফরিদপুর* নামকরণ করা হয়।

দেহ, মন ও আত্মা এ তিনটি সত্ত্বার সমন্বয়ে মানুষের অস্তিত্ব । মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে। নানা সামাজিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার মন বেড়ে ওঠে। আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতা পরিগঠনের উপর। এজন্যই বলা হয় শিক্ষাই মানুষ গড়ার সর্বোত্তম পন্থা। বর্তমান বাংলাদেশে এ শিক্ষা পদ্ধতিকে দু'ভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একটি সনাতন ও অন্যটি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি।

সনাতন শিক্ষা বলতে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা, প্রাচীন শিক্ষা বা আদি শিক্ষাকে বুঝায়। আদি শিক্ষার প্রধান স্থান হচ্ছে মসজিদ বা উপাসনাগৃহ। হযরত আদম (আ:) দুনিয়াতে এসেই সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ বা কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। এটি ছিল মানব জাতির প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স:) সর্বপ্রথম ওহীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রথমে গোপনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং

পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। মহানবী (স:) মক্কায় অবস্থানকালে সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত *দারুল আরকাম* নামে প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ক্রমান্বয়ে *মসজিদ-ই-বনি যুরায়েখ, মোকামে কুবা মসজিদ, মসজিদ-ই নববী, মসজিদ-ই-নাকিমুল খাজামাত*সহ বিভিন্ন মসজিদে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। হিজরত উত্তর মহানবী (স:) স্বয়ং মসজিদে নববীতে সাহাবীগণকে শিক্ষা দান করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আসহাবে রাসূল (স:), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুজতাহিদীনসহ ইসলাম প্রচারকগণ মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ও দাওয়াতি কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করেছেন। *দারুল আরকাম* মসজিদটি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে মক্কায় অবস্থিত। এ মসজিদটি ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক মসজিদভিত্তিক মাদরাসা। এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত আরকাম বিন আবুল আরকাম। রাসুল (সা) নিজেই এ মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলেও মসজিদকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার প্রসার ঘটে। এ মসজিদসমূহে পবিত্র কুরআন হাদীসের চর্চা হতো। এমনকি হযরত ওমরের (রা:) শাসনামলে আল কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরবী কবিতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তার সময় থেকেই মসজিদভিত্তিক এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে বায়তুলমাল থেকে ভাতা প্রদানের প্রচলন হয়। অতঃপর হযরত আলীর (রা:) শাসনামলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কুরআন, হাদীস, দর্শন, আরবী, ব্যাকরণ, ইতিহাস, কাব্য ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এমনকি খলিফা নিজেই সপ্তাহে একদিন উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন।

উমাইয়া আমলের খলিফাগণও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামী বিষয়াদি পঠন-পাঠনের জন্য তারা উদার নীতি গ্রহণ করেন। সে সময় শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি রূপ ছিল- খলিফা ও আভিজাত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা- যেটি ছিল মূলত গৃহভিত্তিক এবং সাধারণ শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা- যেটি মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন মকতবভিত্তিক। আব্বাসীয় খলিফাগণও রাজ্য শাসন ও রাজ্য জয় অপেক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এজন্য এযুগকে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত *বায়তুল হিকমাহ* ছিল। একাধারে শিক্ষায়তন, পাঠাগার, অনুবাদ ও গবেষণাকেন্দ্র।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে সুলতানী ও মোগল আমলেও মূলত সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা হয়। এ সময় সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সহায়তার অভাবে ক্রমশ সমস্যা সংকুল হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রাখে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও এ অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার তুলনায় সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সুযোগ সুবিধা কম পেয়েছে। এ গবেষণাকর্মে ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষা বলতে মসজিদভিত্তিক ফোরকানিয়া মাদরাসা, টোল, খানকা, চতুস্পাঠি, কওমী মাদরাসা ও আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফরিদপুরের ৫টি জেলা থেকে উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত সংখ্যক কওমী মাদরাসা, মসজিদভিত্তিক ফোরকানিয়া মাদরাসা ও আলিয়া মাদরাসাকে আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে। উল্লেখ্য যে টোল, খানকা, জাতীয় প্রতিষ্ঠান বতর্মানে প্রচলিত না থাকায় সেগুলো শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান হিসেবে আলোচনার আওতাভূক্ত থাকবে না।

আধুনিক শিক্ষা বলতে বর্তমানে প্রচলিত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝায়। আধুনিক শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ১৭১৯ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করে কলকাতায় *The Society for Promoting Christing Knowledge* নামক খ্রিস্টান মিশনারী সমিতি। অতঃপর সময়ের গতিময়তায় বাংলায় আধুনিক শিক্ষা পর্যায়ক্রম শুরু হয়। এ গবেষণাকর্মে ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে আধুনিককালের স্কুল কলেজকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। যথাক্রমে, ফরিদপুর সরকারী জেলা স্কুল, রাজবাড়ী সরকারী জেলা স্কুল, মাদারীপুর সরকারী জেলা স্কুল, শরীয়তপুর সরকারী জেলা স্কুল, গোপালগঞ্জ সরকারী জেলা স্কুল, গোপালগঞ্জ এ এস কে কলেজ, ফরিদপুর সরকারী রাজেন্দ্র কলেজ, মাদারীপুর সরকারী নাজিমউদ্দিন কলেজ, রাজবাড়ী সরকারী কলেজ, সরকারী ইয়াছিন কলেজ ফরিদপুর, সরকারী সারদা সুন্দরী কলেজ ফরিদপুর।

১.২ গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য

১. সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার বিবরণসহ ফরিদপুর জেলার শিক্ষা সংস্কৃতির পরিচয় উপস্থাপন করা।
২. ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় উপস্থাপন করা।

৩. উপরিউক্ত দু'টি পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ফরিদপুর অঞ্চলে বিদ্যোৎসাহী সমাজের বিকাশসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা।

১.৩ গবেষণাকর্মের পরিধি

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে ফরিদপুর জেলার (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী জেলাসমূহ যথা- রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও ফরিদপুর) সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

১.৪ যৌক্তিকতা

শিরোনামে উল্লিখিত গবেষণাকর্মের যৌক্তিকতা নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথমত: বাংলাদেশের অন্যতম একটি জেলা ফরিদপুর। স্থানীয় ইতিহাসের নিরিখে এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে এ অঞ্চলের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অত্র এলাকার একজন নাগরিক এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একজন ছাত্র হিসেবে 'ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ, ১৯৪৭- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ' শিরোনামের উপর গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত মসজিদ, মকতব, মাদরাসা ও টোল কেন্দ্রীক। এছাড়া স্থানীয় বহুস্থানে পাঠশালা ও গুরুগৃহে শিক্ষা দেওয়া হতো। সনাতন শিক্ষার এ গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। এ জন্য ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষা সম্পর্কে ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন শিক্ষার উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করে এ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রণয়ন করা ইতিহাস গবেষণার একটি মৌলিক কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে অত্যাধুনিক ও উন্নত মনে হলেও সূচনাকালে একে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এ ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। একজন ইতিহাস সচেতন নাগরিক হিসেবে এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। সর্বোপরি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলাকে ৫টি জেলায় বিভক্তি করার কারণে এ গবেষণার সূচনাকাল ১৯৪৭ এবং সমাপ্তিকাল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দকে নির্ধারণ করা হয়েছে। অত্র

বিষয়ের গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলে এ অঞ্চলের সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার মানসম্মত ইতিহাস লিখিত হবে বলে মনে করা হয়েছে।

১.৫ প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পর্যালোচনা

সনাতন ও আধুনিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা মাধ্যমে তার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো-

Dr. A.K.M. Ayyub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983). এটি সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার উপর একটি প্রামান্য গ্রন্থ। এতে ইসলামী শিক্ষা কখন থেকে শুরু হয়েছে, ইসলামী শিক্ষার পদ্ধতি, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণসহ বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু অত্র গ্রন্থে ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা বিষয়ে কোন আলোচনা সন্নিবেশিত হয়নি।

আনম আব্দুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস* (ফরিদপুরঃ সূর্যমুখী প্রকাশনী, ১৯৯৪); এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ফরিদপুর জেলার ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, নদনদী, বাংলায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন বিশেষ করে ওহাবী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন, আলীগড় আন্দোলন এবং ফরিদপুর জেলার শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও সেখানে এ জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের উপর কোন আলোচনা করা হয়নি।

আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩); এ গ্রন্থটিতে যুগে যুগে ফরিদপুর, ইসলাম পূর্ব যুগে ফরিদপুর, ফরিদপুরের মুসলিম রাজত্ব, খানকা ও খানকার শিক্ষা এবং মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটিতে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার হয়নি। এছাড়া ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা করা হয়নি।

মনোয়ার হোসেন, ঐতিহ্য লালিত ফরিদপুর, (ফরিদপুরঃ মিডিয়া সেন্টার, ২০০০); এ গ্রন্থটিতে ফরিদপুর জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাজবাড়ী জেলার ইতিহাস, গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস, মাদারীপুর জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নদনদী, ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান, ফরিদপুরের লোক সাহিত্য, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

এছাড়াও আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস* (ঢাকা: সাহিত্য শেখর, ১৯৮০); আবদুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলার ইতিহাস পরিচিতি* (মাদারীপুর: মিসেস লীনা জব্বার, ১৯৯৪); আবুল হোসেন ভুঁইয়া, *গোপালগঞ্জ শহরের ইতিকথা* (গোপালগঞ্জ; ভুইয়ালজ, ১৯৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ও ফরিদপুর জেলার ইতিহাস সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থসমূহ ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রণীত হয়নি এবং কাল বিভাজনের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টতা লক্ষ্যনীয় নয়।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাকর্মে দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যথা- সরেজমিন গবেষণা পদ্ধতি (Empirical Research Methods) এবং ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Methods).

প্রথমত: ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণী সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এ গবেষণাকর্মে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের উপরই বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাংলা ও ইংরেজী বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। এ সমস্ত সহায়ক গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারী নথিপত্র হতে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর সেগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মের অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ গবেষণাকর্মে প্রাথমিক (Primary) ও গৌণ (Secondary) উভয় ধরনের উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস বলতে ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া পত্রপত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বার্ষিকীর রিপোর্ট ও সমকালীন প্রবন্ধ-নিবন্ধকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গৌণ উৎস বলতে সনাতন ও আধুনিক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রনীত গ্রন্থসমূহ এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে (Journal) প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহকে গণ্য করা হয়েছে। সর্বোপরি সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার সমর্থিত তথ্যাবলী দিয়ে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপনযোগ্য অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৭ অধ্যায় বিন্যাস

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

এতে গবেষণাকর্মের বিষয় পরিচিতি, যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি ও বিষয়ের সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী পরিচিতি

এ অধ্যায়ে ফরিদপুর জেলার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি, ভৌগলিক অবস্থান, নামকরণ, সীমানা, নদনদী, জনসংখ্যা, উৎপাদিত শস্য ও ফসলাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জাতিসত্ত্বা ও নৃতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: ফরিদপুর জেলার উল্লেখপূর্বক বাংলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

এ অধ্যায়ে বাংলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ এবং প্রাসঙ্গিকতায় ফরিদপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

এ অধ্যায়ে ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে নির্বাচিত কওমী, ফোরকানিয়া ও আলিয়া মাদরাসা এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি স্কুল ও কলেজকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব

সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি অন্বেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার

এ গবেষণাকর্মের প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ফরিদপুরের সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার ফলাফল সম্পর্কে একটি অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূ-খণ্ড ও জনগোষ্ঠী : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

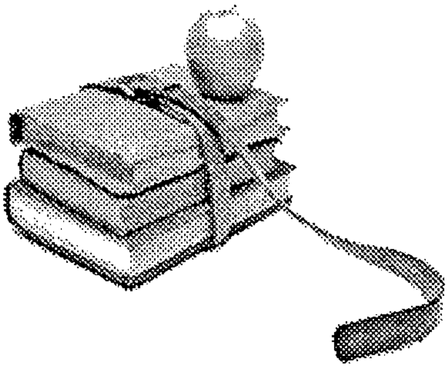

বাংলাদেশের বৃহত্তর ১৯টি জেলার মধ্যে ফরিদপুর জেলা অন্যতম। বাংলাদেশের মধ্যবর্তী স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ২৬৯৪ বর্গমাইল জুড়ে এ জেলাটি অবস্থিত।[১] ফরিদপুর জেলার পশ্চিমে কুষ্টিয়া, যশোর, বাগেরহাট জেলা এবং দক্ষিণে বরিশাল ও পিরোজপুর জেলা অবস্থিত। পূর্বে কুমিল্লা, চাঁদপুর, উত্তরে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলা। এ জেলায় পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি, গড়াই, কুমার, আড়িয়ালখাঁ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ জেলার ভূমি পলি, দোআঁশ ও কাদামাটি দ্বারা গঠিত।[২]

২.১ নামকরণ

ফরিদপুর জেলার পূর্ব নাম *ফতেহাবাদ*। *ফরিদপুর* নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৬৪ সালের ১৬ অক্টোবর নওয়াব শায়েস্তা খাঁর রাজমহল থেকে ঢাকা আগমনের বর্ণনায়।[৩] ফতেহ্ আলী শাহ্ এর উদ্যোগে এ অঞ্চলে বন জঙ্গল কেটে অনাবাদী জমিগুলোকে আবাদী ও বসতির উপযোগী করে তোলা হয়। এ জনপদ প্রতিষ্ঠার স্মৃতি স্বরুপ স্থানীয়ভাবে এ অঞ্চলের নাম হয় *ফতেহাবাদ*।[৪]

সুলতানী আমলে সর্বপ্রথম জালালুদ্দিন আবুল মুজাফফর ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে ফতেহাবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলা সম্পর্কে অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শাহ্ শেখ ফরিদউদ্দিন (রহ.) এ অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।[৫] এ উদ্দেশ্যে তিনি বর্তমান জেলা শহরের কালেক্টর ভবনের কাছে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাম অনুসারে স্থানের নাম ফরিদপুর বলে অনুমান করা হয়। জেলা গঠনের সময় ফরিদপুর নামকেই জেলার নাম রাখা হয় ফরিদপুর জেলা।[৬]

উল্লেখ্য, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য অঞ্চলসমূহের (যা পরবর্তীতে জেলায় রুপান্ত রিত হয়েছে) নামকরণও উল্লেখ করা হল।

---

[১] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur* (Dhaka: Bangladesh Government Press, 1977), p. 1.

[২] আ ন ম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস* (ফরিদপুরঃ সূর্য প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৪; শ্রী আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলিকাতাঃ ২১০/৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, নব্য ভারত প্রেস ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১।

[৩]. মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃঃ ১৫-; আনম আবদুস সোবাহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১।

[৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃঃ ৫০৭; Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur*, P. 1.

[৫] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া*, খন্ড ৬, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃঃ ১১৯; শ্রী আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩; *গণমন সাহিত্য পত্রিকা*, একাদশ বর্ষ, ফরিদপুর, ১৯৭৭; পৃঃ ৩৫।

[৬] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪ তম খন্ড, পৃঃ ৫০৭।

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No....D-2971
Date....12:8:09.....

রাজবাড়ী

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বর্তমান রাজবাড়ী জেলার সাবেক মহকুমা, গোয়ালন্দ ঘাট মহকুমা হিসেবে যশোর জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। এক সময় গোয়ালন্দ মহকুমার পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানা পাবনা জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের পর গোয়ালন্দ মহকুমা থাকলেও সব অফিস আদালত ছিল রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ী অঞ্চলে রাজা সূর্যকুমার বসবাস করতেন বলে জানা যায়। আনুমানিক রাজা সূর্যকুমারের নামানুসারে রাজবাড়ী নামকরণ করা হয়।[৭] গোয়ালন্দ পরবর্তীতে প্রশাসকের সদর সাবডিবিশন (এসডি) অফিস রাজবাড়ীর নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত হয়। সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীয় নীতির আওতায় মহকুমাসমূহকে জেলা ঘোষণার সময় রাজবাড়ী থানাও জেলায় পরিণত হয়।[৮] বর্তমানে রাজবাড়ী জেলায় ৪টি থানা রয়েছে। যথা-রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা ও বালিয়া কান্দি।[৯]

মাদারীপুর

মাদারীপুর ১৮৫৪ সালের ২ নভেম্বর মাদারীপুর মহকুমা সৃষ্টি করে বাখেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮৭৫ সালে মাদারীপুর মহকুমা বাখেরগঞ্জ হতে ফরিদপুর জেলায় যুক্ত হয়। শাহ মাদার হযরত বদীউদ্দীন (রহ) এর নামানুসারে মাদারীপুর অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে বলে অনুমিত হয়। তিনি একজন কামেল অলী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মে বিশ্বাসী লোকজন তার ভক্ত হিসেবে ছিল।[১০] অতঃপর ফরিদপুর জেলার এ অঞ্চলের নাম মাদারীপুর রেখে সকল সম্প্রদায়ের

---

[৭] **রাজা সূর্যকুমারঃ** তিনি রাজবাড়ী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা সূর্যকুমার একজন জমিদার ছিলেন। রাজার পিতার নাম ছিল দিগেন্দ্র প্রসাদ। তিনিও জমিদার ছিলেন। রাজা সূর্যকুমার ১৮৮৫ সালে জনহিতকর কাজের জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। মতান্তরে রাজার নামানুসারে রাজবাড়ী জেলার নামকরণ করা হয়। দ্রঃ শ্রী আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, (ঢাকাঃ গতিধারা, ২০০৭), পৃঃ ৩৪৫; মোঃ আবদুস সাত্তার, ফুরিদপুরে ইসলাম, পৃঃ ৭; আনম আবদুস সোবাহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ৩; Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur*, P. 51-52.

[৮] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফুরিদপুরে ইসলাম*, পৃঃ ৭।

[৯] *তদেব*, পৃঃ ৭, মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর* (ফরিদপুর :ফরিদপুর মিডিয়া সেন্টার, ২০০০), পৃঃ ৬২; মোঃ আকরাম হোসেন, *মাদারীপুর দর্পণ* (মাদারীপুরঃ জেলা প্রশাসক, ২০০৬), পৃঃ ১৪; আবদুল জাব্বার, *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি*, (মাদারীপুরঃ মিসেস লিনা জাব্বার, মাদারীপুর, ১৯৯৪), পৃঃ৫।

[১০] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃঃ ৭; মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃঃ ৬১।

লোক আপন মুর্শিদের রুহানী দোয়ার প্রত্যাশী হন।[১১] বর্তমানে মাদারীপুর জেলার ৪টি থানা রয়েছে। যথা- মাদারীপুর সদর, রাজৈর, শিবচর ও কালকিনি।

শরিয়তপুর

১৯৭৭ সালের ৩ নভেম্বর মাদারীপুর মহকুমার পালং, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, জাজিরা, গোসাইহাট ও ডামুড্যা থানাকে পৃথক করে শরীয়তপুর নামে একটি নতুন মহকুমা গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ দেশের প্রতিটি মহকুমা জেলায় উন্নিত হয়।[১২] ফারায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহর নামানুসারে শরীয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়।[১৩]

গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ ঊনবিংশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত এটি মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯০৯ সালে মকসুদপুর, কাশিয়ানি, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর থানাকে নিয়ে প্রথম গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়।[১৪] গোপালগঞ্জ অঞ্চলের পূর্বনাম ছিল রাজগঞ্জ বাজার। অনুমান করা হয় যে, গোপালগঞ্জ এলাকা মুকীমপুর ষ্টেটের এলাকা ছিল।[১৫] উক্ত ষ্টেটের জমিদার ছিলেন রাণী রাশমনি। রাণী রাশমনির এক নাতির নাম ছিল নবগোপাল। নাতির নামের গোপাল আর রাজগঞ্জের শেষের শব্দ সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ নামকরণ করা হয়েছিল।[১৬] ১৯৮৪ সালে সরকার মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করলে এটি জেলার মর্যাদা লাভ করে।

২.২ ভৌগোলিক অবস্থান

১৭৬৫ সালে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা একটি প্রদেশ রূপে প্রকাশ হলে ফরিদপুর জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ রাজশাহী জমিদারভুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ

---

[১১] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*,পৃ: ৭; মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ ২৭-২৮।

[১২] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*,পৃ: ৭-৮; মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ: ২৯। আবদুস সোবাহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃ: ২।

[১৩] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*,পৃ: ৮, মোঃ মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ: ২৯-৩১।

[১৪] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ: ৮, মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*,পৃ: ৩১।

[১৫] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ: ৮।

[১৬] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ: ৩৪; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ: ৭-৮।

ঢাকা নায়েবের অন্তর্ভূক্ত হয়।[১৭] ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জের অংশবিশেষ যশোরের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ফরিদপুরের অবশিষ্ট অংশ ঢাকা জালালপুরের অন্তর্ভূক্ত হয়।[১৮] ১৮০৭ সালে ঢাকার জালালপুর ফরিদপুরের অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৮৫০ সালে লর্ড ডালহৌসি ঢাকা জেলাকে ভেঙ্গে ফরিদপুর জেলা সৃষ্টি করেন। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা গঠনের সময় পাবনা থেকে পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানাকে অত্র মহকুমার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[১৯] ১৮৭৩ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে পৃথক করে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[২০] ১৯৬০ সালে মধুমতি নদীর পরিবর্তনের কারণে যশোর জেলার মাগুরা থানার অংশ এবং নড়াইল মহকুমা আলফাডাঙ্গা থানাকে যশোর জেলা থেকে পৃথক করে ফরিদপুর সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালের পরে গঠন করা হয় দু'টি নতুন থানা ড্যামুডা (মাদারীপুর) ও টুঙ্গীপাড়া (গোপালগঞ্জ)।[২১]

১৯৭৭ সালে ৪ নভেম্বর মাদারীপুর মহকুমা পালং, জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, ডামুডা এবং গোসাইরহাট থানাকে পৃথক করে শরিয়তপুর নামে একটি নতুন মহকুমা গঠন করা হয়।[২২] ১৯৮৩ সালে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি থানাকে মান উন্নয়ন করে উপজেলায় রূপান্তরিত করেন।[২৩] এবং ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ দেশের প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় পরিণত করেন। এ প্রেক্ষিতে ফরিদপুরের ৫টি মহকুমা ৫টি জেলায় পরিণত হয়। এগুলো হলো- ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও গোপালগঞ্জ। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ২৭টি থানা ৩০৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ছিল। ফরিদপুর (বৃহত্তম ফরিদপুর) ২২.৪৫ ডিগ্রী থেকে

---

[১৭] আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১।

[১৮] *তদেব;* Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 1.

[১৯] আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১; Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur*, P. 1.

[২০] আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১; Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur*, P. 2.

[২১] আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১; Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur*, P. 2.

[২২] আ ন ম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ২।

[২৩] *তদেব।*

২৩.৫৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.১৫ ডিগ্রী থেকে ৯০.৪০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ফরিদপুরের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৬ ফুট।[২৪]

২.৩ আয়তন

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার (আধুনিক জেলার ভিত্তিতে) আয়তন নিম্নরূপঃ

১। ফরিদপুর	ঃ	২০৭২.৭২ বর্গ কিঃমি
২। রাজবাড়ী	ঃ	১১১৮.৭৮ বর্গ কিঃমি
৩। গোপালগঞ্জ	ঃ	১৪৮৯.৯২ বর্গ কিঃমি
৪। মাদারীপুর	ঃ	১১৪৪.৯৭ বর্গ কিঃমি
৫। শরিয়তপুর	ঃ	১১৮১.৩৫ বর্গ কিঃমি

সুতরাং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মোট আয়তন ৭০০৭.৭৪ বর্গ কিঃ মিঃ[২৫]

২.৪ নদনদী

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, মধুমতি, গড়াই, কুমারনদী, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি নদনদী বিধৌত জেলা ফরিদপুর। এ জেলার উত্তর ও পূর্বে পদ্মা এবং পূর্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপূত্র নদী অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্বে মেঘনা, বাখেরগঞ্জ থেকে পশ্চিমে গড়াই, বারাসিয়া ও মধুমতি নদী এ জেলাকে খুলনা ও যশোর থেকে আলাদা করে রেখেছে।[২৬]

ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য নদীসমূহের অন্যতম পদ্মা। এটি গঙ্গার প্রধান ধারা প্রাচীন গৌড় নগরীর প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে ভাগীরথি আর বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত।[২৭] এ পদ্মা নদীটি ভারত থেকে রাজশাহী হয়ে দৌলতপুর থানার পশ্চিম অংশ দিয়ে কুষ্টিয়া ও কুমারখালী

---

[২৪] Nurul Islam khan, *Bangladesh District Gazetteers, Faridpur*, P. 1-2; আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ৩।

[২৫] বাংলাদেশ আদমশুমারী, ১৯৯১; ইউনিয়ন পরিসংখ্যান, ডিসেম্বর, ১৯৯৩; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৯১; বেনবেইস শিক্ষা মন্ত্রানালয় বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২; ফরিদপুর মানচিত্র, বৃহত্তম ফরিদপুরের তথ্যভিত্তিক মাসিক ম্যাগাজিন, জানুয়ারী, ১৯৯৮, পৃঃ ৪-৬।

[২৬] আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১৩।

[২৭] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃঃ ৪৯ ।

পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ছিল। কুষ্টিয়া হয়ে পাবনার দক্ষিণ অংশ ছুয়ে বর্তমানে গোয়ালন্দ থানার দৌলতদিয়া ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, গোয়ালন্দে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।[২৮]

ফরিদপুর জেলার সদর থানার পাশে পদ্মার শাখা থেকে সৃষ্ট আড়িয়াল খাঁ ফরিদপুরের আরেকটি নদী।[২৯] এটি ভাংগা থানা হয়ে মাদারীপুর জেলার মধ্যদিয়ে বরিশালের সাবেক বাকেরগঞ্জে গিয়ে মিশেছে।[৩০] এটি ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন নামে প্রবাহিত হয়েছে। রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার নিকট উহা চন্দনা ভূবনেশ্বর, শরীয়তপুরের নিকট মরা পদ্মা, মাদারীপুরের দক্ষিণাংশে নয়াভোংগনী নামে পরিচিত। গড়াই নদী কুষ্টিয়ার উত্তর প্রান্ত মুখ ছুঁয়ে যশোর ও ফরিদপুরের সীমা রক্ষা করে খুলনা জেলার বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।[৩১] এ ছাড়া চন্দনা, ভুবনেশ্বর, মধুমতি, কুমার, ব্রহ্মপুত্র, প্রভৃতি নদ-নদী ফরিদপুরের জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চল বিল প্রধান এলাকা। এ জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও বিল, বাওড় ও জলাভূমি আছে। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার গোটা এলাকাই জলাভূমি। এ জেলার বিখ্যাত বিলগুলো হলোঃ কাতলী, নালুয়া, চাতাল, মাউড়া, ঘোড়ামারা, কাজুলি ডাঙ্গা, বাঘিলা, পাতিনি ভাঙ্গা, দীঘা, কাশমিরা, পাবনিরা, মোল্যাডাঙ্গা, আটাডাঙ্গা, চান্দ্রা, পতরাইল, উজান, শাপলা, যোয়াইর, কাউয়া, হুগলাডাঙ্গা, ছড়ার ডাঙ্গা, কাকদি, মুকসুদপুর বাউড়, বিলরুট, রামকোলী, বিলপুঠিয়া হাতি মোহনা, রোন কাইল, নসীব শাহী ও ঢোল সমুদ্র ইত্যাদি প্রধান বিল ও বাওড়।[৩২] এসব নদী বিল বাওড় ফরিদপুরের জনজীবনকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকটা পৃথক করে ফেলেছে।

২.৫ নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ফরিদপুর জেলার পশ্চিম ও পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলের স্থলভাগ ও জনবসতি অনেকটা স্থিতিশীল এবং প্রাচীনত্বের দাবীদার। জেলার প্রাচীন ভূ-ভাগ এক সময়ে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ইসলাম আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলের হিন্দু ধর্ম ছিল প্রধান। দশম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বসবাসের ইতিহাস পাওয়া যায়। এ জেলায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ

---

[২৮] তদেব; Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 10.

[২৯] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃঃ ৫০।

[৩০] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃঃ ২৪; Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 11.

[৩১] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 11; মোঃ আবদুস সোবাহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃঃ ১৭।

[৩২] Nurul Islam , *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 14.

বসবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রভাবে এখানকার নিম্নশ্রেণীর নির্যাতিত হিন্দুরা অতিসহজে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে।[৩৩]

ফরিদপুরের লোক বসতি কোন একক এলাকা বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী থেকে সমগ্র এলাকার ছড়িয়ে পড়ার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। নতুন চর জেগে ওঠার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার লোকজন এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। আগতদের মধ্যে ঢাকা যশোর নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বসতি স্থাপন করেন । নদীয়া জেলা আসা লোকজন বেশীর ভাগ গোয়ালন্দে বসবাস করে। তাদের অনেকেই ঘাটের কুলি হিসাবে কাজে নিয়োজিত ছিল।[৩৪]

২.৬ জনসংখ্যা

ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারের তথ্য মতে, ১৯০১ সালে ফরিদপুর জেলার লোক সংখ্যা ছিল ১৮,০৯,৫৪২ জন এবং ১৯৫১ সালের আদমশুমারী মতে, লোক সংখ্যা ছিল ২৭,৮৭,৪৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ সংখ্যা ছিল ১৪,৪৫,৪৫৭ জন এবং মহিলা ছিল ১৩,৪২,০৩৭ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ১২.২৪%। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী মতে, লোকসংখ্যা ছিল ৩১,৭৮,৯৪৫ জন এর মধ্যে পুরুষ সংখ্য ছিল ১৬,২৫,৭০২ জন এবং মহিলা ছিল ১৫,৫৩,২৪৩ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ১৭.৮%।[৩৫] বর্তমানে ফরিদপুর জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃমিঃ ৪৯২৫ জন এবং শিক্ষার হার ৬৬.৬%।

১৯৭৪ সালের *CENSUS* মতে মহকুমা হিসাব অনুযায়ী ফরিদপুর সদর মহকুমা লোকসংখ্যা ছিল ১০,৭৪,৩৭৯ জন, সাক্ষরতা ছিল ১,৭৮,৬৬৯ জন। গোপলগঞ্জ মহকুমা লোকসংখ্যা ছিল ৮,৪৫,৬৪০ জন, সাক্ষরতা ছিল ১,৮৬,৮৬২ জন। মাদারীপুর মহকুমা লোকসংখ্যা ছিল ১৫,২৪,৩৭৯ জন, সাক্ষরতা ছিল ২,২১,৭৬০ জন। গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) মহকুমা লোকসংখ্যা ছিল ৬,১৫,১১৩ জন, সাক্ষরতা ছিল ১,০০,২০৫ জন। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪০,৫৯,৫১১ জন এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ২০,৮৬,৮৪৩ জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ১৯,৭২,৬৬৮ জন এবং মোট স্বাক্ষরতা ছিল ৬,৮৭,৪৯৬ জন।[৩৬]

---

[৩৩] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃঃ ১৫-১৯; আবদুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি* (মাদারীপুরঃ মিসেসলীনা জাব্বার, ১৯৯৪), পৃঃ ৩-৫; শ্রী আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১।

[৩৪] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 56.

[৩৫] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers Faridpur*, P. 51-59; সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া*, ৬ খন্ড, পৃঃ ১১৯।

[৩৬] গ্রাম জনসংখ্যা, ফরিদপুর জেলা, পরিসংখ্যান অফিস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৭৪।

১৯৮১ সালে ফরিদপুর জেলার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৭,৬৩,৭৩৭ জন, এর মধ্যে পুরুষ ২৪,১৪,০৭৯ জন এবং মহিলা ২৩,৪৯,৬৫৮ জন। শিক্ষার হার ছিল ২৪.৮০%।[৩৭] ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্য মতে, নবগঠিত ফরিদপুর জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ১৫,০৫,৩৮৬ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৭,৬৮,৭৫৮ জন, মহিলা ৭,৩৬,৯২৮ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ২৭.৮৪%। রাজবাড়ী জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ৮,৬২,১৭৩ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৪,৩১,৩৫৯ জন, মহিলা ৪,৩০,৮১৪ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ২৬.৪৩%। মাদারীপুর জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ১০,৬৯১৭৬ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৫,৪৪,২৫৪ জন, মহিলা ৫,২৪,৯২২ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ২৯.৮%। শরিয়তপুর জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ৮,৮৭,৬৯০ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৪৮০৪৩১ জন, মহিলা ৪০৭২৫৯ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ২৪.৪১%। গোপালগঞ্জ জেলায় লোকসংখ্যা ছিল ১,০৬,০৭৯১ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৫,৩৫,০৫৯ জন, মহিলা ৫,২৫,৭৩২ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ৩৫.২৮%। সর্বোপরি বৃহত্তম ফরিদপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৩,৮৫,৫১৬ জন।[৩৮]

২.৭ উৎপাদিত শষ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য

ফরিদপুর কৃষি নির্ভরশীল জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ জেলার ৮০ ভাগ লোক কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফরিদপুর জেলার প্রধান শস্য ও ফসলাদি হলো পাট, ধান, গম, পিয়াজ, ভুট্টা, ছোলা, আলু, খেসারী, নারিকেল, রবিশস্য, তিল, মটর, মসুরী, শাকসব্জি, ইক্ষু, তরমুজ ফুটী, খিরাই, খেজুর, তাল, আম, কাঠাল ইত্যাদি।[৩৯]

ব্যবসায় বাণিজ্যে ফরিদপুর জেলা ছিল খুব অনুন্নত। ১৯২১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ফরিদপুর জেলার মাত্র ৭% বিভিন্ন শিল্প কাজে নিয়োজিত ছিল। বাকী সকলে কৃষি কাজে নিয়োজিত ছিল। শিল্প বলতে তখন হস্ত শিল্প ও কুটির শিল্পকে বুঝানো হতো। ফরিদপুর জেলায় তখন মাত্র ২৫ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন প্রতিষ্ঠানে কম পক্ষে দশ জন কাজ করলে সেটি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতো।[৪০]

---

[৩৭] ফরিদপুর জেলা, আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮১; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃঃ ১৬।

[৩৮] ফরিদপুর জেলা, আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯১; বাংলাদেশ আদমশুমারী, ১৯৯১; ইউনিয়ন পরিসংখ্যান, ডিসেম্বর, ১৯৯৩; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৯১; বেনবেইস শিক্ষা মন্ত্রানালয় বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২; ফরিদপুর মানচিত্র, বৃহত্তম ফরিদপুরের তথ্যভিত্তিক মাসিক ম্যাগাজিন, জানুয়ারী , ১৯৯৮, পৃঃ ৪-৬।

[৩৯] Nurul Islam Khan,*Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, p. 77-99.

[৪০] Nurul Islam Khan,*Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, p. 57; আবদুল জাব্বার মিয়া, মাদারীপুর জেলা পরিচিতি, (মাদারীপুরঃ মিসেস শালীনা, ১৯৯৪), পৃ. ৭৩।

১৯৪৩ সালের দিকে ফরিদপুর জেলায় পাট শিল্প, সুতা তৈরী, গামছা, লুঙ্গি, বিড়ি, ধুতি প্রস্তুত ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি এবং উন্নতি হতে থাকে। ১৯৪৩ সালের দিকে ৪৭ টি পাট প্রক্রিয়াজাত করা শিল্প সুসংগটিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বর্তমান মাদারীপুর অঞ্চল ফরিদপুর জেলার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রভাগে ছিল। নদী পথে যাতায়াতের এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা ভাল থাকার কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। চরমুগরিয়ার Duffus and Landale Ltd. (1960) Tolaram Bachhraj (1960) পাট শিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।[৪১] সুতা তৈরী, তাঁত শিল্প অর্থাৎ গামছা লুঙ্গি ধুতি প্রস্তুত করতে যারা কাজ করতো তাদেরকে কারিকর বা জোলা বলা হতো। মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী এ কাজ করতো। এরা ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে বেশী বসবাস করতো। এদের মাঝে কেউ কেউ সুন্দর লিলেন কাপড় এবং কেউ কেউ বিছনার চাদর তৈরী করতে পারতো।[৪২]

মুসলমান সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী লোক ছিল তাদেরকে কলু বলা হতো। তারা ঘানি থেকে তৈল তৈরী করতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তারা মুৎশিল্পে পারদর্শি ছিল। তারা মাটি দিয়ে নানা পাত্র এবং তৈজষপত্র তৈরী করতো। এদেরকে কামার বা কুম্বকার বলা হয়। মৃৎশিল্পে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর অঞ্চল বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিল। ফরিদপুর খেজুরের গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এছাড়া বাঁশ, বেঁতের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী যেমন চেয়ার টেবিল, মোড়া, ঝুড়ি, পলো, ইত্যাদি এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে তৈরী হতো।[৪৩]

ফরিদপুর জেলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রাম, গঞ্জ, বন্দর এবং শহরের হাট-বাজারগুলো। ভাঙ্গা কুমার নদীর তীরে চাউল, ধান এবং লবন, খেসারী, সরিষার বাণিজ্যস্থান ছিল। বরহমাগঞ্জ আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে, গোপালগঞ্জ মধুমতির তীরে চাউল, পাট, লবন, মাদুর বোয়ালমারী ও সৈয়দপুর বারাসীর তীরে দেশী তামাক, কাপড়, তুলা লৌহ্ পিতল ও কাসার জিনিস বিক্রয় হতো। মধুখালী চন্দনাতীরে তামাক লবণ কামারখালীর চন্দনার তীরে চাউল, সরিষা খেসারী এবং কানাইপুর ও সালথা প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণ বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হতো। ফরিদপুরে গুড়ের জন্য এবং পাংশা ও বেলগাছি গামছা, দেশী কাপড়, ছিট কাপড় প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ

---

[৪১] Ibid. , P. 158.

[৪২] *Ibid*, P. 158-159.

[৪৩] *Ibid*, p. 159-160.

ছিল। গোয়ালন্দ পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থান। নানা স্থান হতে স্টীমার নৌকা যোগে নানাবিধ জিনিস বহুদুর দুরান্তে প্রেরিত হতো।

মাদারীপুরের কুমার নদীর তটে পাট, গুড়, তেল প্রচুর ক্রয়-বিক্রয় হতো। বিশেষ করে টেকের হাট, পালং, সালথা, মসুরা, কানাইপুর প্রভৃতি স্থানে পাটের আমদানী হয়ে কলিকাতা প্রেরিত হতো।[৪৪] পালং স্টেশনের অন্তর্গত নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ পরিচিত শুদ্রগণ, কাসারীদের এবং কুম্ভকারগণের হাড়ি পাতিলের পাইকারীক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অনেক উন্নতি হয়েছিল। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে নৌকায় মাঝি হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতো। ঝালো ও কেবর্ণগণ এ কার্যে বেশী পটু ছিল। বাদিয়া সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট বাড়ী ঘর নেই। কেবল মানুষ নৌকা যোগে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রী পুরুষে সমভাবে নৌকা চালিয়ে নানাবিধ মনোহারী জিনিষ ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। হাট বাজার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়েও এরা ফেরী ওয়ালার ন্যায় সাধারণ লোকের নিকট মনোহরি দ্রব্য বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো।[৪৫] ১৯২৫ সালের জরিপ মতে, হাট বাজারের সংখ্যা ছিল ৩৫৮ টি এর মধ্যে ২৫২ টি হাট এবং ১০৬ টি ছিল যৌথভাবে হাট বাজার। ১৯৪৩ সালে হাট বাজারের সংখ্যা ৩৮% বেড়ে যাওয়ায় মোট হাট বাজারের সংখ্যা হয় ৪৯২ টি এর মধ্যে ৩১৭টি হাট এবং ১১৪ টি দৈনিক বাজার ও ৬১টি যৌথ হাট বাজার ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে ফরিদপুর জেলায় মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ছিল ৩৬৩টি । বর্তমানে সময়ের ব্যবধানে হাট বাজারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৬]

২.৮ ফরিদপুরে ইসলাম প্রচার

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী ও মুসলিম বণিকদের নাম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পৃথিবীর বহু স্থান থেকে তারা বাংলায় আগমন করেন। তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন আরব ও ইরানীয়।[৪৭] তারা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং হিন্দু রাজাদের আমলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

---

৪৪ আনন্দ নাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃ. ১৪; আবদুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি*, পৃ: ৭৩-৭৬।

৪৫ আনন্দ নাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃ: ১৫-১৯; আবদুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি*, পৃ: ৭৩-৭৬।

৪৬ Nurul Islam Khan, *Bangladesh Districts Gazetteers*, Faridpur, P. 171; আবদুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি*, পৃ. ৭৩-৭৬।

৪৭ ড. মোহাম্মদ বিলাল হোসেন ও ফেরদৌস আলম ছিদ্দীকী, " বাংলাদেশে ইসলামের আগমন: ধারা ও প্রকৃতি , *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা: পৃ. ৭৯ ; ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৫।

ইসলাম প্রচার করে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন।[৪৮] ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা কখনো একাকী আবার কখন সাথীদের নিয়ে অচিন দেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বসতি স্থাপন করেছেন। প্রথম যুগে অনেক সুফী-দরবেশ সমুদ্র পথে এদেশে আগমন করেন। আরবদের সাথে এ অঞ্চলের সমুদ্রপথ তাদের নিকট সুপরিচিত ছিল। এদেশে ইসলামের দ্রুত প্রসার লাভের এটি একটি কারণ। সূফীদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া না গেলেও হাজারের কম হবেনা।[৪৯]

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দলে দলে আরব বণিকগণ মৌসুমি বায়ুর সাহায্যে সমুদ্র পথে তাদের বাণিজ্য মিশন চালিয়ে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী-রফতানী করতেন।[৫০] বস্তুত বাংলার উপকুল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়।[৫১] অষ্টম শতাব্দী ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার অনেক পীর, দরবেশ ও সূফী ইসলাম প্রচারকল্পে স্বদেশ ত্যাগ করে পূর্ব বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[৫২] বাংলায় সূফীদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এ প্রভাব সাধারণ মানুষের গৃহাঙ্গন থেকে শাসন কর্তাদের প্রাসাদ পর্যন্ত সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদে সূফিগণ শহরে বন্দরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইসলামের থাকতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের খানকার সঙ্গে মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে লোকদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্মপ্রচারের আগ্রহ আদর্শ চরিত্র ও জন কল্যাণমূলক কার্যাবলীর দ্বারা জন মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেন।[৫৩] সূফিদের ধর্মীয় কার্যাবলী বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয় এবং প্রদেশে মুসলিম শাসন সুসংহতকরণে সাহায্য করেছে। রাজ্য বিজয়ে কখনো মুসলিম বিজেতা ও শাসনকর্তাগণ সূফীদের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন। কখনো সূফীগণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে অস্ত্র ধরেছেন। আবার কখনো সূফীগণ নিজেরাই হয়েছেন যুদ্ধের

---

[৪৮] ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড,(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৩৯।

[৪৯] ড. মোহাম্মদ বিলাল হোসেন ও ফেরদৌস আলম ছিদ্দীকী, " বাংলাদেশে ইসলামের আগমনঃ ধারা ও প্রকৃতি, পৃ. ৭৯।

[৫০] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৩৮; ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

[৫১] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৩৮।

[৫২] *তদেব*, পৃ. ৫১-৫৭; মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, *তাসাউফ তথ্য* (ঢাকাঃ ১৯৯৬), পৃ. ২৮।

[৫৩] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৪৮-৫১।

সিপাহসালার। এমনও হয়েছে যে, বিজয়ী সিপাহসালার বিজিত ভুখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন, ইসলামী আদর্শে বিজিত ভুখণ্ড শাসন করেছেন, জনসমাজে পরিচিত হয়েছেন সূফীরূপে।[৫৪]

২.৮.১ শেখ ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য সূফী-দরবেশ ইসলামের প্রচারকার্য পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে *শেখ ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (র:)* অন্যতম। হযরত শেখ মাসুদ গঞ্জেশকর ৫৬৯হিজরী/১১৭৭ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত *খোটওয়াল* নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ জামাল উদ্দীন সুলায়মান (র:)। পিতা ছিলেন কোটওয়ালেদের কাজী। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হযরত শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে এসে ফরিদপুর, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের মাধ্যম ছিল বিভিন্ন স্থানে তাবু টানিয়ে স্থানীয় ও দুর থেকে আগত লোকদের ইসলামের দীক্ষা দেয়া। তাঁর কাজের প্রমাণ মিলে ফরিদপুর কোর্ট পাড়ে শাহ্ ফরিদের দরগাহ নামীয় স্থানের জনশ্রুতি থেকে। তিনি অনুগামীদের নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে জন সাধারণকে ইসলামে দীক্ষিত করতেন।[৫৫]

শেখ ফরিদ (রহ.) পিতাকে শৈশবেই হারান। মাতা করসুমা বা মারাবান বানু ৫ বছর বয়সেই পুত্র শেখ ফরিদকে *খোটওয়ালের* মক্তবে পাঠান। তিনি মাওলানা সাইয়েদ নাজির আহমদের নিকট মাত্র এগার বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন। তিনি অনেক আলিম পীর মাশায়েখদের কাছ থেকে অনেক আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাঁর আগমনের পর বহু ধর্ম প্রচারক, পীর, মাশায়েখ , আউলিয়া দরবেশ এ জেলায় পদার্পন করেছেন। মূলত শেখ ফরিদউদ্দীন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১২৬৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন।[৫৬]

---

[৫৪] আসকার ইবন শাইখ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসন কর্তা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৩ পৃ. ২৫১।

[৫৫] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৫১-৫২; হযরত মাওলানা উবাইদুল হক (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃ. ১৬৭।

[৫৬] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৫২-৫৬।

২.৮.২ হযরত শাহ সুলতান বলখী (রঃ)

বাংলাদেশে যে সকল অলী আগমন করেছেন তাঁর মধ্যে শাহ সুলতান বলখী (রঃ) অন্যতম। তিনি মধ্য এশিয়ার বলখের শাসক ছিলেন। তিনি রাজ্য শাসন ত্যাগ করে দিমাশক এসে তাওফীক নামক একজন নেক লোকের সান্নিধ্য বহু বছর থাকেন। উক্ত ব্যক্তি তাকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত করেন। তিনি নৌ-পথে সন্দ্বীপ আসেন। তারপর নৌপথে বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরে প্রথম আধ্যাত্মিক কীর্তিস্থাপন করেন। তিনি প্রথমে রাজা বলরামকে যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করেন। শাহ সুলতান বলখীর (রঃ) হাতে অনেক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষালয় ও মসজিদ তৈরী করেন। বগুড়ার মহাস্তানগড়ে তার মাযার রয়েছে।[৫৭]

২.৮.৩ বাবা আদম শহীদ (রঃ)

ফরিদপুর অঞ্চলের একীভূত এবং বর্তমান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন বাবা আদম শহীদ (র)। আদম শহীদ (রঃ) এক দল সৈন্য নিয়ে বিক্রমপুরে তাবু স্থাপন করেন এবং বিক্রমপুরে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। ইতিমধ্যে খাবারের জন্য একটি গরু কোরবানী করেন। এ সংবাদ রাজা বল্লাল সেনের কাছে পৌঁছালে রাজা বল্লালসেনের সৈন্য বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধ দীর্ঘ ১৪ দিন চলে অবশেষে মুসলিমগণ পরাজিত হয় এবং অনেকেই শাহাদতবরণ করেন। এ যুদ্ধে বাবা আদম শহীদও শাহাদত বরণ করেন। এখনও আব্দুল্লাহপুরে বাবা আদম শহীদ (রঃ) এর মাজার অবস্থিত এবং সেখানে একটি মসজিদও আছে।[৫৮]

২.৮.৪ মখদুম শাহ দৌলা শহীদ (রঃ)

ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারকগণের মধ্যে মখদুম শাহদৌলা শহীদ (রঃ) অন্যতম। তিনি ১২৪০ সালে বাংলায় আসেন। ফরিদপুর জেলার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ রাজবাড়ী পাংশার বরাবর পদ্মার উত্তরপাড়ে পাবনা জেলায় অবস্থিত। তিনি শাহাজাদপুরে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি হযরত মুযায ইবনে জাবালের বংশধর ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি ইসলাম প্রচার কালে স্থানীয় শাসকের সাথে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু যুদ্ধে রাজার দলবল পরাজিত হলেও হযরত মখদুম শাহ দৌলা (র) শহীদ হন।

---

[৫৭] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ৬৪-৬৭; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৪৪-৪৫; এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন* (ঢাকা: ইসলামীক সেন্টার, ১৯৯৯), পৃ. ২৪-২৫।

[৫৮] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭০-৭২; এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, পৃ. ২৫; আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৪৪-৪৭।

তার শাহাদতবরণ ইসলামের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। তিনি সমগ্র পাবনা, রাজশাহী এবং ফরিদপুরে ইসলাম প্রচার করেন।[৫৯]

২.৮.৫ হযরত বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার (র:)

তিনি ১৩১৫ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবূ ইছহাক। তিনি হযরত হারূণ (আ:) এর বংশধর ছিলেন।[৬০] ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে সকল অলী-দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন তাঁর মধ্যে হযরত বদিউদ্দীন মাদার শাহ (র) অন্যতম।[৬১] তিনি ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের দরগা খোলা নামক স্থানে খানকা স্থাপন করে ইসলামের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। বর্তমানে উক্ত স্থানে তাঁর নামে একটি ইয়াতিমখানা, মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসা সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর নামানুসারেই পর্যায়ক্রমে মাদারীপুর থানা, মহকুমা ও মাদারীপুর জেলার নামকরণ করা হয়। তিনি ১৪৩৭ সালে সুলতান ইবরাহীম শর্কীর রাজত্বকালে ভারতের কানপুরে ইন্তিকাল করেন।[৬২]

২.৮.৬ হযরত শাহ্আলী বাগদাদী (র:)

তিনি ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৪১২ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে ফরিদপুরে আসেন। তিনি বাগদাদ থেকে এসেছিলেন বলে তাঁর নামের সঙ্গে বাগদাদী শব্দটি যুক্ত করে শাহ্ আলী বাগদাদী নামে নামকরণ করা হয়। তার পিতার নাম ছিল ফখরুদ্দীন রাযী (র:)। শাহ্ আলী বাগদাদী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর বংশধর বলে অনুমান করা হয়।[৬৩] তিনি দিল্লী হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা এবং পরবর্তীতে ফরিদপুরে ইসলাম প্রচার করেন। তার ইসলাম প্রচারের ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি ১৪৯৮ সালে মৃত্যবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি ১৫১৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

---

[৫৯] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৭৭-৭৮; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৪৭-৪৮।

[৬০] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৭২; মুহাঃ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৬৫-৬৬; ড. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার লোক সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৩০১।

[৬১] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৭২-৭৪; সৈয়দ ফরিদ আহম্মদ, *মাদরাসা-ই-আযম*, বঙ্গানুবাদ মুহাম্মদ পিয়ার আলী নাযিব (ঢাকাঃ কাজেমিয়া, ফাউন্ডেশন, ১৪০৪ হিজরী), পৃ. ৩-৬।

[৬২] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৭৪-৭৬।

[৬৩] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৭৮-৮২, আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

[৬৪] *তদেব*।

২.৮.৭ হযরত শাহ্ আবদুর রহমান গঞ্জেরাজ

তিনি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে ফরিদপুরে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি একজন পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। শাহ্ আব্দুর রহমানের মাযারটি বর্তমানে ফরিদপুর শহরের বাস স্টান্ডের পার্শ্বে খাবাসপুরে অবস্থিত।[৬৫]

২.৮.৮ হযরত শাহ্ বদিউদ্দীন:

হযরত শাহ্ বদিউদ্দীন একজন কামিল অলী ছিলেন। তিনি মুগল আমলের শেষ দিকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ফরিদপুরে আগমন করেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের ফলে অসংখ্য লোক ইসলামের ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নেয়। তিনি জমিদারদের অত্যাচার থেকে ফরিদপুর অঞ্চলের জনগণকে রক্ষা করেন। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ফরিদপুরের *বুষনা* অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হলে স্বশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এলাকা জয় করেন। এছাড়া সৈয়দ শাহ্ ওসমান (র:) সৈয়দ শাহ্ হাবীবুল্লাহ (র.), হযরত আব্দুল ওহাব, হযরত মাসউদ হক্কানী (র), হযরত শাহ্মীর, হযরত শাহ্ আবদুর রহমান দানিশমন্দ অলীবর্গ বিভিন্ন সময়ে ফরিদপুর জেলায় আগমন করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভুমিকা পালন করেন।[৬৬]

২.৮.৯ হাজী শরীয়তুল্লাহ

হাজী মোহাম্মদ শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ সালে বৃহত্তম ফরিদপুরের বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচরথানার শামাইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬৭] পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। ৮ বছর বয়সে পিতা মারা যায়। বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় তিনি চাচা আজিমুদ্দীনের কাছে লালিত পালিত হয়ে বড় হতে থাকেন।[৬৮] এরপর তিনি ফুরফুরায় চলে যান এবং সেখানে মাওলানা বাশারত আলীর নিকট কুরআন ও হাদীসের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তথাকার মুহসিনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন।[৬৯] ১৭৯৯ সালে উস্তাদ বাশারত আলী ১৮ বছর বয়সে মক্কায় যান। সেখানে শায়খ তাহির সম্বলীর কাছে হাদীস তাফসির ফিকাহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং মা'আরিফাত ও তরিকতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে মা আরিফাত ও তরিকতের শিষ্যত্ব গ্রহণ

---

[৬৫] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ৮৫-৮৬।

[৬৬] *তদেব*, পৃ. ৮৬-৯২।

[৬৭] আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪০। হযরত মাওলানা উবাইদুল হক (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

[৬৮] *তদেব*, মনোয়ার, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর* (ফরিদপুর; মিডিয়া সেন্টার , ২০০৪) পৃ. ৭০।

[৬৯] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪০; হযরত মাওলানা উবাইদুল হক (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

করেন।[৭০] চাচার অসুস্থতার খবর পেয়ে ১৮১৮ সালে মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন।[৭১] দেশে এসেই তিনি মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চরম অবক্ষয় ও দুর্দিন লক্ষ করে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।[৭২] ফরায়েজ শব্দটি ফরিজাহ্ শব্দের বহুবচন। অর্থ অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামের ব্যবহারিক পরিভাষায় ফরায়েজ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর নির্দেশিত অবশ্য কর্তব্যসমূহ। যারা এ কর্তব্যসমূহ পালনের অঙ্গীকারভূক্ত তাদেরকে ফরায়েজী বলা হয়।[৭৩] বঙ্গের ফারায়েজী আন্দোলনের প্রবর্তক ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ্। তিনি ওহাবী মতে দিক্ষিত হয়ে বংলায় ফারায়েজী জামায়াত সৃষ্টি করে ওহাবী আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনই বাংলায় ফারায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করে।[৭৪] হাজী শরীয়তুল্লহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ আন্দোলন শুরু করলেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তিনি শুধু ধর্মীয় সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি বরং ইংরেজ অধিকৃত এ উপমহাদেশকে মুক্ত করার জন্য সর্বাত্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এ আন্দোলনের মূল কথা ছিল মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার যেসব হুকুম আহকাম (ফারাইজ) নির্ধারিণ করে দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা এবং মুসলমানদের জীবনকে শরীয়তের বিধান তথা ফিকহী ধারানুযায়ী গঠন করা।[৭৫] তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমান সমাজের মাঝে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। পাড়ায় পাড়ায়, মসজিদে মসজিদে তিনি কোরআন ও নামাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের প্রতি ইসলামের পূর্ণ অনস্মরণে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ প্রতিষ্ঠা, রামযান মাসে রোজা রাখা ইত্যাদি প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।[৭৬] ১৮৩১ সালে তিনি যখন ঢাকা জেলার নয়াবাড়ীতে তার দলের পক্ষে প্রচার কার্য চালান। তখন হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। সংস্কার বিরোধী কিছু সংখ্যক মুসলমানও বিরোধীতা করে। অগত্যা হাজী শরীয়তুল্লাহ সেখান থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। ১৮৩৯

---

[৭০] *তদেব*।

[৭১] মো: আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪১; Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, p.61.

[৭২] মাওলানা ওবাইদুল হক, (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

[৭৩] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪২; আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃ. ৫১।

[৭৪] *তদেব*; মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ. ৭১।

[৭৫] *তদেব*, পৃ: ৫২; মাওলানা ওবাইদুল হক, (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

[৭৬] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪৪।

সালে অত্যান্ত সাবধানতার সাথে প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় সাফল্যের সাথে তাঁর প্রচার কার্য চলে কিন্তু এতে স্বার্থবাদীরা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়। ১৮৩৯ সালে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ উপর পুলিশের গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি এবং তাকে কয়েক বার গ্রেফতার করা হয়। প্রতিবারই তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস দেন।[৭৭] ১৮৪৭ সালে তার মুরীদানের সংখ্যা ছিল ১২০০[৭৮] বাংলাদেশ থেকে আসাম পর্যন্ত ফারায়েজী আন্দোলনের প্রসার ঘটে। ১৮৪০ সালে তিনি স্বগ্রামে ইন্তিকাল করেন।[৭৯]

২.৮.১০ পীর মহ্সীন উদ্দিন আহ্মদ (দুদুমিয়া)

মহ্সীন উদ্দীন আহ্মদ দুদুমিয়া ১৮১৯ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর পাঁচ বছর আরবে লেখাপড়া করে দেশে ফিরে আসেন। পিতার কাছে আরবী ফারসীসহ্ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে ফারায়েজী মতবাদের প্রচার ও বিভিন্ন স্থানে সংগঠন গড়ে তোলার কাছে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪০ সালে পিতার মৃত্যের পর মুহাম্মদ মহ্সীন উদ্দীন দুদুমিয়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৮০] তার অসীম সাহকিসতা, বিজ্ঞতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতায় এ আন্দোলনকে পূর্বের চেয়ে আরো বেগময় করে তোলেন। দুদুমিয়া তাঁর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে প্রথমেই অনুসারীদের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান চালান। প্রতিটি কর্মীর আমল-আখলাকের উপর আত্মসমালোচনা করে তাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাসকে মজবুত ঈমানের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অনুসারীদেরকে পূর্ণাঙ্গ সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য।[৮১] হিন্দু জমিদার ও নীলকররা মুসলমান প্রজাদের উপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে এবং হিন্দু জমিদার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের পুজার জন্য বেআইনীভাবে কর আদায় করতে থাকেন। দুদুমিয়া এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে হিন্দু জমিদার কর্তৃক বিরোধিতা পূর্বক আন্দোলন শুরু হয়। তিনি প্রকাশ্যে জনসাধারণের সামনে ইংরেজদের অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতকে

---

[৭৭] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ. ৭১।

[৭৮] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪৪।

[৭৯] আনম আবদুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, পৃ. ৫১।

[৮০] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ.৭২; Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, p.63.

[৮১] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৪৬।

দারুল হরব ঘোষণা দেন যার ফলে ভারতবর্ষে জুমার নামাজ নিষিদ্ধ হয়।[৮২] অতঃপর দুদুমিয়া ১৮৪১ খ্রীঃ কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ফরিদপুরের কানাইপুরে অত্যাচারী জমিদার সিকিন্দারকে শায়েস্তা করতে পাঠান। দুদুমিয়া লোকজনের আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখে কানাইপুরের সিকিন্দার আত্মসমার্পন করেন এবং ওয়াদা দেয় যে সে কখনো প্রজাদের উপর অত্যাচার করবেনা বরং প্রজাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।[৮৩]

১৮৪২ সালে ফরিদপুরের অত্যাচারী জমিদারদের অন্যতম জমিদার ছিলেন জমিদার জয় নারায়ন। এ জয় নারায়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে জয়নারায়ন পলায়ন করে জীবন রক্ষা করে। অন্য ভাই মদন নারায়ন বোষকে তারা হত্যা করে। তাকে হত্যার কারণ হলো তারা দুই জন মুসলমানের একজনকে অপরজনের দাড়ীর সাথে বেঁধে নাকে মুখে মরিচ ছিটিয়ে তাদের অসহায় করুণ আর্তনাদ দেখে আনন্দ পেতো। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুদু মিয়াকে অভিযুক্ত করা হয় এবং মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষী ও প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পান এবং অপর ২২ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।[৮৪] দুদুমিয়ার আন্দোলনের ফলে ফরিদপুরের জমিদার শ্রেণী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মোহসেন উদ্দীন দুদুমিয়া ছিলেন একজন ন্যায়নিষ্ঠ আন্দোলনের প্রতিভা। তিনি শুধু হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেননি বরং তিনি মজলুম মানুষের পাশে থেকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন।[৮৫] মোহসীন উদ্দীন দুদুমিয়া হিন্দু জমিদার ও নীল করদের বিরুদ্ধে এবং অন্যায়-অত্যচার থেকে সমাজকে মুক্ত করে ইসলামী ভাবধারায় আনার জন্য ফরায়েজী আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম। তাঁর আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য লোক তার দলে যোগ দেয়। দুদুমিয়ার অনুসারী ছিল প্রায় আশিঁ হাজার।[৮৬] ১৮৬২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২.৮.১১ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) ফরিদপুর জেলার তৎকালীণ গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া থানার পাটগাতি ইউনিয়নের গওহার ডাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে কলকাতা মাদরাসাই আলীয়া এংলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে

---

[৮২] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ. ৭২; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*পৃ. ১৪৭।

[৮৩] মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ. ৭২; মোঃ আবদুস সাত্তার ,*ফরিদপুরে ইসলাম*পৃ. ১৪৭।

[৮৪] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*পৃ. ১৪৭; মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ. ৭২।

[৮৫] *তদেব*।

[৮৬] *তদেব*, পৃ. ৭৩।

মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়া করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পরবর্তী ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর (রঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং বায়আত গ্রহণ করেন।[৮৭] বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজরদারী। ফলে নিজের প্রচেষ্টায় আরবী ফার্সী ও কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। তারপর মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ) সাহারানপুরে অবস্থিত মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ফাযিল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি দীওবন্দ দারুল উলূম মাদরাসা থেকে হাদীস ও ফিকহ অভিজ্ঞানে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে ১৯২৮ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন।[৮৮] তিনি ১৯২৮ সালে নিয়মতান্ত্রিক পাঠ্য জীবন শেষ করে কর্ম জীবনে পা রাখেন প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার ইউনুছিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২/৩ বছরের মধ্যে মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস বিভাগ খোলেন। তাঁর এ কৃতিত্বের ফলে কর্মজীবনে বৃহৎ বৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি নেওয়ার মনোবল বেড়ে যায়। তিনি দেখলেন সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসকদের মুসলিম বিদ্বেষী আচরণের কারণে ঐ সময় প্রায় ৮০ হাজার মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজ থেকে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞানের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমনকি মুসলমানদের নামায ও কুরআন শিক্ষার সামান্যতম ব্যবস্থাটুকুও নিঃশেষ হওয়ার পথে। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) চাইলেন সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে এবং বৃহত্তম এলাকায় বড় মাদরাসা কায়েম করতে, যাতে ধর্ম শিক্ষা হতে বঞ্চিত, কুশিক্ষার শিক্ষিত বাংলার মুসলমানদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বড়কাটরা আশরাফুল উলূম মাদারাসা ও লালবাগ জামিয়ায়ে কুরআনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) ফরিদপুর জেলায় ইসলাম প্রচার ও কুরআন হাদীসের জ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯০৩ সালে তার নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাদারাসাটির নাম হচ্ছে গওহর ডাঙ্গা মাদরাসা। এখানে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত বিভাগ রয়েছে। এছাড়া ফরিদপুরের শামসুল উলূম মাদরাসাসহ অনেক বড় ধরনের দীনি প্রতিষ্ঠান তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফল। ফরিদপুর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি অনেক মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, প্রতিষ্ঠিত

---

[৮৭] মাওলানা ওবাইদুল হক, (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬-১৬৭; মোঃ আবদুস সাত্তার ,*ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৬০-১৬৩; মনোয়ার, *ঐতিহ্যে লালিত ফরিদপুর*, পৃ. ৮৫।

[৮৮] মাওলানা ওবাইদুল হক, (সম্পাদনা পরিষদ),*ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬-১৬৭; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৬২-১৬৩।

করেছেন।[৮৯] তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তাফসীরে বয়ানুল কুরআন এবং বেহশতী জেওরসহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া মৌলিকভাবেও অনেক ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেন। বেহশতী জেওর, তিজারতের ফজিলত, ফাযাইলে মুয়ামালাত গ্রন্থ তিনটি ফিকহ অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদান রূপে গণ্য করা হয়। ইলমে তাসাউফ তরিকতের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে।[৯০]

তিনি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতেন। তিনি ১৯০৪ সালে বাংলার উলামাদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালান। আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানীর (র) নেতৃত্বাধীন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন করেন। তখন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) তখন এক সংগ্রামী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে "আঞ্জুমানে তাবলীগুল করআন" (কুরআন প্রচার সমিতি) গঠন করেন। তিনি ১৯৪০ সালের ১৬ আগষ্ট ঢাকায় খাদেমুল ইসলাম জামায়াত নামে একটি সমাজ সেবা ও সংস্কারমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। খাদেমুল ইসলামের জামায়াত কুরআন হাদীসের মহান বিপ্লবী জীবন ব্যবস্থাকে আল্লাহর জমিনে কায়েমের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি সংশোধন সমাজ, গঠনমূলক আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদা বোধসৃষ্টি, রাসূলের তরিকার সেবা, শিক্ষা, সংস্কার ও জিহাদের মাধ্যমে জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার একটি সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান।[৯১] তিনি ১৯৬৯ সালে ২১ জানুয়ারী ইন্তিকাল করেন।

নদী মাতৃক বাংলার নদ-নদীর সম্বলিত উল্লেখযোগ্য একটি অঞ্চল ফরিদপুর। আবহাওয়াগত ও ভূ-বৈচিত্রগত কারণে এ অঞ্চলটি বাংলার সমভূমি অঞ্চল হলেও বরেন্দ্র ও অন্যান্য সমভূমি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। বাংলায় ইসলামপ্রচারের সমসাময়িক প্রভাব এঅঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফলে জনগোষ্ঠীর একটি বৃহত্তম অংশ ইসলামের অনুসারী। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনেও এ অঞ্চলের ভূমিকা ছিল ইতিহাস খ্যাত। তাই বলা যায় যে, এ অঞ্চলের জনসাধারণ যেমন ধর্ম পরায়ণ তেমনি শিক্ষা সচেতন।

---

[৮৯] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৬৩-১৬৫; মাওলানা ওবাইদুল হক, (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতওয়া ও মাসাইল*, পৃ. ১৬৭।

[৯০] মাওলানা ওবাইদুল হক, (সম্পাদনা পরিষদ), *ফাতওয়া ও মাসাইল*, পৃ. ১৬৭।

[৯১] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ. ১৬৬-১৭৪।

তৃতীয় অধ্যায়

ফরিদপুর জেলার উল্লেখপূর্বক বাংলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার বিকাশ

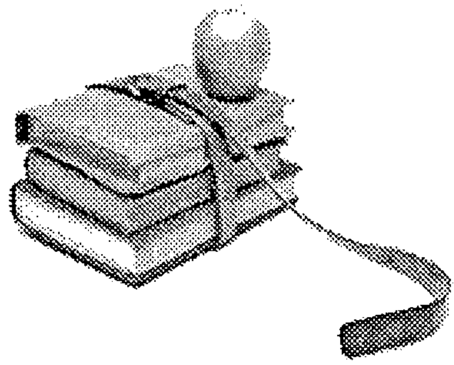

৩.১ ভূমিকা

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।[১] ঐতিহ্যগতভাবে একজন মুসলমান নিজে যেমন জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট থাকে তেমনি পিতা তার সন্তানদেরকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করে থাকে। সন্তানের বয়স চার-পাঁচ বছর পার হলেই পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগী হয়। কেননা জ্ঞানই মুসলিম জীবনের দায়িত্ব পালনের অত্যবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়।[২] জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান কেন্দ্র থেকেই সাধারণত হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলায়ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল।[৩] বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল এর থেকে ভিন্নতর ছিল না। অত্র অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার বিকাশ আলোচনার পাশাপাশি ফরিদপুর অঞ্চলের উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সম্যক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৩.২ বাংলার সনাতন শিক্ষা

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়।[৪] এ কারণে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীলা, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ময়নামতি, লালমাই বিহার এবং মহাস্থানের ভাসু বিহার প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ শাসনামলে বিহারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের অনেকটা সহজলভ্য ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের শাসনামলে শিক্ষার পরিধি সংকুচিত হয়ে আসে এবং সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার চর্চা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যগণ ও রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন।[৫] এমনকি এমন বক্তব্যও চোখে পড়ে যে, সংস্কৃত রূপ

---

[১] قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طالب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة দ্র: শায়খ ওয়ালীউদ্দিন মাহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ খতীব আ, তিরমিয়ী, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, কিতাবুল ইলম (দেওবন্দ: মিরাজ বুক ডিপো, সাহারানপুর, তা.বি.), পৃ: ৩৪।

[২] قال الله نعالى– اقرا باسم ربك الذى خلق– خلق الانسان من علق দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ আলাক, আয়াত: ১-২।

[৩] Santosh Kumar Das, *The Educatinal System of the Ancient Hindus* (Calcutta: Mitra Prass, 1930), P. 1.

[৪] ভিক্ষু সুখী আনন্দ, *বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ: ১৫১।

[৫] A.K.M Yaqub Ali, "The Educational System in British Bengal", *Research Journal,* vol. I, Rajshahi University, P. 210.

ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করলে তার জন্য রৌরব নরক অবধারিত।[৬] সেন শাসনের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কি মুসলমানদের লাখনৌতি বিজয় বাংলার ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করে। তাদের উদারনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আহার্য ও বাসস্থানের ন্যায় শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ কারণে বাংলার সুলতানগণ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রসিদ্ধ ও কৌশলগত স্থানে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৭] সুলতানি শাসন পর্বে এক উলেখযোগ্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস হতে জানা যায়। এ সময়কার পাঠসূচীর মধ্যে ধর্মীয়, ব্যবহারিক এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুলতানি শাসন পর্বের পর মুঘল শাসন পর্বে অনুরূপ শিক্ষা ধারা অব্যাহত ছিল। মুসলিম শাসন পর্বে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সি এবং তার সাথে ধর্মের ভাষা আরবি এবং জনসাধারণের ভাষা বাংলার উৎকর্ষ সাধনে যথাযথ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি হওয়ার কারণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ফার্সি শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসন পর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে অনুসৃত হয়েছে। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেও অচিরেই তারা সনাতন পদ্ধতির এ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলৎপাটন ঘটতে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে। ফরিদপুর অঞ্চলেও এ প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটেনি।[৮] লর্ড ওয়ারেন হিস্টিংসের অনুমোদনক্রমে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে মুসলমানদের জন্য দারসে নিজামিয়া পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদানের জন্য কলকাতায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পরবর্তীকালের সয়ংসম্পূর্ণ আলীয়া মাদরাসার প্রাথমিক রূপ। আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষিত যুবকগণের ইংরেজ সরকারের ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষা চালুর ফলে সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এক দিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনিহা অপরপক্ষে আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে সরকারি চাকুরী হতে বঞ্চিত মুসলমান যুবকগণ হতাশাগ্রস্থ হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতির উত্তরণের

[৬] অষ্টদশ পুরাণানী রামস্য চরিতা নিচ। ভাষায়ং মানবঃ শ্রত্বারৌরব ব্রজেত। অনুবাদ: যে ব্যক্তি অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত দেব ভাষা (সংস্কৃত) ছাড়া মানুষের (বাংলা) ভাষায় অধ্যায়ন করবে তার জন্য রৌরব নরক। দ্রঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, *বংলা ভাষা ও সাহিত্য* (কোলকাতা: দাশগুপ্ত এন্ড সন্স, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃ: ৭৩-৭৪।

[৭] A.K.M Yaqub Ali, "Educational for Muslim under the Bengal Sultanate", *Islamic studies*, vol. XXIV, No. 4, Islamabad, Pakistan, 1985, P. 423.

[৮] Willam Adam, *Report on the State of Education in Bengal,* A. N. Basu edited (Calcutta: University of Calcutta, 1941), P. XIII.

জন্য মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় সাধারণ শিক্ষার সাথে সমতা বিধান করে ১৯১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১০ প্রকারের নতুন পদ্ধতির মাদরাসা (নিউস্কিম মাদরাসা) শিক্ষা চালু করা হয়। এ পাঠ্যসূচী অনুযায়ী যারা হাই মাদরাসার পরীক্ষায় পাস করবে তারা সাধারণ শিক্ষায় মেট্রিকুলেশন পাস করা ছাত্রদের ন্যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। সরকারি চাকুরীতেও তাদের প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। মুসলমানদের জন্য আলীয়া ও হাই মাদরাসা শিক্ষার ধারাকে সনাতন শিক্ষা এবং ইংরেজি পদ্ধতিতে পরিচালিত শিক্ষাক্রম পাশ্চাত্য বা আধুনিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি অংশ যা পুর্ব পাকিস্তান নামে আখ্যায়িত। এই পূর্ব পাকিস্তানের পরিসীমা ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায়। পাকিস্তান শাসনামলেও কিছু সংস্কার সাপেক্ষে আধুনিক ও সনাতন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের উদ্ভবের ফলে মাদরাসা শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করা হয় এবং সাধারণ শিক্ষা সমমানের সরকারি অনুমোদন লাভ করে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে আলীয়া মাদরাসা ও কওমী মাদরাসার শিক্ষা পদ্ধতিকে সনাতন শিক্ষা হিসেবে এবং সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৩.৩ বাংলায় আধুনিক শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চা জাতীয় উন্ননের জন্য অপরিহার্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বাংলার মুসলমান সমাজ এ শিক্ষা নিয়ে সংশায়িত থাকলেও হিন্দু সমাজ তাদের উন্নয়নের জন্য একযোগে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। তবে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও হাজী মোহাম্মদ মহসিন প্রমুখ বিদ্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে এ ক্ষেত্রে ইংরেজরা শিক্ষা সম্প্রসারণে মুসলমানদের উন্নয়নের চেয়ে নিজেদের প্রয়োজনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল।

১৭১৯ সালে The Society for promoting christing knowledge নামক খ্রীষ্টান মিশনারী সমিতি আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কলকাতায় কাজ শুরু করে।[৯] যে সব খ্রীষ্টান মিশনারী

---

[৯] কেদার নাথ মজুমদার, *বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য* (ময়মনসিংহ: নরেন্দ্র নাথ মজুমদার, ১৯১৭), পৃ: ৫০।

সদস্য বাংলা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেন তাদের মধ্যে ব্যাপিটিষ্ট উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উলিয়াম কেরি কলকাতায় এসে শ্রীরামপুরে একটি খ্রিষ্টিয়ান মিশন স্কুল স্থাপন করেন এবং সেখানে প্রণীত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণকে খ্রিস্টান ধর্ম ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করেন।[১০]

ইংরেজগণ তাদের প্রয়োজনেই ভারতে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু করে। সে সূত্র ধরে ১৮১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল সোসাইটি।[১১] অন্যদিকে ১৭৯৪ সালে উইলিয়াম কেরী মালদহে ভারতীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১২] ১৮০৪ সালে যশোরে চারটি দিনাজপুরে একটি এবং ভারতের কটোয়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এগুলো ছিল পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (মনিটোরিয়াল পদ্ধতি)। শ্রীরামপুরের অনেক স্কুলই এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১৩]

১৮১৪ সালে জুলাই মাসে খ্রিস্টান মিশনারী সদস্য রবার্ট মে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে চুঁচুড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে উৎসাহী হিন্দু যুবকদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগোম করা হয়েছে। ১৮১৭ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৭০০ (ছয় হাজার সাতশত) জন।[১৫]

১৮২৯ সালের ৩ মার্চ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি সংযুক্ত করা হয়। সময়ের প্রয়োজনে ইংরেজি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অতঃপর ১৮৩১ সালের দিকে মাদরাসার পাঠ্যসূচির মধ্যে ছিল ইংরেজি, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি।[১৬] এ সময়ের মধ্যে জেনারেল

---

[১০] আব্দুল ওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ: ৯৪-৯৫।

[১১] আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ শাসন নীতি ও বাংলার মুসলমান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), পৃ: ১৮৯।

[১২] সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যয়, *উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন* (কলিকাতা: রত্না প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ: ১২।

[১৩] তদেব, পৃ: ১২।

[১৪] A.F Salahuddin Ahmed, *Social ideal and Social changes in Bengal*, 1918-1935, (Leoden : E.J. Rrill, 1965)P. 133.

[১৫] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *তৃতীয় খণ্ড* (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, চতুর্থ সং), পৃ: ১১৯।

[১৬] তদেব, পৃ: ২০৮।

শিক্ষা কমিটির এ বিশ্বাস জন্মে যে একমাত্র মাদরাসাই হচ্ছে উপযুক্ত স্থান যেখানে পাশ্চাত্য সাহিত্য শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মুসলিম সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলন হতে পারে।

১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে উৎসাহী হিন্দু যুবকদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম করা হয়েছে। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষা বৃটিশ সরকার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কেবল মাত্র কলকাতায় ২৫টির মত ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।[১৭] এক্ষেত্রে মিশনারিদের কার্যক্রম এত ব্যাপক ছিল যে, ১৮৩০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কে "Age of the mission schools" বলা হয়।[১৮] জনগণের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ লক্ষ্য করে ইংরেজ ও ভারতীয়দের যৌথ উদ্যোগে বহু ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।[১৯] এরই ধারাবাহিতায় ১৮২০ সালে কতকাতায় লর্ড বিশপ একটি কলেজ স্থাপন করেন। এমনকি হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ও নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছে এবং ১৮৩১ সালে কলকাতার বিভিন্ন অংশে ৬টি প্রাতঃস্কুল তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।[২০] এসব স্কুলে যে বিষয়গুলি পঠিত হতো তার মধ্যে ইংরেজি সাহিত্য ছাড়াও ভূগোল, দর্শন (ভারতীয় ও ইউরোপীয়), ইতিহাস (প্রাচীন ও আধুনিক), চিত্রকলা, হস্তলিপি এবং বিভিন্ন শিল্প ও চারুকলা উলেখযোগ্য।[২১] মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করা হতো এবং সে অনুপাতে তাদেরকে গ্রেড প্রদান করা হতো। মেধাবী ছাত্রগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ছিল।[২২] শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হবে কিংবা স্থানীয় ভাষা হবে তা নিয়ে প্রাচ্যভাষাবিদ এবং ইংরেজি ভাববাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার প্রাচ্যভাষাবিদদের দাবি উপেক্ষা করে ১৮৩৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষা হিসেবে

---

[১৭] R.C. Majumdar, *Gilmpses of Bengal in the Nineteenth Century* (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyaya), P. 28.

[১৮] J.A. Richter, *History of School in India* (London, 1908), P. 183; M. Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (Chittagong: The Mehrub Publication, 1965), P. 65.

[১৯] M.A. Larid, *Missionaries and Education in Bengal 1793-1837* (Oxford: University Press, 1972), P. 268.

[২০] M. Fazlur Rahman, *The Bengal Muslim and English Education* (Dacaa: Bangla Academy, 1973), P. 41.

[২১] A.K.M Yaqub Ali, "Oriental and Western Education in Bogra District: from the Second Half of 19th Century to mid 20th Century A.D.", *University Grants Commission Research Project* (Rajshahi: Rajshahi University, 1986), P. 9.

[২২] *Ibid.*

চালু করে। ফলে যেসব মুসলিম যুবক আরবী ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তারে জন্য সরকারি চাকুরীর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২৩]

অর্থনৈতিক দৈন্য, হিন্দু জমিদার শ্রেণীর অস্পৃষ্য নীতি সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ রক্ষা সর্বোপরি ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে বাংলার মুসলমানগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। ১৮৪১ সালে বাংলার মাদরাসা, স্কুল ও কলেজে মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৪,০৩৪ জন। এর মধ্যে ৩,১৮৮ জন হিন্দু ৭৫১ জন মুসলমান।[২৪]

১৮৪১ সালের ৩১ এপ্রিলের হিসেবে সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্রসংখ্যা জাতি ধর্ম বিশেষে প্রদর্শিত হলো।[২৫]

সারণী : ৩/১

১৮৪১ সালের সরকারী স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিসংখ্যান

প্রতিষ্ঠানের নাম	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যান্য	সর্বমোট
হিন্দু কলেজ	৫৫৭	০	০	৫৫৭ জন
মেডিক্যাল কলেজ	৫১	৩	২৫	৭৯
মাদরাসা	০	২৫২	০	২৫২
সংস্কৃত কলেজ	১২৩	০	০	১২৩
হুগলী কলেজ ও মাদরাসা	৭৩৫	৩২৫	১	১০৭৬
হুগলী শাখা স্কুল	৩০০	৯২	১	৩৯৩
হুগলী শিশু স্কুল	৪৮	৮	৪	৬০
সীতাপুর স্কুল	৭৫	০	০	৭৫
ত্রিবেনী স্কুল	৯৭	০	০	৯৭
উমেরপুর স্কুল	৮৬	০	০	৮৬
রাকুড়া স্কুল	১৭০	১১	২	১৮৩
যশোর স্কুল	১৫৩	১	২	১৫৬
ঢাকা কলেজ	১৯৯	৩৯	১৯	২৫৭
কুমিল্লা কলেজ	৭৩	৭	৫	৮৫

[২৩] *Imperial Gazetter of India*, vol. I (Calcutta, 1909), P. 152.

[২৪] এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১২।

[২৫] ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২), পৃ: ৩০৩।

চট্টগ্রাম কলেজ	৯৪	৬	৮	১০৮
বুয়ালিয়া কলেজ	১৮২	১	৩	১৮৬
বরিশাল কলেজ	৪১	০	৪	৪৫
সিলেট কলেজ	৭৩	২	১	৭৬
মেদেনী পুর কলেজ	১৩১	৪	৫	১৪০
সর্বমোট	৩১৮৮	৭৫১	৮৫	৪০৩৪

উপর্যুক্ত সারণীতে বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে হিন্দু ছাত্র এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা মুসলমান ছাত্র সংখ্যার চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশী। আলোচিত ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩১৮৮ জন, মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৫১ জন (তাও আবার মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীসহ) এবং অন্যান্য ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৫ জন। এছাড়া অনেক স্কুল কলেজ ছিল যেখানে একজন মুসলিম ছাত্রও ছিল না। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী বলতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম এবং ইউরোপীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানগণ শিক্ষার প্রতি ছিল হিন্দুদের চেয়ে অনেক পেছনে। বিহারের পাটনা ও ভাগলপুর স্কুলেও মোট হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ১১৭ জন, মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন এবং অন্যান্য ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২ জনের তথ্য পাওয়া যায়।[২৬] অনুরূপভাবে ১৮৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিলের হিসেবে সরকারী স্কুল কলেজে ছাত্র সংখ্যা জাতি ধর্ম বিশেষে একটি হিসেব উল্লেখ করা যায়।

সারণী : ৩/২

১৮৪৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলার সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিসংখ্যান

প্রতিষ্ঠানের নাম	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যান্য	সর্বমোট
মেডিকেল কলেজ	৪৫	২	২০	৬৭
মাধ্যমিক স্কুল	১০	৯০	০	১০০
হিন্দু কলেজ	৫১০	০	০	৫১০
স্কুল সোসাইটি স্কুল	৪৮৩	০	০	৪৮৩

[২৬] এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ: ১১২; ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬)*, পৃ: ৩০৩।

পাঠশালা	১৫৪	০	০	১৫৪
সংস্কৃত কলেজ	১৯৫	০	০	১৯৫
মাদরাসা	০	১৮০	০	১৮০
রশোপাগলা স্কুল	০	৩৪	০	৩৪
হুগলী কলেজ ও মাদরাসা	৫৫২	১৮২	১৩	৭৪৭
হুগলী শাখা স্কুল	২৫৪	৩৭	৪	২৯৫
হুগলী শিশু স্কুল	৪৩	৩	২	৪৮
সীতারাম স্কুল	৭৯	০	০	৭৯
ঢাকা কলেজ	২৬৩	১৮	২১	৩০২
চট্টগ্রাম স্কুল	৭৫	৫	১২	৯২
কুমিল্লা স্কুল	৯৬	১৪	৩	১১৩
সিলেট স্কুল	৪২	২	৪	৪৮
বুয়ালিয়া স্কুল	১২০	২	২	১২৪
মেদেনীপুর স্কুল	১৪২	৯	১	১৫২
নাযিয়ামত কলেজ	০	১৬	০	১৬
যশোর স্কুল	৫৯	২	২	৬১
কৃষ্ণনগর স্কুল	২৮৩	৩	৩	২৮৯
বর্ধমান স্কুল	৯২	৩	০	৯৫
বাকুড়া স্কুল	৪৫	০	০	৪৫
বারাসাত স্কুল	৯২	১	০	৯৩
হাউড়া স্কুল	২১২	৩	০	২১৫
	৩৮৪৬	৬০৬	৮৫	৪৫৩৭

১৮৪৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বিহার অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রী ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিসংখ্যান

প্রতিষ্ঠানের নাম	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র	অন্যান্য	সর্বমোট
প্রতিষ্ঠান	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	সর্বমোট
পাটনা কলেজ	২৪	৭	১৪	৪৫
ভগলপুর স্কুল	৬৭	২২	৩৭	১২৬
মোজাফরপুর স্কুল	২৭	৩	২	৩২
গয়া	১৬	১৪	০	৩০
সর্বমোট	৩৯৮০	৬৫২	১৩৮	৪৭৭০

লক্ষণীয় যে, ১৮৪৬ সালের ৩০ এপ্রিলের হিসেব মতে বাংলার স্কুল-কলেজ এবং বিহারের স্কুল-কলেজের মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৭৭০ জন এর মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ছিল ৩৯৮০ জন এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৫২ জন আর অন্যন্য ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৮ জন। উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা এবং বিহারে বৃটিশদের শিক্ষাকে মুসলমানরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। ১৮৪৬ সালে ঢাকা স্কুল এবং কলেজে ২৬৩ জন হিন্দু এবং ১৮ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ১৮৫০-৫১ সালে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৩৫৪ জন এ উন্নীত হয়। এ সময় মুসলমান ছাত্র ছিল ২৯ জন। ১৮৫৫-৫৬ সালে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৪৩১ তে উন্নীত হয়। কিন্তু মুসলিম ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ২৪ জনে দাঁড়ায়।[২৭] ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিলের হিসেবে সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্র সংখ্যা জাতি ধর্ম বিশেষে প্রদর্শিত হলো।[২৮]

সারণী- ৩/৩

১৯৫৬ সালের সরকারী স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিসংখ্যান

	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য	সর্বমোট
১। প্রেসিডেন্সি কলেজ	১২৭	০	৫	১৩২
২। হিন্দু স্কুল	৪৬২	০	০	৪৬২
৩। ফুলতুল্লাহ স্কুল	৫৬৭	০	৪	৫৭১
৪। মাদরাসা (আরবি)	০	৫৯	০	৫৯
৫। মাদরাসা (আধাপার্সিয়ান)	০	১১১	০	১১১
৬। কলিঙ্গা স্কুল	১২৪	১৫	৪	১৪৩
৭। সংস্কৃত কলেজ	৩৩৯	০	০	৩৩৯
৮। পাঠশালা	৩৪৫	০	০	৩৪৫
৯। মেডিকেল কলেজ	১৪৮	৯৬	৩৪	২৭৪
১০। হুগলী কলেজ	৪৫৫	৭	৬	৪৬৮
১১। হুগলী মাদরাসা	৪	১৭৫	০	১৭৯
১২। হুগলী শাখা স্কুল	১৬৯	৮	০	১৭৭

[২৭] Muhammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal*, (Dhaka : University of Dhaka 1978), P. 138. ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, পৃ: ৩০৭-৩০

[২৮] ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, পৃ: ৩০৭-৩০৯।

১৩। ঢাকা কলেজ	৩৯০	২৪	৪১	৩৫৫
১৪। কৃষ্ণনগর কলেজ	২৪০	৭	০	২৪৭
১৫। বাহরামপুর কলেজ	২২৭	১০	৫	২৪২
১৬। হাওড়া স্কুল	২২৯	৩	৪	২৩৬
১৭। উত্তরপাড়া স্কুল	২০৩	০	০	২০৩
১৮। বীরভূম স্কুল	১০৪	১০	০	১১৪
১৯। মেদেনীপুর স্কুল	১৪৫	১০	০	১৫৫
২০। বাকুড়া স্কুল	১৪৬	১	০	১৪৭
২১। বুয়ালিয়া স্কুল	১২৯	৫	০	১৩৪
২২। রুপ পাগলা স্কুল	৪০	৬৩	০	১০৩
২৩।বারাসাত স্কুল	১৯২৫	২	১	১৯৫
২৪। বারাকপুর স্কুল	১১৬	২	০	১১৮
২৫। যশোর স্কুল	১৩৪	৫	৩	১৪১
২৬। পাটনা স্কুল	১৪৪	৪	০	১৪৮
২৭। ফরিদপুর স্কুল	১০২	৪	০	১০৬
২৮। বরিশাল স্কুল	২০৯	২২	৩	২৩৪
২৯। কুমিল্লা স্কুল	৯৩	১৬	৭	১১৬
৩০। নোয়াখালী স্কুল	৬৬	১	৪	৭১
৩১। চট্টগ্রাম স্কুল	১৬৬	৪২	১৪	২২২
৩২। বগুড়া স্কুল	৮৫	৬	০	৯১
৩৩। দিনাজপুর স্কুল	১১৪	৮	৪	১২৬
৩৪। ময়মনসিংহ স্কুল	১৬৭	৯	৮	১৮৪
৩৫। সিলেট	১৫৭	৫	২	১৬৪
সর্বমোট	৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	৭২১৬

উর্পযুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ১৮৫৬ সালের বাংলার ৩৫টি স্কুল কলেজের সর্বমোট ৭২১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে হিন্দু ছাত্র ছিল ৬৩৩৮ জন; আর মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৩১ জন এবং অন্যন্য ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪৭ জন। এ সময়ে শিক্ষার বেশীরভাগই অগ্রসর ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গে তা সন্দেহাতীত ভাবেই লক্ষ্যণীয়।

অবিভক্ত বাংলার ১৮৬৫ এবং ১৮৬৭ সালে শিক্ষা রিপোর্ট থেকে ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৬৫ সালে এম.এ পরীক্ষায় হিন্দু ছাত্র পাশ করে ৯ জন এবং কোন মুসলমান ছাত্র পাশ করেনি। তেমনিভাবে ১৯৬৭ সালে ৪১ জন হিন্দু ছাত্র পাশ করে এবং মুসলমান ছাত্র পাশ করে মাত্র ১ জন। ঐ সালে আইন বিষয়ে ১৭ জন হিন্দু ডিগ্রী লাভ করে এবং কোন মুসলমান ছাত্র পাশ করেনি।[২৯]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সম্প্রসারণ তা সম্পূর্ণ কলকাতা ভিত্তিক শিক্ষা। এ কার্যক্রমে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা ছিল সীমিত। যতটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল তা মুসলমানগণ গ্রহণ করতে পারেনি। দরিদ্রতা, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায়।[৩০] এছাড়া ইংরেজরা পর্যায়ক্রমে মুসলিম জাতির উপর নির্যাতন চালিয়েছে। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের কোন আনুকল্য পায়নি।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানদেরকে হতাশা-বঞ্চনা এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে আত্মসম্বিৎসু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সমাজকর্মী মনীষী নবাব আব্দুল লতিফ।[৩১] তিনি ১৮৬৩ সালে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি স্থাপন করেন এবং এই সালেই কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৮৭০ সালে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সদস্যভূক্ত হন। নবাব আব্দুল লতিফ বুঝতে পারেন যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদের অবস্থা উন্নতি হবে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি ভারতে কোন ভাষা শিক্ষাথীদের জীবনকে উন্নতি করাতে পারে তা হলে সেটি ইংরেজি ভাষা। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করলে মুসলমানরা অনেক রাজনৈতিক উপকার পাবে, সরকারী চাকরী করতে পারবে।[৩২] উনিশ

---

[২৯] রমেসচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ: ৫০; এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ১১৩।

[৩০] Pradip Kumar Lahiri, Bengali Muslim Thought (1818-1947) (Calcutta: K.P. Bagchi and company, 1991), P. 7.

[৩১] নবাব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আব্দুল লতিফ কলিকাতা মাদরাসায় বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষার পাশ করেন। তিনি মাদরাসা ইংরেজি শিক্ষা করেন। দ্র: ড. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারণা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩) পৃ: ৮৪।

[৩২] এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৩।

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগী হন নবাব আব্দুল লতিফ। নবাব আব্দুল লতিফের এ প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৮৫৩ সালে। তিনি সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদানে বিমুখ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা আনয়নের উদ্দেশ্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে একটি রচনা আহবান করেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা কতখানি সুবিধা জনক এই বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন।[৩৩] ১৮৬১ সালে লেফটেনেন্ট গর্ভনর স্যার, জি.পি. গ্রান্ট আব্দুল লতিফের নিকট হুগলী মাদরাসা সংক্রান্ত মুসলমানদের অভিযোগের বিষয়টি জানতে চায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল লতিফ মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা, মুসলিম শিক্ষিত সমাজের সমস্যা এবং মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে আরবি শিক্ষা সংযুক্তির বিষয় নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৪] ছোট লাট জে. পি. গ্রান্ট ১৮৬২ সালে হুগলী মাদরাসা ও মহসিন ফান্ডের বিষয়ে আব্দুল লতিফের সুপারিশ কার্যকর করতে অবহেলা করেন।[৩৫]

১৮৭৪ সালে নবাব আব্দুল লতিফ মহসিন ফাণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে মাদরাসা স্থাপন করেন। এর সাথে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী খরচে ১৮৫৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হলে সেখানে হিন্দু মুসলমান উভয়ের জন্য প্রবেশের দার উন্মুক্ত হয়। তার সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদরাসায় ইংরেজি-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।। কলিকাতা মাদরাসায় শুধু ভদ্র পরিবারের সন্তানেরা লেখা-পড়ার সুযোগ পেত, সাধারণ শ্রেণীর সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার জন্য কলিঙ্গায় একটি শাখামাদরাসা স্থাপিত হয়। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যে দেয়ার জন্য ২৮,০০০ টাকার বৃত্তি তহবীল গঠিত হয়।[৩৬]

মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন নবাব আব্দুল লতিফের জীবনের ব্রত ছিল। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষত মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে আমি আমার জীবনের

---

[৩৩] ওয়াকিল আহম্মেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পৃ: ৪৭-৪৮; Md. Mohar Ali, *Nawab Abdul latif khan bahadur Autobiography and other writings*, (Chittagong: The mehrub publications Reprint, 1968), P- 7.

[৩৪] ওয়াকিল আহম্মেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পৃ: ৪৭-৪৮, Abdul Latif, *A Short Account of My Humble Effort to Promote Education: Specially Among the Mohamedans*, P. 10; কাজী আব্দুল মান্নান, '*বাঙ্গালী মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলন*, বাঙ্গলা 'সাহিত্য', (ঢাকা : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) পৃ: ২০।

[৩৫] এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬।

[৩৬] ড. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬-৮৭।

শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলো নিয়োগ করেছি। ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে শিক্ষা বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। আব্দুল লতিফ হান্টার কমিশনের নিকট মুসলমানদের শিক্ষার বিষয় উপস্থাপন করেন এবং বলেন মুসলমানেরা এখন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল, কিন্তু তাদের দরিদ্রতা তাদের শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়।[৩৭] এভাবে নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং দরিদ্র ও মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষালাভের কাজে সাহায্যে করার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন।[৩৮]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজের ত্রানকর্তার অন্যতম আর একজন নেতা ছিলেন সৈয়াদ আমির আলী।[৩৯] নবাব আব্দুল লতিফের পর সৈয়দ আমীর আলী মুসলমান সম্প্রদায়ের নব জনগরণের জন্য এগিয়ে আসেন। আব্দুল লতিফ ইংরেজি শাসনের সহযোগিতায় মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন। তার চিন্তাধারা একেবারে রাজনীতি মুক্ত ছিল। আমির আলীর চিন্তাধারা রাজনীতি সচেতন ছিল। তার প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এসোসিয়েশনের বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে।[৪০] সৈয়দ আমির আলীর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার দ্বারা এ সংগঠনটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষেই একটি কার্যকরী রাজনৈতিক এসোসিয়েশনে পরিণত হয়।[৪১]

শিক্ষার মশাল হাতে নিয়ে মুসলমান সমাজের আধুনিকীকরণে ব্রতী হন সৈয়দ আমির আলী। তিনি ইসলামী ও পাশ্চত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন।[৪২] তিনি আরবি ফারসির সাথে ইংরেজি নয় রবং সরাসরি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের পক্ষপাতি ছিলেন। সৈয়দ আমির আলী ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের কার্যধারা সামাজিক বিষয়দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ১৮৯২ সালে এই সংগঠন ব্যাপক হারে মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[৪৩]

---

[৩৭] এম. এ. আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ: ১২৭।

[৩৮] ওয়াকিল আহম্মেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পৃ: ২৮৬-২৮৭।

[৩৯] *তদেব* , পৃ: ৯৫-১০০ ; মোঃ আব্দুর রহিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)*, পৃ: ৩৯৩।

[৪০] Rafiuddin Ahmed, "*The Role of Associations and Anjumans in the Political Mobilization of the Bengali Muslims in the Later Nineteenth Century, Bangladesh Historical Studies*", Journal of the Bangladesh Itihas Samiti, Vol-IV, 1979, P. 37.

[৪১] Ibid, P: 37-38.

[৪২] এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, পৃ: ১৩১-১৪১।

[৪৩] *তদেব*, পৃ: ১৩৫।

সৈয়দ আমির আলী ১৮৮১ সালে এক পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট আলোচনা করেন।[৪৪]

সৈয়দ আমির আলী ১৮৮২ সালে স্মারক পত্রে এবং ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চ বড় লাটের ব্যাক্তিগত সচিবকে লিখিত পত্রে মুসলমানদের চাকরীর জন্য সংরক্ষিত সুবিধা চেয়েছেন।[৪৫] তিনি ১৮৮৫ সালে স্মারক লিপির একটি নকল কপি হান্টার কমিশনকে দেন। হান্টার কমিশনের উপর ভিত্তি করে ১৮৮৫ সালে ১৫ই জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফারিনের সময় ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সর্ম্পকে এক প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পৃথক আলোচনা ব্যবস্থা থাকবে এবং এতে ভারত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সময়োচিত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য পযার্প্ত বৃত্তির প্রয়োজন স্বীকৃত হয়।[৪৬]

অপর দিকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ভাবপ্রবণতা বিষয়টি বিবেচনা করে মাদরাসা পাঠ্যক্রম সংস্কারের এক উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকার অনুষ্ঠিত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে নবাব স্যার সৈয়দ শামছুল হুদা মাদরাসা পাঠ্যক্রমে সংস্কারের এক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করে।[৪৭] সর্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহীত হয়। ১৯১৫ সালে আবু নসর ওহীদের নেতৃত্বে 'নিউস্কীম' প্রবর্তিত হলে মাদরাসা শিক্ষার পথ সুগম হয়।[৪৮] এই স্কীম অনুযায়ী মাদরাসার ক্লাসগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১। জুনিয়র ক্লাস

২। সিনিয়র ক্লাস।

উর্দ্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, আরবি সাহিত্য, ড্রইং, হস্তশিল্প ও ড্রিল সিলেবাসভুক্ত ছিল। সিনিয়র ক্লাসের জন্য আরবি সাহিত্য, ইংরেজি ও অংকের উপর সর্বশেষ গুরুত্বরোপ করা হয়।[৪৯]

---

[৪৪] *তদেব।*

[৪৫] ড. ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৬।

[৪৬] এম. এ. আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭),* প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬-১৩৭।

[৪৭] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী,১৯৯৯), পৃ: ১৫৭-১৫৮।

[৪৮] মোঃ আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ: ২৩৭।

[৪৯] তাদের, পৃ: ২৩৫-২৩৬।

৩.৪ ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষা

বাংলার অন্যান্য স্থানের মত ফরিদপুর জেলাতে অতীতের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মূলত পরিবার কেন্দ্রীক। এছাড়া স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্থানে পাঠশালার গুরুগৃহে শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষককে গুরু ও ওস্তাদজী নামে সম্বোধন করা হতো। অনেক স্থানে গুরুজন শিক্ষার কাজে জায়গীর থাকতেন। অনেক সময় শাসকদের আনুকূল্যে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। ঐ সময়ের কোন নিদিৃষ্ট পাঠ্য বিষয় ছিল না। মূলত ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষার প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল টোল, খানকা, মক্তব, মাদরাসা, মাজার, মসজিদ।[৫০]

৩.৪.১ খানকা

এদেশে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে যখন মসজিদ বা মাদরাসার অস্তিত্ব ছিলনা সঠিকভাবে কোন সভা-সমিতিও প্রচলন ছিল না। তখন ইসলাম প্রচার ও প্রশিক্ষণে একমাত্র মাধ্যম ছিল খানকা। বিভিন্ন তরীকার পীর মাশায়েখ এ খানকার মাধ্যমে দেশের লোকজনের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন।

খানকা মূলত ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার অনুশীলন কেন্দ্র। অর্থাৎ এখানে আল্লাহর একত্ববাদ, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও ইসলামের বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দান করতেন। এমনকি খানাকায় ধর্মীয় ও আধ্যাতিক শিক্ষা দান করা হতো।[৫১] ফরিদপুর জেলায় ইসলামের প্রচার শুরু হয় খানকার মাধ্যমে। হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর (১১৭৭-১২৫৯) সম্ভবত খানকার সুচনা করেন। বর্তমানে ফরিদপুর শহরের শাহ্ ফরিদের দরগাহ নামে যে স্থানটুকু এক শ্রেণীর মানুষ পবিত্র স্থান বলে মনে করে সেখানেই এ জেলায় ইসলাম প্রচারের প্রথম সূচনা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত ছিলো বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীতে সেখানে একটি মসজিদ ও ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকে মুসলিম বাংলায় রাজত্বের সময় ফরিদপুর শহরের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্ত পার হয়ে গেরদা গ্রামে পরবর্তীকালে খানকা গড়ে ওঠে।[৫২]

---

[৫০] Dr. A.K.M Ayyub Ali, *History of traditional Islamic Education in Bangladesh*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh), P. 12.; মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃ: ৯৮।

[৫১] মোঃ আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৮।

[৫২] তদেব, পৃ: ৯৯।

৩.৪.২ মসজিদ

মুসলমানদের সম্মেলনের পবিত্র স্থান হলো মসজিদ। নামাজ আদায় ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডও এ মসজিদ থেকে পরিচালিত হতো। ফরিদপুর জেলায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে আউলিয়া কেরাম কোন রাস্তার মোড়ে, উন্মুক্ত গাছতলায় কিংবা মুসাফির খানার পাশে তাবু খাটিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। ফলে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রাথমিক সময়ের এসব মসজিদের ইতিহাস না পাওয়া গেলেও কিছু পুরাতন মসজিদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে বোয়ালমারী থানার সাতৈর মসজিদ, এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। ভাংগা থানার পাথরাই মসজিদ এটা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তৈরি হয়েছে। পাথরাই মসজিদ সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন ও তার পুত্র নুসরাত শাহের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোটালীপাড়া থানার বহালতলী মসজিদ এটি কখন নির্মিত হয়েছে এ সর্ম্পকে মতভেদ আছে তবে কেউ কেউ বলেন, সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালে কুতুবউদ্দীন আইবেক মসজিদটি নির্মাণ করেন। আজ ও মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে।[৫৩]

বর্তমানের মসজিদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত ১৯৮৩-৮৪ সনের ফরিদপুর জেলার মসজিদ শুমারী অনুযায়ী ফরিদপুর জেলার মসজিদের একটি পরিসংখ্যান নিম্নরুপ।[৫৪]

সারণী-৩/৪

মসজিদের পরিসংখ্যান

মোট সম্পত্তির ধরণ	মোট	পাকা		আধাপাকা		কাঁচা	
		জামে মসজিদ	ওয়াক্তিয়া মসজিদ	জামে মসজিদ	ওয়াক্তিয়া মসজিদ	জামে মসজিদ	ওয়াক্তিয়া মসজিদ
ওয়াকফ্ সম্পত্তি	৩৮৭৪	৯৩	২০	৫৯৭	২৮	২৩৫০	৫৮৬
পাবলিক	৪৭৪১	১৮৪	১২	৪১৮	৪১	১৬৪৬	০৮
সরকারী-	৫৯	২১	০১	১০	০৪	১৫	-
মোট	৮০৮০	৪৯৮	৩৩	১০২৫	৭৩	৪০১১	২৪৪০

ফরিদপুর জেলায় (বৃহত্তর) ৮০৮০টি মসজিদ রয়েছে। মসজিদসমূহের মধ্যে পাকা মসজিদের সংখ্যা ৫৩১ টি। এর মধ্যে জামে মসজিদ ৪৯৮ টি আধাপাকা মসজিদের সংখ্যা ১০৯৮ টি

---

[৫৩] আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

[৫৪] আব্দুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

যার ১০২৫ টি জামে মসজিদ এবং কাঁচা ঘরের মসজিদ ৬৪৫১ টি যার মধ্যে ২৪৪০টি ওয়াক্তিয়া। সর্বমোট ৮০৮০ টি মসজিদের মধ্যে জামে মসজিদের সংখ্যা ৫৫৩৪ টি এবং ওয়াক্তিয়া মসজিদের সংখ্যা ২৫৪৬ টি। ২০০ জন থেকে ৪৯৯ জন মুসল্লী পর্যন্ত নামাজ পড়তে পারে এরূপ মসজিদের সংখ্যা ২৮৩ টি।

৩.৪.৩ মক্তব

খানকার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা সুচনা হলেও মক্তবের মাধ্যমেই তা স্থায়িত্ব লাভ করে। মুসলিম আমলে মক্তব শিক্ষা মূলত দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। তখন প্রতিটি মসজিদে মক্তব শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ জন্য সরকারী অনুদান ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালে বৃটিশ কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মক্তব মাদরাসার লাখেরাজ সম্পত্তি যখন জমিদারদের আওতায় চলে যায়, তখন এ মক্তব্যে শিক্ষা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ধর্মজ্ঞান থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চরের মত ফরিদপুরের মুসলমানারাও অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছিল।[৫৫] ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান হওয়ার পর পুনরায় কিছু কিছু মক্তবের সৃষ্টি হয়। ফরিদপুর জেলা বোর্ড থেকে কিছুকাল পর্যন্ত মক্তবের শিক্ষকের জন্য একটি নূন্যতম ভাতাও প্রদান করা হয়েছিল।[৫৬]

মক্তবে সাধারণত ইসলামের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে প্রধানত আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য কলেমা, মোনাজাতের জন্য প্রয়োজনীয় দোয়া, নামাজ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী, অনেক ক্ষেত্রে সুরা ফাতেহাসহ পবিত্র কোরআনের ৩০ পারা থেকে কম পক্ষে ১০ থেকে ১৫টি সুরা মুখস্ত করানো হয় এবং তাজবীদসহ কোরআন মাজীদ হাদর ও তারতীল নিয়মে শিখানো হয়ে থাকে।[৫৭] এতদসত্ত্বেও এ জেলার অনেক জায়গায় এখনো মক্তবের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে।

৩.৪.৪ মাদরাসা শিক্ষা

---

[৫৫] Dr. A.K.M Ayyub Ali, *History of Traditional Islam Education in Bangla*, P. 13.

[৫৬] আবদুস সাত্তার, *ফরিদপুরে ইসলাম*, পৃঃ ১০৯-১০।

[৫৭] *তদেব*, পৃঃ ১১০।

ইসলামী জ্ঞান আহরণের অন্যতম উৎস হলো মাদরাসা-শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এ শিক্ষার ব্যবস্থা সময়ের প্রেক্ষিতে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশা-পাশি স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীসহ ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিকশিত করে। আলিয়া মাদরাসার ধারা বৃটিশ ভারতে ১৭৮০ সালে মোল্যা জালাল উদ্দিনের প্রচেষ্টায় প্রথম কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তার নাম কলকাতা আলীয়া মাদরাসা। পরে বাংলাদেশ ও আসাম পর্যন্ত ধীরে ধীরে এ শিক্ষা পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে।[৫৮]

ফরিদপুর জেলায় প্রথম আলীয়া মাদরাসা স্থাপিত হয় বাহাদুরপুর গ্রামে। এ মাদরাসাটি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম নেতা পীর বাদশা মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহ্র নামে বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া আলিয়া মাদরাসাটির নামকরণ করেন। ১৯৪৭ সালে ইসলামী হুকমত কায়েমের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র দেড় দশক পুর্ব থেকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে ৪ জুলাই বাংলাদেশ মাদ্রসা শিক্ষাবোর্ডকে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করায় এ শিক্ষার যুগোপযোগী চিন্তাধারা কার্যকর রূপ লাভ করে।[৫৯]

মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণ তথা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসহ বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান মাদরাসা শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মাদরাসায় ১৬ বছরের লেখাপড়া করে এখন আর সাধারণ শিক্ষার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার প্রযোজ্য হয় না। এখন মাদরাসায় কামিল পাশ করলে এম.এ. মানের শিক্ষায় শিক্ষিত বলে সাধারণত ধরে নেয়া। ১৯৮০ সনের দিকে এই শিক্ষায় নতুন কারিকুলাম ও নতুন মান নির্ধারিত হওয়ার পর মুসলিম জনতা ইসলামী শিক্ষার উপর সুদৃষ্টি রেখেছে। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে গত দেড় দশকে প্রচুর মাদরাসা গড়ে উঠে। সমগ্র ফরিদপুর জেলার ১৭৬টি আলিয়া মাদরাসার মধ্যে ৮৫টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮০-১৯৯০ সনের মধ্যে।[৬০]

---

[৫৮] Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetter, Faridpur, PP. 232.

[৫৯] আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরের ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।

[৬০] তাদের, পৃ: ১১৩।

৩.৪.৫ টোল শিক্ষা

ফরিদপুরের জেলার সনাতন শিক্ষার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা ছিল টোল ও সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার জন্য *বৈদিক যুগে* আর্য বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়েছিল। বেদ, উপন্যাস, গীতা, প্রভৃতি পুস্তক ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো। বৈদিক যুগে ছাত্ররা চতুরা শ্রম ব্যবস্থা ছিল। তদানুসারে ছাত্রগণ গুরুগৃহে বসে অধ্যায়ন করতো এ সময়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হতো।[৬১] এ বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার সংগে গাহস্থ্য জীবনের অনেক জ্ঞান ও নীতি উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হতো। সরকার টোল শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রান্ট[৬২] দিয়ে ছিলেন। যে সমস্ত বিষয় এখানে শিক্ষা দিয়ে হতো তা হচ্ছে ঃ কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, বেদন্ত প্রভৃতি প্রধান। আর্যবিদ্যাপিঠ বা টোলের শ্রেণী বিন্যাস তিনটি (১) আদ্য (২) মধ্য (৩) উপাধি। উপাধি গ্রহণের এবং অতিরিক্ত শিক্ষা লাভের ব্যবস্থাও ছিল।[৬৩]

১৯৬৬-৬৭ সালের পরিসংখ্যানে ফরিদপুর জেলায় ৪টি সংস্কৃত টোলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২২ জন এবং প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে ব্যয় হয়েছিল ১২,১৮২.০০ টাকা। এর মধ্যে ১,৬৮০.০০ টাকা সরকারী তহবিল থেকে, ৩৬০.০০ টাকা ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল থেকে এবং ১০,১৪২.০০ টাকা অন্যান্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছিল।[৬৪] ১৯৮৪ সালের পরে টোল শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ.হ্রাস পেতে থাকে।

৩.৫ ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষা

কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অঞ্চল বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় মফস্বল এলাকা হলেও বৃটিশরা বাংলায় আধুনিক শিক্ষা বিকাশে এ অঞ্চলকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করে। সে কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে, ১৮০১ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার (বর্তমান রাজবাড়ী জেলা) মুসলিম জমিদার পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলী কুষ্টিয়াতে

---

[৬১] আসাদুজ্জামান আসাদ, *যশোর জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ১৯৮৯), পৃ: ১৫৯।

[৬২] গ্রান্ট বলতে টাকা বা জমির মতো প্রদত্ত বা মঞ্জুরকৃত বস্তু। দ্র: আসাদুজ্জামান আসাদ, *যশোর জেলার ইতিহাস*, পৃ: ১৫৯।

[৬৩] *তদেব*, পৃ: ১৫৯।

[৬৪] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, P. 232.

স্যার সৈয়দ আহম্মদের অনুসরণে ১৯১৮ সালে একটি ইংলিশ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৫] এটি বাংলা অঞ্চলের প্রথম ইংলিশ হাইস্কুল তথা উপমহাদেশের দ্বিতীয় ইংলিশ হাই স্কুল বলে জানা যায়। কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি বর্তমানে কুষ্টিয়া জিলা স্কুল নামে পরিচিত।

ফরিদপুর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ফরিদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ১৮৩৬ সালের কাছাকাছি সময়ে একটি ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সূচনা লগ্নে এটি কাঁচা ঘরে পাঠদান শুরু হলেও ১৮৪০ সালে সেখানে একটি পাকা বিল্ডিং তৈরী করা হয়। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে কোন ইংরেজি শিক্ষিত লোক না থাকায় স্কুলের সূচনালগ্ন থেকে দুইজন ইউরোপীয়ান শিক্ষাবিদ এ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের একজনের নাম ফ্রানকয়েস লেফেবরা।[৬৬] স্কুলটি সফলতার সাথেই আধুনিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্কুলের সফলতার পথ ধরেই ১৮৪০ সালে নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর তত্ত্বাবধানে গোয়ালন্দ মহকুমার প্রাণকেন্দ্রের পদমদীতে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমান রাজবাড়ী জেলার এটিই প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৬৭] এটি ১৯৭৩ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এই স্কুলটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

আধুনিক শিক্ষা প্রসারে বৃটিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহের সবগুলিই ইংলিশ স্কুল ছিল না। বাংলা মিডিয়াম স্কুলেও ইংরেজি বাধ্যতামুলক সিলেবাসভূক্ত পাঠদানের মাধ্যমে কোন কোন স্কুল পরিচালিত হয়েছে, যাকে ভার্নাকুলার স্কুল বলা হয়। এ সূত্রে ১৮৫১ সালে ফরিদপুরের তৎকালীন ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ভগবান চন্দ্র বসু ও সেরিস্তাদার চন্দ্র মোহন মৈত্র স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ফরিদপুর শহরের একটি মিড্‌ল ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৮৮৯ সালে এটি মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলে রুপান্তরিত করা হয়। এ ভার্নাকুলার স্কুলেরই গর্বিত ছাত্র ছিলেন জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু; কোলকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র এবং হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঈশান চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।[৬৮] ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা ছিল ভার্নাকুলার (Vernacular) স্কুল

---

[৬৫] স্মরণিকা, শতবর্ষ পূর্তি, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, গোয়ালন্দ হাইস্কুল (১৮৯২-১৯৯২), পৃ: ১৫।

[৬৬] *বার্ষিকী*, ২০০১, ফরিদপুর জিলা স্কুল, ফরিদপুর, পৃ: ৭৮।

[৬৭] *স্মরণিকা,* শতবর্ষ পূর্তি, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ হাইস্কুল (১৮৯২-১৯৯২), পৃ: ১৫।

[৬৮] *শতবর্ষ স্মারক,* ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় (ফরিদপুর, ১৯৯২), পৃ: ১৩।

শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯০১-০২ সালে ফরিদপুর জেলায় এ ধরনের স্কুল ছিল ৩৭ টি। ১৯২২-২৩ সালে ৮টি মাধ্যমিক ভার্নাকুলা স্কুল ছিল। ১৯২২-২৩ সালে মোট তালিকাভূক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৬৪৪ জন এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩৮ জন।[৬৯]

সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষা সম্প্রসারণে বৃটিশ প্রশাসনের সদিচ্ছার সাথে স্থানীয় এলিট শ্রেণী শিক্ষা কর্মসূচীর সম্প্রসারণকল্পে আন্তরিকভাবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮৮ সালে গোয়ালন্দ এলাকার দ্বিতীয় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রথম হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ীর জমিদার রাজা সূর্যকুমার রায় বাহাদুর এর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলের নামকরণ করা হয় রাজা সূর্যকুমার স্কুল বা 'আর এস কে স্কুল'।

উল্লেখ্য যে, রাজা সূর্য কুমার রায় বাহাদুরের সঙ্গে বানি বহর জমিদার বাবু গীরিজা শংকর মজুমদার ও তার ভাই বার অভয় শংকর মজুমদারের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং এ প্রেক্ষাপটে তাদের উভয়ের মধ্যে জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা প্রায়ই লেগে থাকত। কোন এক মামলায় রাজা সূর্যকুমার পরাজিত হন এবং মামলার খরচের জরিমানা হিসেবে জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদারকে ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা প্রদান করেন। ঐ টাকা দিয়েই জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদার নিজস্ব জমির উপর ১৮৯২ সালে 'দি গোয়ালন্দ হাই ইংলিশ স্কুল' নামে একটি ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

এখানে স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে এটি একটি হোটেল ও জমিদার বাবুর ডাকবাংলো ছিল। কালকাতা থেকে বানিবহর আসা যাওয়ার পথে তিনি ঐ ডাকবাংলোয় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। গোদারবাজার হতে নদী পথে তখন কোলকাতা যাওয়া লাগতো। তখন এ এলাকার নাম ছিল 'সজ্জনকান্দা'। রাজবাড়ী বলতে শুধু লক্ষ্মীকোল বাজার বাড়ী বোঝাতো।[৭০]

শরীয়তপুর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য শরীয়তপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র গুরুদাস বাবু একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শচীনাথ রায় চৌধুরী তার পিতা গুরুদাস রায় চৌধুরী মৃত্যুর পর সেই স্কুলটি পিতার নামানুসারে পালং তুলসার গুরুদাস উচ্চ ইংলিশ স্কুলে রূপান্তরিত করেন। ১৯০৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তুলাসার গুরুদাস উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন বরিশালের জমিদার বংশের ভবেশ চন্দ্র ঘোষ। প্রথম থেকেই স্কুলের গরীব মেধাবী ছাত্রদের থাকা খাওয়ার জন্য একটি বোডিং এর ব্যবস্থা

---

[৬৯] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, P. 223.

[৭০] স্মরণিকা, শতবর্ষ পূর্তি, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পৃ: ১৫-১৬।

করেছিলেন। ভবেশ চন্দ্রের আমলে আর্থিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং অবকাঠামোভাবে যেমন বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি হয় তেমনি ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদ্যালয়ের আয়েই শিক্ষক সংখ্য প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়েছিল।[৭১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৮৫ সালে মাদারীপুর হাইস্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপিত হয় আড়িয়াল খাঁ নদীর উত্তর পাড়ে। তখন মাদারীপুর শহরটি ওখানেই ছিল। নদী ভাঙ্গনের ফলে শহরটি বিলীন হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে কলেজ রোডের পশ্চিম প্রান্তে যে স্থানে পাবলিক হেল্থ এর গুদাম অবস্থিত সেই জায়গায় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯১৩ সালে) বর্তমান নাজিম উদ্দিন কলেজ যে স্থানে রয়েছে, সেখানে ইসলামিয়া হাই স্কুল নামে আর একটি হাই স্কুল স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে ইসলামিয়া হাই স্কুল তার নিজস্ব জায়গা কলেজকে ছেড়ে দিয়ে মাদারীপুর হাই স্কুলের সাথে মিশে যায়। এ কারণে দু'টি স্কুলের মিলিত নাম ইউনাইটেড ইসলামিয়া মাদারীপুর হাই স্কুল। এটি একটি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুল।[৭২] অনুরূপভাবে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণে ফরিদপুর শহরের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯১৮ সালে ফরিদপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ স্কুলের পাঠদানের মাধ্যমে অত্র ফরিদপুর অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার ভাল পরিবেশ পেয়েছে।[৭৩] অনেক প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ১৯৬১সালের মধ্যে ফরিদপুরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠির সংখ্যা চোখে পড়ার মত ছিলো।

সারণী-৩/৫

১৯৬১ সালের সেনসাসের রিপোর্ট অনুযায়ী ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা[৭৪]

Sl No	Grate	Total	Male	Fe-Male
1.	Post Graduate	189	180	9
2.	Graduate	794	783	11
3.	Under Graduate	1477	1438	39
4.	Matericulation	10870	10648	222

---

[৭১] প্রত্যয়, বার্ষিকী, ২০০৩, পালংতুলাসার গুরুদাস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শরীয়তপুর, পৃ: ৩।

[৭২] সাময়িকী, ২০০১, ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি ইচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর, পৃ: ভূমিকা-১।

[৭৩] প্রয়াস, বার্ষিকী, ২০০৩, ফরিদপুর সরকারি বালিণকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর, পৃ: ১।

[৭৪] *তদেব*।

১৯৭০-৭১ সালে ফরিদপুর জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৪৭৩টি এর মধ্যে মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ১৫৯। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,৫৫,৫৫৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭২,৯৯৭ জন। শিক্ষক সংখ্যা ছিল-৯৬৪৫ জন। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট ২২৪ জন।[৭৫] ফরিদপুর জেলায় ১৯৭৩ সালে।

৩.৫.১ প্রাইমারী শিক্ষা

১৯২২-২৩ সালে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ফরিদপুর ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯২২-২৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুল সংখ্যা ছিল ২৩৮৮টি। এর মধ্যে Upper Primary School ৭৩টি। এতে অধ্যয়নরতন ছাত্র-ছাত্র ছিল ৭০,৪২৮ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১৯,৯৮৮ জন। ১৯৪৭-৪৮ সেশনে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ছিল ১,৪৯,৬৬০ জন। ১৯৫৯-৬০ সেশনে প্রাইমারী স্কুল ছিল ১,৫০৮টি এবং এর ছাত্র-ছাত্রী ছিল ১,৯২,৯৫৩ জন। ১৯৬৩-৬৪ সালে স্কুল ছিল ১৬২২ টি, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,৪৫,০৪৮ জন, ১৯৬৫-৬৬ সালে স্কুল ছিল ১৬২৮ টি, ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২,৪০,৭৩৬ জন এবং ১৯৭০-৭১ সালে স্কুল ছিল ১৬৭০ টি, ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২.৪০,২৮০ জন।[৭৬]

১৯৭০-১৯৭১ সালে ফরিদপুর জেলায় প্রাইমারী শিক্ষক ছিল ৫,৭১১ জন। এর মধ্যে মহিলা শিক্ষক ছিল ৪২ জন। ২০৭ জন এইচ এস সি পাস বা সমমানের পাশের মধ্যে ১৪২ জন ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ৪৯৮০ জন এস এস সি (Matric) অথবা সমমানের পাশের মধ্যে ৩৩৩২ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর ৯৪ জন ফাজিল পাস, ৩৭৬ জন ননমেট্রিক, এর মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩৩৬ জন।[৭৭]

ফরিদপুর জেলায় মোট ২টি Primary Training Institute (PTI) ছিল। এর মধ্যে ফরিদপুর জেলায় ১টি আর অন্যটি মাদারীপুর মহকুমায়। ফরিদপুর জেলায় ২ জন সুপারিনটেনডেন্ট ছিল এবং সহকারী সুপার ৪ জন ছিল। এরা ছিল খুব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। একজন শারীরিক শিক্ষক ছিল। একজন পার্ট টাইম ইনেসট্রেকটোর ছিল। ২০০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে ১৫০ জন প্রাইমারী শিক্ষক ও ৫০ জন অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ

---

[৭৫] Nurul Islam Khan, *Bangladesh Distrtict Gazetteers,* Faridpur, P. 219.

[৭৬] *Ibid*, p. 221.

[৭৭] *Ibid.* p. 221-222.

পেতা। ১৯৬৭-৬৮ সালে P.T.I-তে প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৩৪৫ জন। এর সাথে আবার ৩০৯ জন প্রশিক্ষণার্থী নতুন করে ভর্তি হয়। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হয় ৬৫৪ জন এর মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে ৩৪৪ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৩ জন। বাৎসরিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয় ১৬০,০০০.০০ টাকা।[৭৮]

৩.৫.২ মাধ্যমিক স্কুল

মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে দুইটি স্তরকে বুঝানো হয়েছে। জুনিয়র স্কুল ও হাইস্কুল। জুনিয়র স্কুল বলতে ষষ্ঠ শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তকে বুঝায়। মাধ্যমিক স্কুল বলতে নবম শ্রেণী ও দশম শ্রেণীসহ স্কুলকে বুঝায়। ফরিদপুর জেলায় ১৯০১-০২ সালে ৪০টি মিডিল ইংলিশ স্কুল আর ৩৭ টি মিডিল ভার্নাকুলার স্কুল ছিলো। ফরিদপুর জেলায় ১৯২২-২৩ সালে মিডিল ইংলিশ স্কুল ছিল ৭৮ টি আর ভার্নাকুলার স্কুল ছিল ৮টি। মোট ছাত্র ছাত্রীর ছিল ৫,৬৪৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ২৩৮ জন। ১৯২২-২৩ সালে আরও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় মাদারীপুরে। এটা স্থানীয় পৌরসভার দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৫৫ টি রেজিষ্ট্রার প্রাপ্ত মিডিল ইংলিশ স্কুল ছিল। এর মধ্যে ৪টি স্কুল সরকারী অনুদান দ্বারা পরিচালিত হতো। এ জেলার মধ্যে ১৯৪৭ সালে মিডিল স্কুলগুলো তৈরি করতে ব্যয় হয় ২,৬১,৩৫০.০০। মিডিল ইংলিশ স্কুলগুলোতে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮৯৯৩ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১৩৬৪ জন। ১৯৪৭-৪৮ সালে মিডিল ইংলিশ স্কুলের শিক্ষক ছিল ৮৪৬ জন। এর মধ্যে শিক্ষীকা ছিল ৩০ জন। ১৯৫৯-৬০ সালে ২৩ টি মিডিল স্কুল তৈরী হয় । এর মধ্যে ৮টি বালিকা মিডিল স্কুল ছিল মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৪০ আর ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯৬৪ জন।[৭৯]

১৯৬৭-৬৮ সালে ফরিদপুর জেলায় ৭৮ টি জুনিয়র হাইস্কুল ছিল। এর মধ্যে ১৪ টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে ২৮টি রেজিস্ট্রার প্রাপ্ত ছিল না। ফরিদপুর জেলায় জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী ছিল মোট ১১,৩৫৫ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ২৫৫৭ জন। শিক্ষক ছিল ৪৬১ জন। এর মধ্যে শিক্ষিকা ছিল ২৫ জন। ১৯৭১ সালে ফরিদপুর জুনিয়র হাইস্কুল ছিল ১০২টি এর মধ্যে ১৫টি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র ছাত্রী ছিল ৮,৭৩৬ জন এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ১,৮৭৬ জন।

---

[৭৮] *Ibid*, P. 232.

[৭৯] *Ibid*, P. 223.

সারণী- ৩/৬

১৯৬৩-৬৭ এবং ১৯৭০-৭১ সালে জুনিয়র হাইস্কুলের পরিসংখ্যান [৮০]

Year	No. Of Jr. High Schools			Enrolment		Teachers				Expenditure	
	Aided Boys	Aided Girls	Un-aided Boys	Boys Schools	Girls Schools	Trained		Untrained		Boys Schools	Girls Schools
						M	F	M	F		
1963-64	51	--	--	4.144	1.487	--	--	--	--	362392	This includes expenditure on girls schools also
1964-65	47	9	2	4656	1321	13	8	220	54	315348	74390
1965-66	53	13	--	5881	2407	31	5	246	47	353527	92559
1966-67	66	14	5	4781	2807	39	6	393	18	486299	12789
1970-71	87	15	--	7623	1113	25	--	341	1	458805	59608

১৯৪৭-৪৮ সালে ফরিদপুর জেলায় হাইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ছিল ১১৭টি। এর মধ্যে একটি সরকারী বালক হাইস্কুল ছিল। আর ২টি সাহায্য পুষ্ট হাইস্কুল ছিল। হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২৩৯২২ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৫৯৪ জন। এমনিভাবে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটতে ঘটতে ১৯৬৫-৬৬ সালে ফরিদপুর জেলার হাই স্কুল বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪৪ টি। ১৯৬৬-৬৭ সালে ফরিদপুর জেলার হাই স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫১ টি। মোট হাই স্কুল তালিকা হলো ৪১৮২৫টি। ফরিদপুর জেলায় ছাত্র-ছাত্রী হলো ৪৬১৩৩ জন।[৮১] ১৯৭০-৭১ সালে ফরিদপুর জেলায় ২২১ টি হাই স্কুল এবং ১০টি বালিকা বিদ্যালয় সংযুক্তি হয়।

সারণী- ৩/৭

ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষা বিকাশে হাইস্কুলের সংখ্যা পর্যায়ক্রমিক আলোচনা

Year	Number of Schools		No. of Students.		Expenditure
	Boys	Girls	Male	Female	
1964-65	131	6	34656	3618	3049600
1965-66	138	6	37738	4114	3152048
1966-67	147	6	41120	4993	3776543

[৮০] *Ibid*, P. 225.

[৮১] *Ibid*, p. 226-227.

1967-68	164	8	47615	4681	4522297
1970-71	201	10	51252	6981	4012548
Total	781	36	212381	24387	18513036

উপর্যুক্ত সারণী থেকে লক্ষনীয় যে ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষার বিকাশে ১৯৬৪-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ফরিদপুর জেলায় যে হাই স্কুলগুলো ছিল তার মধ্যে বালক হাই স্কুল ছিল ৭৮১ টি, বালিকা হাই স্কুল ছিল ৩৬ টি। মোট ছাত্রছাত্রী ছিল ২,৩৬,৭৬৮ জন তার মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ২,১২,৩৮১ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ২৪,৩৮৭ জন। ১৯৬৪-৭১ সাল পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মাণ করতে ব্যয় হয় ১৮৫১৩০৩৬ টাকা।[৮২]

৩.৫.৩ কলেজ শিক্ষা

ফরিদপুর জেলায় ১৯১৮ সালে একমাত্র *ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ* প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারীকরণ হয় ১৯৪২ সালে। ১৯৪২ সালেই রাম দিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর ফরিদপুর জেলায় আধুনিক শিক্ষার জন্য অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে মাদারীপুর নাজিমউদ্দিন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপালগঞ্জে *কাইদা আজম কলেজ* প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে। রাজবাড়ী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। বোরহানগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। ভাংগা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। বোয়ালমারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, এবং ইয়াছিন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। ফরিদপুর মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৯১ সালে। ফরিদপুর জেলায় আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিবর্গ কঠোর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১. নবাব আব্দুল লতিফ ২. কবি জসিম উদ্দিন ৩. ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ৪. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ৫. মাওঃ আব্দুল আলীম ৬. কবি আলাওল, ৭. হাজী শরীয়তুল্লাহ ৮. পীর মহসীন উদ্দিন ৯. জগদ্বন্ধু সুন্দর ১০. অম্বিকাচরণ মজুমদার ১১. কবি কায়কোবাদ ১২. চৌধুরী ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস ১৩. আলীমুজ্জামান চৌধুরী ১৪. ইয়াছিন জামাদার ১৫. অতুল প্রসাদ সেন, ১৬. খান বাহাদুর আছাদুজ্জামান ১৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৮. মৌলভী তমিজউদ্দিন খান ১৯. খান বাহাদুর

[৮২] *Ibid*, p. 227.

রহমান ২০. খান বাহাদুর রোকন উদ্দিন আহম্মেদ ২১. বিচার প্রতি মোঃ ইব্রাহিম ২২। মৌঃ ইয়াকুব আলী চৌধুরী ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কলেজসমূহে বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজ কল্যাণ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন গণিত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের সাথে সাথে কোন কোন কলেজে উচচ ডিগ্রীর জন্য অনার্স কোর্স চালু করা হয়।[৮৩] একাডেমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এ অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষার জন্য ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট, শারীরিক প্রতিবন্ধিদের মুক বধির স্কুলসহ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ক্লাব ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যায় সমাপনীতে বলা যায়, বাংলায় সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সফলতা ছিল। ইংরেজি পূর্ব অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে এবং ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজি চর্চাকে বৃদ্ধি করার জন্য নির্মিত স্কুল কলেজসমূহ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামকরণের মধ্য দিয়ে এগুলোর বিকাশ শুরু হয়। সরকারী সহায়তায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধিত হলেও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঐতিহ্যবাহী সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশ অবনতির দারপ্রান্তে উপনীত হয়। বাংলার অন্যান্য স্থানের মত ফরিদপুরেও এ চিত্র লক্ষ্যনীয়। তবে আধুনিককালের মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার কারণে বর্তমান গবেষণায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

[৮৩] *Ibid*, P. 230.

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

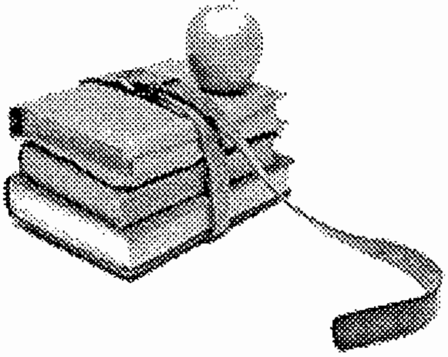

৪.১ ভূমিকা

ফরিদপুর অঞ্চলে সনাতন ও আধুনিক উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলে সমগ্র বাংলায় ক্রমশ সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ্রাস পেতে থাকে এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার ঘটে। এমনকি সনাতন হিসেবে চিহ্নিত মাদরাসা শিক্ষাসমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সনাতন থেকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। ফরিদপুর অঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বর্তমানে আলিয়া মাদরাসাসমূহ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে পড়লেও অত্র গবেষণায় সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ফরিদপর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে কিছু প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করে এবং জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে তার শিক্ষা বিষয়ক ও অন্যান্য বিষয়াবলী পর্যালোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৪.২ সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি

৪.২.১ নির্বাচিত কওমী মাদরাসাসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

সনাতন পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কওমী মাদরাসা অন্যতম। কওমী মাদরাসার প্রাণকেন্দ্র হলো *দারুল উলূম দীওবন্দ*। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের পরাজয়ের পর উপমহাদেশে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে আযাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মপন্থা বিপজ্জনক মনে হলে আলিমগণ শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমে আবিদ হুসাইন, মাওলানা মাহতাব আলী এবং নিহাল আহমাদ দীওবন্দের জামে মসজিদে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। এপর মাওলানা ফযলুর রহমান, মাওলানা যুলফিকার ও সূফী আবিদ হুসাইনের পরামর্শে ১৮৬৭ সালের ৩০ মে দীওবন্দের *ছাত্তা মসজিদ* সংলগ্ন এলাকায় *দারুল উলূম দীওবন্দ* প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত রাখা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা, মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করা, ধর্মীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং বিদআতসমূহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

---

[১] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ:১৫; *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জুন, ১৯৮৫, পৃ: ৮২।

মাওলানা কাসিম নানুতুবী ছিলেন এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। *দারুল উলূম দীওবন্দ* প্রতিষ্ঠার ২৭ বছর পর *নাদওয়াতুল উলামা* এবং ৩১ বছর পর *দারুল উলূম লক্ষ্মৌ* প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দারুল উলূমের আদলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ মাদরাসাগুলো কওমী মাদরাসা নামে পরিচিত।[২]

বাংলাদেশে দারুল উলূম দীওবন্দের অনুসরণে স্থাপিত সর্বপ্রথম কওমী মাদরাসা হল *মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা*। চট্টগ্রামের হাট হাজারী থানায় ১৯০১ সালে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এ প্রক্রিয়ায় অসংখ্য মাদরাসা গড়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালের এক সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, তৎকালে বাংলাদেশে কওমী মাদরাসা সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪৩ টি। এর মধ্যে প্রায় ৫১ টি ছিল দাওরা হাদীস মাদ্‌রাসা। পরবর্তীতে এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এ সকল মাদরাসার সংখ্যা চার হাজারের অধিক বলে ধারণা করা হয়। এ সকল মাদরাসায় সাধারণত কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, কালাম, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ উর্দূ ও ফারসী পড়ানো হয়। সাধারণ ও আধুনিক বিষয়গুলো এ সকল মাদরাসার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত নয়।[৩] তবে সাম্প্রতিককালে কোন কোন শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি গণিত ও সমাজ পাঠকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ সকল মাদরাসার পরিচালনা, পাঠক্রম, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক বেতন প্রভৃতি সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়না। এরা একাধিক বোর্ড কিংবা সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রধানত দু'টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে বাংলাদেশে কওমী মাদরাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। একটি *আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ* অপরটি *বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ*। সরকারের আওতাবর্হিভূত এ সকল মাদরাসা স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে।[৪] ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ কওমী মাদরাসাগুলোর বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৪.২.১.১ জামিয়া আরাবিয়া শামছুল উলূম মাদরাসা

দারুল উলূম দীওবন্দের অনুকরণে বাংলাদেশে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে তন্মধ্যে *জামিয়া আরাবিয়া শামছুল উলূম মাদরাসা* অন্যতম। অত্র প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৯ সালে মুফতী আবদুল

---

[২] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, '*দারুল উলূম দীওবন্দ*, আলীগড় কলেজ ও দারুল 'উলূম লখনৌ: বিকাশ, ভূমিকা ও তুলনা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ-২০০৪, ঢাকা, পৃ: ১৭৪-১৭৫।

[৩] এ কে এম আজহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ: ১৩৫-১৩৬।

[৪] *তদেব*, পৃ: ১৩৬-১৩৭।

কাদিরের নিরলস প্রচেষ্টায় ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে পশ্চিম খাবাশপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] প্রতিষ্ঠার সময় মাদরাসাটি মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয়। ১৯৭১/৭২ সালে মাদরাসায় প্রথমে ৫ জামায়াত খোলা হয়। ১৯৭৫ সালে মেশকাত জামায়াত খোলা হয়। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরে অত্র অঞ্চলের লোকজন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে। পর্যায়ক্রমে মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৮৭ সালে এটি দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল) শ্রেণীতে পরিণত হয়।[৬] মাদরাসা শুরুর সময় একটি ছোনের কুড়ে ঘরে ক্লাশ শুরু হয়। তার পরবর্তী বছরে একটি টিনের ঘর তৈরী হয়। নব্বই দশকে অত্র মাদরাসায় ৪ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন তৈরি হয়। ১৯৮৪ সালে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ জন। ২০০৭ সালে মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ৫০০ জন। মাদরাসায় বেশ কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো মক্তব বিভাগ, কিতাব বিভাগ, হিফয বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, ফাতওয়া ও ফারাইয বিভাগ, কুতুবখানা ও লিল্লাহ বোডিং।

মক্তব বিভাগে শিশুদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক নূরানী ট্রেনিং পদ্ধতিতে মাত্র ১ বছরে আবশ্যকীয় মাসায়িল, দু'আ, কালিমা, অযু, নামাজ ইত্যাদির বাস্তব প্রশিক্ষণসহ পবিত্র কুরআন শুদ্ধরূপে পড়ার সক্ষম করে তোলা হয় এবং অর্থসহ ৪০টি হাদীস মুখস্থ করানো হয়। এছাড়াও বর্তমানে সহজ পদ্ধতিতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, অংক শিখানো হয়।[৭] কিতাব বিভাগে মক্তব বা হিফ্য শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদেরকে ইসলমী শিক্ষাক্রমের ক্লাস পদ্ধতিতে মাত্র ১০ বছর মেয়াদে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ তাফসীর, আকাইদ, আদব, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, হিকমত, ফালাসিফাহ ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মীয় বিষয়ে পারদর্শী করে গড়ে তোলা হয় এবং তাদেরকে সর্বব্যাপি দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দানের জন্য সনদ প্রদান করা হয়।[৮] হিফয বিভাগে মকতবের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে অনুর্ধ ৪ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন সহীহরূপে মুখস্থ করানো হয়।[৯] আধুনিক জাহিলয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যোগ্য ও সচেতন শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।[১০]

---

[৫] *রাহবার*, মাদরাসা বার্ষিকী , জামিয়া আরাবিয়া শামছুল উলূম মাদরাসা, ফরিদপুর, ২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ ৫২; *রাহবার*, মাদরাসা বার্ষিকী, জামিয়া আরাবিয়া শামছুল উলূম মাদরাসা, ফরিদপুর, ২০০৩ খ্রিঃ, পৃঃ ১৭।

[৬] *তদেব*।

[৭] *রাহবার*, মাদ্‌রাসা বার্ষিকী ১৪২১ হিজরী ২০০০ ইং, ফরিদপুর শামছুল উলুম মাদরাসা, ফরিদপুর, পৃঃ ৫২।

[৮] *তদেব*, পৃঃ ৫২।

[৯] *তদেব*।

[১০] *রাহবার*, মাদরাসা বার্ষিকী, শামচুল উলুম মাদরাসা, নভেম্বর, ২০০৩, পৃঃ ১৯।

শরীয়ত সম্মত পন্থায় চলতে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ইবাদত বন্দেগী ও পৈত্রিক সম্পত্তি বন্টসহ বিভিন্ন সমস্যায় যে সমস্ত মাসআলা প্রয়োজন হয় অত্র মাদরাসায় সে সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।[১১]

জামিয়ায় একটি সমৃদ্ধ কুতুবখানা আছে। বর্তমানে জামিয়ার লাইব্রেরীতে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) কিতাব রয়েছে। এর সাথে অন্যান্য ম্যাগাজিন মাসিক ও বাৎসরিক পত্রিকাও রয়েছে।[১২] সমাজের ইয়াতিম, মিসকিন ও দরিদ্র ছাত্ররা যাতে দ্বীনি শিক্ষা লাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয় সে জন্য যাকাত, ফিতরা, সাদকা, মান্নাত, কুরবানীর চামড়া, এককালীন দান প্রভৃতি অর্থ দ্বারা লিল্লাহ বোডিং খাত পরিচালিত হয়ে থাকে।[১৩] এছাড়া অত্র জামিয়ায় ত্রিতলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস রয়েছে।

জামিয়া আরাবিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্নে ছাত্রসংখ্যা কত ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। তবে বর্তমানে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ৫০০ জন। অত্র মাদরাসায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল কাদির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[১৪]

৪.২.১.২ জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদিমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ

এটি ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৯ সালে মোতাবেক ১৩৫৬ হিজরীতে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শামসুল হক ফরিদপুরীর (রহ:) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয়। শুরুর সময় একটি ছনের কুড়ে ঘর ছিল। পরবর্তীকালে দু'টি টিনের ঘর তৈরি হয়। ৭০ দশকে একটি একতলা একটি ভবন এবং ৮০ দশকে দু'টি বিল্ডিং তৈরি হয়। পর্যায়ক্রমে মাদরাসা ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৭ সালে ৪টি ভবন ও একটি টিনের ঘর আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে।[১৫] প্রতিষ্ঠার সময় মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। ১৯৭০ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন। ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব পাওয়ার কারণে ১৯৮৪ সালে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০ জন। প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। যথা- কিরা'আত বিভাগ, হিফয বিভাগ, জামায়াত বিভাগ, ফাতওয়া বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, তাবলিগ বিভাগ ও লিল্লাহ বোডিং

---

[১১] *তদেব*।

[১২] *রাহবার*, মাদরাসা বার্ষিকী, ১৪২৪ হিজরী, ফরিদপুর শামছুল উলুম মাদরাসা, ফরিদপুর, পৃ: ১৯।

[১৩] *তদেব*, পৃ: ২০।

[১৪] *তদেব*।

[১৫] *বার্ষিকী*, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ১৯৯৫, পৃ: ৩-৪।

বিভাগ। কিরাআত বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত ক্বারীর মাধ্যমে তাজবীদ সহকারে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এ ছাড়া মাসআলা, আদব-কায়দা, নিয়মনীতি ও আমল-আখলাক শিক্ষা দেওয়া হয়।[১৬] হিফয বিভাগে হাফিয দ্বারা ছাত্রদেরকে পবিত্র কুরআনের হাফিয বানানো হয়। প্রতি বছর এ বিভাগ থেকে ৫০/৬০ জন ছাত্র হাফিয হয়ে বের হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের এ বিভাগটি সারা দেশের মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত এবং পদ্ধতিগতভাবে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[১৭] মক্তব বিভাগ ও হিফয বিভাগ উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। অভিজ্ঞ ও প্রবীণ আসাতেজায়ে কিরাম দ্বারা প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা প্রদানপূর্বক সুযোগ্য আলিম বানানো হয়। দাওরায়ে হাদীস (টাইটেল ক্লাস) উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদেরকে ইসলামী আইন শাস্ত্রের উপর গবেষণার মাধ্যমে মুফতীরূপে গড়ে তোলা হয়। সিলেবাসভূক্ত কিতাবাদি শিক্ষালাভের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে ছাত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।[১৮]

সহীহ ইসলামী আকীদা অকাট্য বিশ্বাস, ইসলামী আমল-আখলাক ও তাহ্যীব তামাদ্দুন প্রচারকল্পে এবং বাতেন আকীদা, মতবাদ ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ নামে একটি বিশেষ বিভাগ রয়েছে।[১৯] যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ছাত্রদের দীনি শিক্ষার সাথে সাথে শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার কলাকৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়।[২০] সমাজের ইয়াতীম, মিসকীন ও দরিদ্র ছাত্রদের দ্বীনি শিক্ষালাভের জন্য লিল্লাহ বোডিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।[২১] অত্র মাদরাসায় ছাত্রদের আবাসিকতার জন্য তিনতলা বিশিষ্ট ৫টি ভবন রয়েছে।[২২] আনুমানিক ২০ বা ২৫ জন ছাত্র নিয়ে প্রথমে মক্তব খোলা হয়। এরপর লেখাপড়ার মান উন্নত হওয়ায় জামায়াত বিভাগ খোলা হয়। ২০০৭ সালে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২২৮৫ জন।[২৩] ৭ বা ৮ জন শিক্ষক নিয়ে মাদরাসার ক্লাস শুরু হয়। বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা ৫০ জন।[২৪] শামসুল হক ফরিদপুরী অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর

---

[১৬] তদেব, পৃঃ ৬।

[১৭] তদেব।

[১৮] তদেব, পৃঃ ৮।

[১৯] তদেব।

[২০] তদেব, পৃঃ ৯।

[২১] তদেব, পৃঃ ৮।

[২২] তদেব, পৃঃ ৭।

[২৩] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[২৪] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

মৃত্যুর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাঁর ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত আছেন।[২৫]

৪.২.১.৩ আল জামিয়াতুল আরাবিয়া নিজামুল উলূম মাদরাসা, পুরুরা, ফরিদপুর

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া নিজামুল উলূম মাদরাসা বৃহত্তম ফরিদপুর জেলার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ ৩৬ বৎসর যাবৎ এ প্রতিষ্ঠান মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে দীন, ঈমান ও 'ইলমের প্রশিক্ষণ দানের খিদমত সুচারুরূপে চালিয়ে আসছে।[২৬] মাদরাসাটি বর্তমান নগরকান্দা উপজেলার পুরুরা গ্রামে ১৯৭২ সালে মাওলানা নিযাম উদ্দীনের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি ফুরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে একটি টিনের ঘরে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮০ সালে মাদরাসায় মিযান জামায়াত পর্যন্ত খোলা হয়। বর্তমানে মাদরাসাটি টাইটেল জামায়াত পর্যন্ত চালু আছে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার ছাত্ররা ইসলামী জ্ঞানার্জনের সুযোগ লাভ করে। গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে মাদরাসা শুরু হয়। ১৯৮০ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০জন। পর্যায়ক্রমে মাদরাসার শিক্ষার মান উন্নয়নের ফলে ১৯৮৪ সালে ছাত্র সংখ্যা হয় প্রায় ৫০০ জন। ২০০৭ সালে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫০০জন। মাদরাসার শিক্ষার কার্যক্রম পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা ফাতওয়া বিভাগ, কিতাব বিভাগ, হিফয বিভাগ, নূরানী বিভাগ ও গুরাবা বিভাগ। ফাতওয়া বিভাগ হচ্ছে অত্র মাদরাসার প্রধান বিভাগ। এ বিভাগের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা ও জটিল প্রশ্নাবলীর ইসলামী শরীয়াহ্ভিত্তিক সমাধান প্রদান করা হয়।[২৭] কিতাব বিভাগের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত শ্রেণী পদ্ধতিতে সহীহ ইসলামী শিক্ষা প্রদান করত খাঁটি নায়িবে রাসূল হিসেবে মুসলিম সন্তানদের গড়ে তোলা হয়।[২৮] হিফয বিভাগে ন্যূনতম সময়ে দক্ষ হাফিয দ্বারা আল-কুরআন (৩০ পারা) হিফয করানোর ব্যবস্থা করা হয়।[২৯] নূরানী বিভাগের কাজ হচ্ছে আরবী হরফ পরিচয় হতে শুরু করে স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন শরীফ, চল্লিশ হাদীছ, জরুরী মাসআলা-দু'আ ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া।[৩০] ইয়াতীম, গরীব ও অসহায় ছাত্রদেরকে মাদরাসার পক্ষ হতে খোরাকীসহ কিতাব, খাতা, ঔষধ

---

[২৫] *বার্ষিকী*, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ১৯৯৫, পৃ: ৫।

[২৬] সাক্ষাৎকার: মাওলানা মোঃ জহুরুল হক, অধ্যক্ষ, আল জামিয়াতুল আরাবিয়া নিজামুল উলূম মাদরাসা, পুরুরা, ফরিদপুর; মাদরসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[২৭] আলজামিয়া আরাবিয়া নিজামুল উলূম পুরুরা মাদরাসার রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[২৮] *তদেব*।

[২৯] *তদেব*।

[৩০] *তদেব*।

ইত্যাদি সাধ্যানুযায়ী ফ্রি সরবরাহ করে ধর্মীয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা হয়।[৩১] বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষক হচেছ ৫০ জন। মাদরাসা শুরুর সময় মাত্র ১৫ /১৬ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হয়। এরপর এলাকায় মাদরাসা শিক্ষার প্রসার হতে থাকে। অত্র মাদরাসার বর্তমান ছাত্র সংখ্যা (কয়েক বিভাগে) মোট ৭৬০ জন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ বহন করার জন্য অত্র মাদরাসায় লিল্লাহ বোডিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।

ছাত্রদের লেখাপড়া সুবিধার জন্য ত্রিতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক হোস্টেল রয়েছে। অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত মাওলানা মোঃ জহুরুল হক দায়িত্বপালন করে আসছে।

৪.২.১.৪ বাহিরদিয়া জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া কওমী মাদরাসা, সালথা, ফরিদপুর

বাহিরদিয়া জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া কওমী মাদরাসা বর্তমান নগরকান্দা উপজেলার বাহিরদিয়া গ্রামে মাওলানা আজীজুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সনাতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। মাদরাসাটি মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয়। পরবর্তীকালে মাদরাসাটিতে জামায়াত বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫০ সালে মিযান বা ৪র্থ জামায়াত খোলা হয়। পরবর্তীকালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মাদরাসার মেশকাত জামায়াত বা ফাযিল শ্রেণী খোলা হয়। ১৯৭০ সালে মাদরাসায় টাইটেল জামায়াত খোলা হয়। মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম পাঁচভাবে বিভক্ত। সেগুলো হলোঃ ফাতওয়া বিভাগ, কিতাব বিভাগ, নূরানী বিভাগ, হিফয বিভাগ ও গুরাবা বিভাগ।

ফাতওয়া বিভাগ হচ্ছে অত্র মাদরাসার প্রধান বিভাগ। এ বিভাগের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা ও জটিল প্রশ্নাবলীর ইসলামী শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সমাধান ও জনসাধারণকে ইসলামী জীবন যাপনের সহায়তা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।32 কিতাব বিভাগের মাধ্যমে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, আকাইদ, নাহু, সরফ, প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।

---

[৩১] *তদেব।*

[৩২] সাক্ষাৎকারঃ মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম আলী, অধ্যক্ষ, বাহিরদিয়া জামিয়া ইসলামিয়া আজিজিয়া কওমী মাদরাসা, সালথা, ফরিদপুর; মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

নূরানী বিভাগের কাজ হচ্ছে আরবী হরফ পরিচয় হতে শুরু করে স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন শরীফ, চল্লিশ হাদীছ, জরুরী মাসআলা-দুয়া ও বাংলা শিক্ষা দেয়া।33 হিফয বিভাগের মাধ্যমে মক্তবের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে সম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ কুরআন সহীহরূপে মুখস্থ করানো হয়। এছাড়া দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য অত্র মাদরাসা লিল্লাহ বোর্ডিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।

মাদরাসাটি মাত্র ২০/২৫ জন ছাত্র এবং ৪/৫ জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭০ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। ১৯৮৪ সালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ৪০০ জন। ২০০৭ সালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ১০০০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ৫০ জন।[৩৪] অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম আলী।

৪.২.১.৫ কওমী মাদরাসার সিলেবাস

দরসে নিজামী ইবতেদায়ী মাদরাসা

দরসে নিজামী মাদরাসাগুলোর প্রাথমিক স্তর হচ্ছে দরজে নিজামী ইবতেদায়ী মাদরাসা। ১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম *বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ* বা কওমী মাদরাসাসমূহের ঐক্য সংস্থা সংগঠিত হয়।[৩৫] সংক্ষিপ্তভাবে একে *বেফাক* বলা হয়। *বেফাক* গঠিত হওয়ার পর থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে।[৩৬]

কওমী প্রাইমারী শ্রেণীর পাঠ্যসূচি নিম্নরূপঃ

শিশু শ্রেণীঃ

১ আরবী অক্ষর পরিচয় ও বানান শিক্ষা।

২ দীনিয়াত, কালিমা ও নামাজের মাসনূন দুয়াসমূহ মুখস্থকরণ। এছাড়া এ শ্রেণীতে বাংলা, বর্ণ শিক্ষা, ধারাপাত, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণীঃ

১ আরবী, আমপারা পঠন ও নাস থেকে সূরা ফিল পর্যন্ত মুখস্থকরণ।

---

[৩৩] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[৩৪] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[৩৫] মাওলানা ইছহাক ফরীদি, *দারুল উলুম দেওবন্দঃ ঐতিহ্য ও অবদান* (কুমিল্লাঃ ইকরা রওজাতুল আতফাল, ১৯৯৭), পৃঃ ২।

[৩৬] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগের শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃঃ ৪০১।

২ দীনিয়াত, দুয়া মাছুরা, অযু, তায়াম্মুম, ও নামাজের তালিম, এছাড়া রয়েছে বাংলা, ইংরেজি ও অংকের প্রাথমিক শিক্ষা।

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ

১ আরবী, পবিত্র কুরআনের তিলওয়াত শিক্ষা প্রথম পাঁচপারা, সূরা আদ-দোহা পর্যন্ত মুখস্থকরণ। ইলমে তাজবীদের নিয়মাবলী মৌখিক শিক্ষা।

২ দীনিয়াত ও ইলমে তাহযীব, এছাড়া রয়েছে বাংলা, উর্দূ, অংক, ইংরেজি নির্ধারিত পুস্তকাদি।

তৃতীয় শ্রেণীঃ

১ আরবী, পবিত্র কুরআন ছয় থেকে পনের পারা পঠন ও সূরা আল-লাইল পর্যন্ত মুখস্তকরণ ও তাজবীদের নিয়মাবলী শিক্ষা

২ দীনিয়াত, তালিমুল ইসলাম ১ম ও ২য় খণ্ড, ইসলামী তাহযীব নামক গ্রন্থ। এছাড়া উর্দূ পড়ানো হয়।

চতুর্থ শ্রেণীঃ

১ আরবী, কুরআন শরীফ শেষ ১৫ পারা পঠন এবং আমপারা মুখস্থকরণ ও তাজবীদ শিক্ষা।

২ দীনিয়াত, তালিমুল ইসলাম ৩য় খণ্ড, বেহেস্তী জেওর ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

পঞ্চম শ্রেণীঃ

১ আরবী, পূর্ণকুরআন শরীফ পঠন ও মশ্‌ককরণ, সূরাহ ইয়াসিন, সূরাহ মুজাম্মিল মুখস্থকরণ। নুজাহাতুল ক্বারী নামক গ্রন্থের পাঠ

২ দীনিয়াত, তালিমুল ইসলাম ৪র্থ খণ্ড এবং বেহেস্তী জেওর ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ, গণিত, ভূগোল, সমাজ পাঠ, উর্দূ, উর্দূ ব্যাকরণ, ফারসী, ফারসী ব্যাকরণ, ইংরেজি, ইংরেজি ব্যাকরণ বিষয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থ এ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত।

মারহালাতুস ছানুবিয়্যাহ (মাধ্যমিক স্তর)

১ম বর্ষ

১ ফিক্‌হ (আইন ও নীতিশাস্ত্র) কুদুরী, কিতাবুল উযু থেকে শেষ পর্যন্ত

২ উসূলুল ফিকহ, উসূলুশ শাশী

৩ আরবী সাহিত্য ও ইনশা, নাফহাতুল আরব অথবা মুফিদুত তালিবীন।

৪ মানতিক, মিরকাত।

৫ আখলাক, তালিমূল মুতায়াল্লিম।

২য় বর্ষ

১ কুরআনল কারীম, অনুবাদ শেষ ১৫ পারা।

২ ফিকহ্-কানজুদ দাকায়িক (১ম খণ্ড)।

৩ উসূলুল ফিক্হ, নূরুল আনওয়ার, সুন্নাত থেকে শেষ পর্যন্ত।

৪ আরবী সাহিত্য ও ইনশা, আলফিয়াতুল হাদীস লামিয়াতুল মুজিয়াত।

৫ ইলমুননাহু, শরহে জামি।

৬ বালাগাত, দুরুসুল বালাগাত।

৭ মানতিক, শরহু তাহজীব।

মারহালাতুস্ সানুবিয়্যাহ আল-উলইয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)

১ম বর্ষ

১ কুরআনুল কারীম, প্রথম ১৫ পারার অনুবাদ।

২ ফিক্হ, শরহে বেকায়াহ, (পূর্ণ অংশ)।

৩ উসূলুল ফিক্হ, নূরুল আনওয়ার, কিতাবুল্লাহ।

৪ আরবী সাহিত্য ও রচনা, মাকামাত প্রথম ১০ টি।

৫ ফারায়িয সিরাজী।

৬ বালাগাত-মুখতামারুল মায়ানী।

২য় বর্ষ

১ ফিক্হ, হিদায়া প্রথম খণ্ড।

২ ফিকাহ-হিদায়া ২য় খণ্ড।

৩ উসূলুল ফিকহ-হুসামী, কিয়াস।

৪ ইলমুল আরয়ু, আরুযুল মিফতাহু।

৫ আরবী সাহিত্য ও রচনা-মুতামব্বী মাফিয়া।

৬ মানতিকঃ সুল্লাম।

মারহালাতুল ফযীলত (স্নাতক ডিগ্রী)

১ব বর্ষ

১ তাফসীরঃ ১১ পারা-৩০ পারা বাংলা অনুবাদ।

২ হাদীসঃ রিয়ায়ুস সালিহীন ফেযজুল কালাম।

৩ ফিক্‌হঃ হিদায়া-১ম খণ্ড।

৪ ফিক্‌হঃ হিদায়া-২য় খণ্ড।

৫ উসূলুল ফিক্‌হঃ নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ্‌।

৬ আরবী সাহিত্যঃ মুখতারাত।

৭ বালাগাতঃ (অলংকার শাস্ত্র) দুরুসুল বালাগাত।

৮ ফারাইযঃ সিরাজী।

২য় বর্ষ

১ তাফসীরঃ তাফসীরুল জালালাইন-১ম ভাগ।

২ তাফসীরঃ তাফসীরুল জালালাইন-২য় ভাগ।

৩ উসুলে তাফসীরঃ আল ফওযুল কাবীর।

৪ হাদীসঃ মিশকাত শরীফ, ১ম ভাগ (মুকাদ্দিমাসহ)।

৫ হাদীসঃ মিশকাত শরীফ, ২য় ভাগ।

৬ উসূলুল ফিক্‌হঃ নূরুল আনওয়ার সুন্নাত থেকে শেষ পর্যন্ত।

৭ কালামঃ আকীদাতুত তাহাভী।

মারহালাতুত তাকমীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী)

১ম বর্ষ-দাওরায়ে হাদীস

১ সহীহ বুখারী-পূর্ণ।

২ সহীহ মুসলিম-পূর্ণ।

৩ জামিয় তিরমিযী-পূর্ণ।

৪ সুনানে আবূ দাউদ-পূর্ণ।

৫ সুনানে নাসাঈ-পূর্ণ।

৬ সুনানে ইবনে মাজাহ-পূর্ণ।

৭ তাহাবী শরিফ-পূর্ণ।

৮ মুয়াত্তা ইমাম মালেক-পূর্ণ।

৯ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ-পূর্ণ।

২য় বর্ষ

যে কোন একটি বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য অর্জনের নিমিত্তে গভীরভাবে অধ্যায়ন

১ উলূমুল কুরআন

২ উলূমুল হাদীস

৩ উলূমুল শরাইয়া

৪ লূগাতুল আরাবিয়া

৫ উলুমুদ দীন[৩৭]

১৯৭১ সালের পূর্ব থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কওমী মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার উচ্চ স্তরে শিক্ষাদানের জন্য খিদমত করে আসছে, সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম মাঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা শীর্ষস্থানীয়। ১৯০১ সালে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এদেশে অনেক মাদরাসা হয়েছে। ফরিদপুর জেলার সনাতন শিক্ষার অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে দরসে নিজামী বা কওমী মাদরাসা। ফরিদপুর জেলার উল্লেখযোগ্য মাদরাসাগুলো পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে টাইটেল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.২.২ ফোরকানিয়া মাদরাসা

ফোরকানিয়া মাদরাসা ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক ধারা হিসেবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এ ধরনের মাদরাসা সাধারণত হয়ে থাকে মসজিদ কেন্দ্রিক। তবে কখনও লোকালয়ের বিশেষ স্থানে জনগণের সাহায্যে মাদরাসা হিসেবেও ঘর তৈরি করে পবিত্র কুরআন ও ইসলামের প্রথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে বাড়ির কাচারী বা বৈঠকখানাকে ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন ফোরকানিয়ার ছাত্রদের থেকে নাম মাত্র বেতন নেওয়া হয়। আবার কখনও বেতন ছড়াই শিক্ষা দেওয়া হয়। ফোরকানিয়া মাদরাসায় শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব থেকে কিছুটা উন্নত। এখানে পবিত্র কুরআন ছাড়াও বেহেস্তী জেওর, তা'লিমুল ইসলাম বা দ্বীনিয়াত থেকে কিছু কিছু শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফোরকানিয়া মাদরাসায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই অধিক সংখ্যক লেখাপড়া করে। গ্রাম বাংলার গরীব ছেলে-মেয়েদের ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফোরকানিয়া মাদরাসা বিশেষ সহায়ক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ শিক্ষা ধারার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪.২.৩ হাফিজিয়া মাদরাসা

[৩৭] বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যতালিকা থেকে সংগৃহিত। পৃঃ ৩-৪।

দেশে ইসলামী শিক্ষার অন্য একটি ধারা হলো কুরআন মজিদ হিফযকরণ। যে সকল প্রতিষ্ঠানে হিফয করানো হয় সে সব প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় হেফয খানা বা হাফেজীয়া মাদ্রাসা। হিফয শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হলো মুখস্ত করা। এ পদ্ধতি পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করা হয় বলে একে হিফয নামে অভিহিত করা হয়। আর যারা পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করে তাদেরকে বলা হয় 'হাফিজ'। রাসুল স. এর যুগ থেকে এর প্রচলন হয়ে আসছে। তৎকালীন সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইলের মারফতে ওয়াহী প্রক্রিয়ায় যে সব আয়াত সাহাবীদের শোনাতেন তা তারা বারাংবার পূনরাবৃত্তি করে স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ করে রাখতেন। পাবতীতে এ ধারার অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে হিফজ শিক্ষা একটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

এর শিক্ষাক্রম বর্ষভিত্তিক সুনির্দিষ্ট থাকেনা। হিফযকারীর মেধা, স্মৃতি শক্তি, মননশীলতা, অধ্যাবসায় ও সময় লাগানোর ওপরই তা নির্ভরশীল। তাই দেখা যায় একই সাথে যারা হিফয শুরু করেন। তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিক মেধাবীগণ অন্যদের তুলনায় অনেক আগেই তার হিফয সমাপ্ত করতে পারে। গড়ে ৩-৪ বছর সময়ে হিফয সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। এ সবশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন রূপ বোর্ডের আওতাভূক্ত নয়; সম্পূর্ণ বেসরকারি। স্থানীয় জনগণের দান খয়রাতের উপরই এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। হিফয করার বয়স হলো বাল্যকাল। কারণ শিশুদের মেধা হিফযের জন্য অধিকতর কার্যকরী হয বলেই প্রতিয়মান হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে হাফিজিয়া মাদ্রাসার এ রীতি পূর্বের ন্যায় চলে আসছে।

১৯৪৭ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ফোরকানীয়া ও হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে আনুমানিক বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ১১৫টি।[৩৮]

১৯৭৩ সালে ফরিদপুর জেলায় মোট ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরসার সংখ্যা ছিল ১৮০টি।[৩৯] ১৯৮৪ সালে ফরিদপুর জেলায় মোট ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরসার সংখ্যা ছিল ২০০টি।[৪০] ২০০৭ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মোট ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদরসার সংখ্যা

---

[৩৮] সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা মোঃ আব্দুল কাদের, অধ্যক্ষ, শামসুল উলূম মাদরাসা, খাবাসপুর, ফরিদপুর।

[৩৯] Bangladesh Districts Gazzetter, Faridpur, p. 119.

[৪০] সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা মোঃ আব্দুল কাদের, অধ্যক্ষ, শামসুল উলূম মাদরাসা, খাবাসপুর, ফরিদপুর।

ছিল ফরিদপুরে ৫০০টি, মাদারীপুরে প্রায় ৪৮০টি, গোপালগঞ্জে প্রায় ৪৫০টি, রাজবাড়ীতে প্রায় ৪৯০টি ও শরীয়তপুরে প্রায় ৪০০টি।[৪১]

সারণী- ৪/১

আশির দশকের সূচনালগ্নে ফরিদপুর জেলার (বৃহত্তম জেলা) আলিয়া মাদরাসার পরিসংখ্যান[৪২]

শ্রেণী	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
দাখিল	২০২ টি
আলিম	৩৫ টি
ফাযিল	৩৫ টি
কামিল	৪ টি
মোট =	২৭৬টি

৪.২.৪ নির্বাচিত আলিয়া মাদরাসাসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাদরাসার অনুকরণে এদেশে যে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীতে তা আলিয়া মাদরাসা নামে পরিচিতি লাভ করে। [৪৩] আলিয়া মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। ১. ইবতেদায়ী (৫ বছরের স্তর), ২. দাখিল (৫ বছরের স্তর), ৩. আলিম, ৪. ফাযিল এবং ৫. কামিল (এ গুলো যথাক্রমে ২ বছরভিত্তিক স্তর)।[৪৪] ১৯৮৫ সালে দাখিলকে এস.এস.সি সমমান, ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে এইচ.এস.সি সমমান হিসাবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৪৫] ফাযিল এবং কামিল স্তরকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমান প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেছেন।[৪৬] ফরিদপুর অঞ্চলের আলিয়া মাদরাসাসমূহের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত মাদরাসাসমূহকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে ফরিদপুর সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো।

---

৪১ ফরিদপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস, ফরিদপুর।

৪২ ফরিদপুর জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা পরিসংখ্যান অফিস; বাংলাদেশ আদমশুমারী, ১৯৯১; ইউনিয়ন পরিসংখান, ডিসেম্বর ১৯৯৩; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান, ১৯৯১; বেনবেইস শিক্ষা মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২; মোঃ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরের ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪-১১৫।

৪৩ এ.কে.এম আজহারুল ইসলাম, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ: ১৩৬।

৪৪ *তদেব*।

৪৫ *তদেব*, পৃ: ১৩৭।

৪৬ *তদেব*।

৪.২.৫ ইবতেদায়ী মাদরাসা

৪.২.৫.১ নুরুন্ননবী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ ইমাজউদ্দিন শেখ, জনাব রউফউননবী (সাবেক চেয়ারম্যান কৈজুরী, ইউ.পি), আঃ মজিদ, মির্জান শেখ, আরজান শেখ, ওসমান শেখ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় গোয়ালকান্দী গ্রামে ৫২ শতাংশ জমির উপরে ১৯৮৪ সালে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান শুরুর সময় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৭৫ জন। অত্র প্রতিষ্ঠান শুরু সময় একটি টিনের ঘর ছিল। ২০০৭ সালে এল প্যাটানে ৬ কক্ষ বিশিষ্ট ১টি বিল্ডিং নির্মিত হয়। শুরুর সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন । ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যাও ৫ জন আছে। শুরুর সময় আসবাবপত্র ছিল বাঁশের মাচল দিয়া তৈরী বেঞ্চ। বর্তমানে কাঠের কয়েক জোড়া বেঞ্চ রয়েছে। বর্তমানে চেয়ার সংখ্যা ২০টি। একটি স্টিলের আলমারী, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং ৩০ জোরা বেঞ্চ ও প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অত্র মাদরাসাটি এম.পি.ও হওয়ার আগে ম্যানেজিং কমিটির দ্বারা পরিচালিত হতো। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৫ সালে এমপিওভূক্ত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম।[৪৭]

৪.২.৫.২ ইসলামপুর জসিমউদ্দিন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা

মোঃ ইউনুছ আলী মাষ্টার, মোকাব্বের হোসেন, আবুল হাশেম শেখ, মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন ও মোতালেব শেখ প্রমূখের উদ্যোগে ৪০ শতাংশ জমির উপর ওম্বিকাপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের পশ্চিজ রামকান্তপুর মৌজার মুহাম্মদপুর বাজারের সংলগ্নে ১৯৮৪ সালে অত্র মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসাটি ১৯৮৫ সালে মঞ্জুরী হয়। একটি টিনের ছোট ঘরে ক্লাস শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে মাদরাসায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৭ সালে চারচালা বারান্দাসহ পাঁচকক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনের ঘর আছে। বর্তমানে একতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণাধীন আছে। মাদরাসা আরম্ভের সময় মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। ২০০৭ সালে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা আছে ১৬৪ জন। অত্র মাদরাসা শুরুর সময় মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৪ জন। ২০০৭ সালেও শিক্ষক

---

[৪৭] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল, নুরননবী স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসা, সাক্ষাতকারঃ জনাব মোঃ জনাব সিরাজুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, নুরুন্ননবী স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসা, ফরিদপুর।

সংখ্যা ৪ জন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে জনাব মোঃ ইউনুছ আলী ১৯৮৪ সাল থেকে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করছেন।[৪৮]

৪.২.৫.৩ চরটেপুড়াকান্দি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, ফরিদপুর

মাওলানা মোঃ ইসহাক, মোঃ মাইনুদ্দিন মাতুব্বর, জয়নাল মাতুব্বর, মোঃ জামাল উদ্দিন, জনাব আবেদ আলী, ইয়াছিন মুন্সী, ওসমান মাতুব্বর প্রমূখের উদ্যোগে নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের চর টেপুড়া কান্দিতে ৪০ শতাংশ জমির উপর ১৯৮৪ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে মাদরাসা সরকারি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। মাদরাসার শুরু সময় একটি টিনের ছোট ঘর ছিল। ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসায় বারান্দাসহ ৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনের ঘর আছে। প্রতিষ্ঠান শুরু সময় ২৬০ জন। ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসায় ১৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। মাদরাসায় প্রতিষ্ঠার সময় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আবু নাছির মোঃ ইসহাক।[৪৯]

৪.২.৫.৪ কাসিমাবাদ স্বতন্ত্র নূরানী ইবতেদায়ী মাদরাসা

পীর কারী নূর মোহাম্মদ খাঁ, খলিফা ইব্রাহিম মোল্যা এবং এলাকার জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় কাসিমাবাদ গ্রামে ৪০ শতাংশ জমির উপর ১৯৮৪ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি প্রথমে ফোরকানিয়া মাদরাসা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে মাদরাসাটি ইবতেদায়ী মাদরাসা নামে পরিচিতি লাভ করে। অত্র মাদরাসা ১৯৯৪/৯৫ সালে এম.পি.ও ভূক্ত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ১৫০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা আছে ৪ জন। মাদরাসার শুরু সময় মাত্র একটি টিনের ঘর ছিল বর্তমানে অত্র মাদরাসায় ৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনের ঘর আছে এবং শিক্ষকের জন্য একটি শিক্ষক মিলনায়তন কক্ষ আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মোঃ আজম আলী খাঁন।[৫০]

---

[৪৮] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল ইসলামপুর জসিমউদ্দিন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মোঃ ইউনুছ, প্রধান শিক্ষক, ইসলামপুর জসিমউদ্দিন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, ফরিদপুর।

[৪৯] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল, চরটেপুড়া কান্দি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা; সাক্ষাতকার জনাব মোঃ ইসহাক আলী, প্রধান শিক্ষক, চরটেপুড়া কান্দি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, ফরিদপুর।

[৫০] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, কাসিমাবাদ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ লিয়াকত আলী খাঁন, সহকারী শিক্ষা পুরদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

৪.২.৫.৫ হাটঘাটা কাজী জনাব আলী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী হাফিজিয়া মাদরাসা

মরহুম কাজী শামচুউদ্দিন, জনাব শামচুল হক, রব্বান বিয়া (সাবেক চেয়ারম্যান রায়পুর) এবং এলাকার জ্ঞাণী গুণীর প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে ৮৪ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান শুরুর সময় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০০ জন। প্রতিষ্ঠান শুরু সময় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা ৫ জনই আছে। প্রতিষ্ঠান শুরু সময় প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব ছিলেন হাফেজ মোঃ হবিবুর রহমান (১৯৭৫-১৯৮৪), আব্দুল ওয়াদু (১৯৮৪-১৯৮৬)।[৫১] বর্তমানে হাফেজ হাবিবুর রহমান প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার নীরিখে বলা যায় যে, ফরিদপুর জেলার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলো বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো দিন দিন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোর বিকাশ আদৌ সম্ভব হবেনা। কেননা এমপিওভূক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে বেতন হয় মাত্র পাঁচশত টাকা। তাও নিয়মিতভাবে পাওয়া না। এ অবস্থায় জীবিকার প্রয়োজনে প্রত্যেক শিক্ষকই অন্য কোন পেশা গ্রহণ করতে হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা গেছে কেউ কেউ অন্য কোন মাদরাসার প্রভাষক কিংবা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এরকম দ্বৈত দায়িত্ব পালনের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে এবং ক্রমশ ছাত্র-ছাত্রী হ্রাস পাচ্ছে।

৪.২.৬ দাখিল মাদরাসা

৪.২.৬.১ শোনপঁচা নেছারিয়া দাখিল মাদরাসা, সদরপুর, ফরিদপুর

ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে যাতে আদর্শ মানুষ হিসবে গড়তে পারে এবং রাসূলের (স.) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সে লক্ষ্যে জনাব জামাল উদ্দিন মুন্সী, মোঃ রবুল্লা বেপারী, আঃ কাদের পাঞ্জু মুন্সী, দিরাজউদ্দিন মুন্সী, রঞ্জন মোল্লা, মোসলেম মোল্লা, আকুল বেপারী এবং এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৭০ সালে প্রথমে মক্তব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এটিকে দাখিল মাদরাসায় রূপান্তরিত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; যা ১৯৭৩

---

[৫১] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, হাটঘাটা কাজী জনাব আলী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব হাফেজ মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, হাটখাটা কাজী জনাব আলী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা, ফরিদপুর।

সালে ছারদিনা পীর সাহেব মরহুম নেছার উদ্দিন আহম্মদ (র:) এর নামের সাথে সংযোজন করে *শোন পাঁচা নেছারিয়া দাখিল মাদরাসা* নামে নামকরণ করা হয়। মাদরাসা শুরুর সময় গুটি কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। শিক্ষার মান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ক্রমোন্নয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৪ সালে অত্র মাদরাসায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ২৫০ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা ২৬৭ জন।

অত্র মাদরাসা শুরুর সময় শিক্ষক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ জন। ১৯৮৪ সালে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১০ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। শুরু সময় অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি টিনের ঘর ছিল। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে সেমি পাকা ঘর ৩টি এবং একতলা বিশিষ্ট ১টি ভবন। অত্র মাদরাসা একটি সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে মোঃ হায়াত আলী দায়িত্ব পালন করছেন।[৫২]

৪.২.৬.২ খোশা গোপালপুর মুয়াজ্জেমিয়া দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর

মরহুম মুয়াজ্জেম মিয়া, আলহাজ সোনাউল্লাহ, আবদুল জলিল মোল্যা, বেদন মোল্যা, জনাব আলী মোল্যা, ইসমাঈল মোল্যা এবং এলাকার জ্ঞাণী গুণী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠান ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় মাদরাসাটি ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার জমির পরিমাণ ১ একর ৫৩ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সালে ইবতেদায়ী, ১৯৮৮ সালে দাখিল স্বীকৃতি পায় এবং ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এমপিও ভূক্ত হয়।

অত্র প্রতিষ্ঠান শুরু সময় একটি কুড়ে ঘরে ক্লাস শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ২টি টিনের ঘর নির্মিত হয়। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ৫ কক্ষ বিশিষ্ট ২টি টিনের ঘর আছে। শুরুর সময় অত্র মাদরাসায় শিক্ষক সংখা ছিল ২ বা ৩ জন। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মাওলানা মোঃ আব্দুস সালাম (১৯৫৩-১৯৬৫), জনাব মাওলানা মোঃ আঃ খালেক (১৯৬৫-১৯৭৬), জনাব মাওলানা মোঃ আব্দুস সালাম (১৯৭৬-২০০৭) পর্যন্ত।[৫৩]

---

[৫২] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, শোনপাঁচা নেছারিয়া দাখিল মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব হাফেজ মোঃ হায়াত আলী, সহকারী শিক্ষক শোনপাঁচা নেছারিয়া দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

[৫৩] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, খোশা গোপালপুর, মুয়াজ্জেমিয়া মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ আঃ জলিল, সহ সুপার খোশ গোপালপুর দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

৪.২.৬.৩ শোলাখণ্ড কারামাতিয়া দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর

১৯৭৬ সালে হজরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রঃ) এর ছেলে জনাব হযরত মাওলানা বাকের সাহেবের জন্য ফরিদপুর সদরের শোলাখণ্ডে খানকা তৈরী করা হয়। ১৯৭৮ সালে তার পরামর্শ ও এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ৫৪ শতাংশ জমির উপর মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে একটি টিনের ঘরে মাদরাসার ক্লাস শুরু হয়। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হলেও সেটা এলাকার জ্ঞানী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় সমস্ত বাঁধা পেরিয়ে দাখিল মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি খোলার সময় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল সেটা ভালভাবে জানা যায় না। তবে ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০৫ জন। মাদরাসা খোলার সময় একটি কুড়ে ঘরে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮২ সালে মাদরাসা থেকে বোর্ড দাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। অত্র মাদরাসা খোলার সময় শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ১৯৮৪ সালে মাদরাসায় শিক্ষক সংখ্যা আছে ১৫ জন। ক্রমে ক্রমে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৪ সালে অত্র মাদরাসায় তিনটি টিনের ঘর ছিল। বর্তমানে অত্র মাদরসায় ৩টি টিনের ঘর এবং একটি পাকা ভবন রয়েছে।

অত্র মাদরাসা ১৯৮২ সালে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ২ জন ছাত্র। এর মধ্যে পাশ করে ১ জন। ১৯৮৩ সালে দাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল ১ জন এর মধ্যে পাশ করে একজনই। ১৯৮৪ সালে দাখিল পরীক্ষায় দিয়েছিল ২ জন তার মধ্যে পাশ করে ছিল ১ জন। অত্র মাদরাসায় প্রতিষ্ঠালগ্নে সুপাররেনটেনডেন্ট হিসেবে ছিলেন মাওলানা কে.এস. এম আব্দুর রহমান। তিনি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৫৪] বর্তমানে মাওলানা মোঃ আলমগীর সুপারিন্টেডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।

৪.২.৬.৪ বিলনালিয়া দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর

মৌলভী মোঃ হাবীবুর রহমান, ইমাজউদ্দিন ব্যাপারী, মোকসেদ জমাদার, আনারুদ্দিন সরদার, হাজী আবুল হাশেম, আলহাজ্ব মোঃ আছিরদ্দিন ব্যপারী, রোকনউদ্দিন ব্যাপারী এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ বিলনালিয়ায় এ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি প্রথমে মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয়। ০১.০১.১৯৮৪ সালে মাদরাসাটিতে ইবতেদায়ী ও দাখিল শ্রেণী খোলা হয়। মাদরাসা শুরুর সময় একটি টিনের ঘর ছিল। ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসায় দ্বিতল বিশিষ্ট একটি ভবন

---

[৫৪] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, শোলাখন্ড কারামাতিয়া দাখিল মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ আলমগীর, সুপারিনটেনডেন্ট, শোলাখন্ড কারামাতিয়া দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

রয়েছে। মাদরাসা শুরুর সময় অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০ জন। ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০ জন এবং ২০০৭ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ৩০০ জন। মাদরাসা শুরুর সময় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন এবং ১৯৮৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা ১৩ জন।[৫৫] অত্র মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন জনাব মাওলানা মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন (০১.০১.০১৯৭৭-১৯৮০), জনাব মাওলানা মোঃ এ.কে.এম বদরোদৌজা (১৯৮১-১৯৯৯) পর্যন্ত। তবে মাওলানা মোহাম্মাদ কামাল উদ্দিন বর্তমানে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪.২.৬.৫ ভূয়ার কান্দি দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর

মরহুম মীর সাহেব আলী, মরহুম মুন্সী আবদুল বারি, মরহুম কুব্বাত আলী খান, মরহুম মোকসেদ মাতুবর এবং এলাকার জ্ঞানী বর্গের প্রচেষ্টায় ১ একর ৩ শতাংশ জমির উপর ১৯৭৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালে দাখিল খোলা হয়। অত্র মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী বোর্ড পরীক্ষা দেয় ১৯৮০ সালে এবং অত্র মাদরাসাটি ১৯৮১ সালে এম.পি.ও ভূক্ত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় অত্র মাদরাসার ১টি টিনের ঘর ছিল। ১৯৮৪ সালে তিনটি টিনের ঘরে পৌঁছে। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে তিনটি টিনের ঘর এবং ১টি সেমি পাকা টিনের ঘর আছে। অত্র মাদরাসা শুরু সময় গুটি কয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৫০ জনে থাকলেও ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ জনে পৌঁছে। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আছে প্রায় ২৮৩ জন। প্রতিষ্ঠার সময় মাদরাসার শিক্ষক ছিল ৩ জন । ১৯৮৪ সালে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৫ জন। ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসার শিক্ষক রয়েছে ১৬ জন। অত্র মাদরাসায় একটি ছোট সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মাওলানা মোঃ ছাহেব আলী (১৯৭৭-১৯৭৮), এরপর জনাব মাওলানা মোহাম্মদ (১৯৭৮-১৯৭৯), জনাব মাওলানা মোঃ বিলায়েত হোসেন (১৯৭৯-১৯৮০), জনাব মাওলানা মোঃ বছির উদ্দিন মোল্যা (১৯৮০-বর্তমান)।[৫৬]

অত্র প্রতিষ্ঠানে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষায় মোট ১৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এর মধ্যে পাস করে ৭ জন। শতকরা প্রায় ৫৪% ছাত্র-ছাত্রী পাস করে।

---

[৫৫] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, বিলনালিয়া দাখিল মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোহাম্মদ কামালউদ্দিন, সুপারিনটেনডেন্ট বিলনালিয়া দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

[৫৬] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, ভূয়ারকান্দি দাখিল মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ বছির উদ্দিন মোল্যা, সুপারিনটেনডেন্ট ভূয়ারকান্দি দাখিল মাদরাসা।

৪.২.৬.৬ ফুকুরহাটি দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর

নূর মোহাম্মদ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি শুরুর সময় মক্তব হিসেবে পরিচালিত হতো। পরবর্তীকালে অত্র মাদরাসায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৯ সালে অত্র মাদরাসার দাখিল খোলা হয়। মাদরাসা শুরু সময় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ বা ৬০ জন। ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫০ জন। ২০০৭ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ জনে পৌঁছে। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় শিক্ষক সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ জন। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক ১২ জন। শুরুর সময় অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি টিনের ঘর ছিল ১৯৮৪ সালে ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২টি আধ পাকা টিনের ঘর একটি একতল বিশিষ্ট ভবন। অত্র মাদরাসার একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আছে। অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সময় সুপার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন জনাব মাওলানা মোঃ মিনহাজ উদ্দিন (১৯৭৭-১৯৮৪) পর্যন্ত।[৫৭] বর্তমানে অত্র মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মোঃ আজম আলী খান।

৪.২.৭ আলিম মাদরাসা

৪.২.৭.১ ভাবুকদিয়া ঠেনঠেনিয়া মাদরাসা

আলহাজ আইনউদ্দিন মোল্যা, আফসার মোল্যা, সাদেক মোল্যা, আব্দুল হালিম মোল্যা ও স্থানীয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৬৯ সালে ভাবুকদিয়া ঠেনঠেনিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নগরকান্দা থানার ঠেনঠেনিয়া বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এটি সনাতন শিক্ষার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। এটি প্রথমে ১৯৬৯ সালে ইবতেদায়ী, এরপর ১৯৭৮ সালে দাখিল এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪ সালে আলিম ও ১৯৯৪ সালে ফাযিল শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার শিক্ষার মান উন্নত হতে থাকে।[৫৮] মাদরাসাটি কয়েকবার বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। মাদরাসাটি শুরুর সময় একটি ছনের কুড়েঘরে ক্লাশ শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে দুটি টিনের ঘরে রুপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ২০০৭ সালে মাদরাসার ভবন সংখ্যা একতলা বিশিষ্ট একটি ভবন ও চারটি টিনের ঘর আছে। মাদরাসার শুরুর সময় গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু করে। ১৯৮৪ সালে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০জন। ২০০৭ সালে

---

[৫৭] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, ফুকুরহাটি দাখিল মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রভাষক শিক্ষক ফুকুরহাটি দাখিল মাদরাসা, ফরিদপুর

[৫৮] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল, ভাবুকদিয়া ঠেনঠেনিয়া আলিম মাদরসা থেকে সংগ্রহ হয়েছে।

অত্র মাদরাসার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫১ জন।[৫৯] মাদরাসা শুরুর সময় শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে ১৯৮৪ সালে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১১ জন এবং ২০০৭ সালে কর্মরত রয়েছে ২৪ জন।[৬০] মাদরাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল লেখাপড়ার জন্য একতলা বিশিষ্ট একটি ছাত্র হোষ্টেল আছে। অত্র মাদরাসায় ১টি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়।[৬১] অত্র মাদরাসায় ১টি বিজ্ঞানাগার আছে। এখানে মাদরাসার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের জীব, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষি শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি ল্যাবরেটরী আছে।[৬২] এছাড়া অত্র মাদরাসায় ১টি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে।[৬৩] ভাবুকদিয়া ঠেনঠেনিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মোঃ আবুল হোসেন (সুপার) ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং মাওলানা মোঃ আবু সাঈদ (অধ্যক্ষ) ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত। বর্তমানে মাওলানা মোঃ মাহফুজুর রহমান দায়িত্ব পালন করছেন।

মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৭৮ সালে প্রথম দাখিল পরীক্ষার অংশ করে। অত্র মাদরাসার ফলাফলে লক্ষণীয় যে, ১৯৭৮-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৫ জন। এর মধ্যে পাশ করে ২৫ জন। পাশের হার ১০০%। ১৯৮৪ সাল পযর্ন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অত্যান্ত নগণ্য হলেও পরবর্তীতে ক্রমশ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০৬ সালে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪২জন এবং পাশের হার ৯০%।[৬৪]

৪.২.৭.২ সবজান নেছা মহিলা মাদরাসা

সবজান নেছা মহিলা মাদরাসা ফরিদপুর জেলা নারী শিক্ষার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। অত্র এলাকায় মাদরাসায় নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য মরহুম আঃ রহিম মিয়া ও আঃ করিম মিয়া[৬৫] এবং এলাকার জ্ঞানী গুণী আলিম ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৭৯ সালে পুর্বখাবাশপুর, ফরিদপুরে অত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৬] মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ফরিদপুর জেলায় নারী শিক্ষার মান

---

[৫৯] তদেব।
[৬০] তদেব।
[৬১] তদেব।
[৬২] তদেব।
[৬৩] তদেব।
[৬৪] মাদরাসা রিজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ হয়েছে।
[৬৫] মোঃ আব্দুর রহিম ও করিম মিঞার পরিচয়: ফরিদপুর শহরে আলীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এরা দুই ভাই এবং খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। দুই ভায়ের প্রচেষ্টায় ফরিদপুর শহরে নারী শিক্ষার এবং মাদরাসা শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে অত্র মাদরাসাটি ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন।
[৬৬] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

অনেক উন্নত হয়েছে। মাদরাসাটি মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে দাখিল, ১৯৮৭ সালে আলিম, ১৯৯৫ সালে ফাযিল শ্রেণীতে রুপান্তরিত হয়। ১৯৭৯ সালে ১টি কুড়েঘরে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে অত্র মাদরাসায় একতলা বিশিষ্ট একটি ভবন তৈরি হয়। ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসার পাকা ভবন সংখ্যা একটি ও টিনের ঘর তিনটি।[৬৭] অত্র মাদরাসা শুরুর সময় শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ২০০৭ সালে অত্র মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ২০ জন।[৬৮] গুটি কয়েক ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে ছাত্রী ছিল প্রায় ২০০ জন। নারী শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের তৎপরতার প্রেক্ষিতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৭ সালে মাদরাসার ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ৪২৫ জন।[৬৯] অত্র মাদরাসা সম্প্রসারণের জন্য ২০ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস ও ইয়াতিমখানা রয়েছে। সবজান নেছা মহিলা মাদরাসায় একটি কম্পিউটার ল্যাব, একটি বিজ্ঞানাগার ও একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে।[৭০] বর্তমানে গ্রন্থাগারে ২ হাজারের বেশি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাওলানা মোঃ ইদ্রিস মিয়া ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্বপালন করেন। বর্তমানে অত্র মাদরাসার দায়িত্বে আছেন মাওলানা মোঃ ইসরাইল মিয়া। মাদরাসার ফলাফল সন্তোষজনক।[৭১]

৪.২.৮ বাকীগঞ্জ ইসলামীয়া ফাযিল মাদরাসা

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী[৭২] এবং হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় চরমাধবদিয়ায় ১৯৪২ সালে বাকীগঞ্জ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসা সনাতন শিক্ষার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। মাদরাসাটি প্রথমে মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয় এবং

---

[৬৭] *তদেব*।

[৬৮] *তদেব*।

[৬৯] *তদেব*।

[৭০] *তদেব*।

[৭১] *তদেব*।

[৭২] মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ১৮ মহররম, ১২১৫ হিঃ ১১ জুন ১৮০০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে মুল্লাটোলা মহল্লার ঐতিহ্যবাহী একটি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহর করেন। তিনি পিতার নিকট পবিত্র কুরআন, আরবী, ফারসী প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সহ সাধারণ জ্ঞান, ক্যালিগ্রাফী ও কুস্তিবিদ্যা ও শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক বিদ্যালাভের পাশাপাশি 'ইলমে মা'রিফাত অর্জনের উদ্দেশ্যে মওলানা ১৮ বৎসর বয়সে ১৮১৯ সালে রায় বেরিলীতে সাইয়্যিদ আহমদের নিকট গমন করেন। তিনি তার মুরিদহন এবং অচিরেই মুরদিশদের হতে খিলাফত পালন করেন। অতপর তিনি সাইয়্যিদ আহমদের নির্দেশে বাংলাদেশ আগমন করেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এদেশে হিদায়েতের কাজ করে যান। সাইয়্যিদ আহমদের তরিকার-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের অনুস্মরণে কারামত আলী এ অঞ্চলে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। মাওলানা কারামত আলী এখানে সর্বপ্রথম শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করে তরিকার-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে ১১ই মে রংপুরে ইন্তিকাল করেন।

পর্যায়ক্রমে এটি ফাযিল মাদরাসায় উন্নীত হয়।[৭৩] মাদরাসাটি মক্তব থেকে দাখিল ১৯৫০ সালে এবং আলিম ১৯৬০ সালে খোলা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে ফাজিল শ্রেণী খোলা হয়। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অপরিসীম অবদান রাখছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাদরাসাটি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[৭৪] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ৫ জন শিক্ষক নিয়ে অত্র মাদরাসাটি ক্লাস শুরু হয়। ১৯৭২ সালে শিক্ষক সংখ্যা ৮ জন হলেও বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ২১ জন।75

মাদরাসার শুরুর দিকে গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে মাদরাসার শিক্ষার মান ও ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী ছিল প্রায় ২০০ জন। ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫০ জন। ২০০৭ সালে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৫৮ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৩০৮ জন এবং ছাত্রী ২৫০ জন। অত্র মাদরাসায় মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে।[৭৬] মাদরাসার ছাত্রদেরলেখা পড়ার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা রয়েছে।[৭৭] অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী হতে দাখিল পর্যন্ত সেমিষ্টারভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। সকল শ্রেণীতে সাময়িক পরীক্ষাসহ টিউটোরিয়াল ও টেষ্টপরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে কারিগরী প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও চালু রয়েছে।[৭৮] ছাত্র-ছাত্রীদের পদার্থ, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা ইত্যাদির গবেষণার জন্য বিজ্ঞানাগার রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে।[৭৯]

অত্র মাদরাসায় একটি গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারে প্রায় ২৫০০ কপি বই রয়েছে।[৮০] নিম্নে সারণীর মাধ্যমে বাকীগঞ্জ মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট ও অধ্যক্ষের তালিকা প্রদত্ত হলো: [৮১]

---

[৭৩] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল, বাকীগঞ্জ ইসলামীয়া ফাযিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

[৭৪] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল, বাকীগঞ্জ ইসলামীয়া ফাযিল মাদরাসা, ফরিদপুর।

[৭৫] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[৭৬] *তদেব*।

[৭৭] *তদেব*।

[৭৮] *তদেব*।

[৭৯] *তদেব*।

[৮০] *তদেব*।

[৮১] *তদেব*।

সারণী- ৪/২ [৮২]

নাম	হতে	পর্যন্ত
মাওলনা ইসহাক (সুপার)	১৯৪২	১৯৫৮
মাওলানা হাম্মদ (সুপার)	১৯৫৮	১৯৬১
মাওলানা আঃ মতিন (সুপার)	১৯৬১	১৯৬৪
মাওলানা সিরাজ (অধ্যক্ষ)	১৯৬৪	১৯৬৫
মাওলানা মোঃ মোছলে উদ্দিন (অধ্যক্ষ)	১৯৬৫	১৯৯৮
মাওলনা মোঃ মাহমুদুল হাসান (অধ্যক্ষ)	১৯৯৮	২০০৮

বাকীগঞ্জ মাদরাসাটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা। মাদরাসার ফলাফলে জানা যায় যে, ১৯৭২-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ৯৪ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৭১ জন এবং পাশের গড় হার ৭৫.৫৩%। মাদরাসাটি গ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। এ মাদরাসার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং কুরআন-হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে সক্ষম হয়।

৪.২.৯.১ বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া কামিল মাদরাসা, মাদারীপুর

আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমদ (পীর বাদশামিয়া) এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৪০ সালে ৮৭ শতাংশ জমির উপর বাহাদুরপুর গ্রামে *বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া কামিল মাদরাসা* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মাদরাসাটি মক্তবের মাধ্যমে শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে কলিকাতা থেকে দাখিল, আলিম, ফাযিল পর্যন্ত মঞ্জুরী লাভ করে। অত্র মাদরাসায় ১৯৮৪ সালে নতুনভাবে ইবতেদায়ী শ্রেণী খোলা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালে কামিল হাদিস গ্রুপ খোলার স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠার সময় অত্র মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫০ জন। ১৯৪৭ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪০০ প্রায়। ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫০ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪৫০ জন। প্রতিষ্ঠান চালুর সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ছিল প্রায় ৪-৫ জন। ১৯৪৭ সালে অত্র মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ জন। ১৯৮৪ সালে অত্র মাদরাসার শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২৩ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা রয়েছে ২৫ জন।

---

[৮২] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সময় দু'টি টিনের ঘর ছিল। ১৯৪৭ সালে ৪টি টিনের ঘর এবং একতলা বিশিষ্ট একটি ভবন ছিল। ১৯৮৪ সালে অত্র মাদরাসার ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন ১টি একাডেমিক ভবন ও ৬টি ছাত্রাবাস ছিল। অত্র মাদরাসায় বি.এন.সি.সি এবং স্কাউট বিভাগ আছে।[৮৩] মাদরাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মাওলানা মোঃ আবুল হাসান মক্কী (১৯৪০-১৯৭৮) এবং মাওলানা মোঃ এইচ. মোসলে উদ্দিন (১৯৭৮-২০০৭)।

সারণী- ৪/৩

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল[৮৪]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৪৮	০৭	০৬	৯৯%
১৯৪৯	০৫	০৪	৯৯%
১৯৫০	০৩	০৩	১০০%
১৯৫১	১০	০৯	৯৯%
১৯৫২	২১	২১	১০০%
১৯৫৫	১৭	১৬	৯৯%
১৯৫৬	১০	০৯	৯৯%
১৯৫৭	০৩	০৩	১০০%
১৯৫৮	১৫	১২	৮০%
১৯৫৯	১৩	১৩	১০০%
১৯৬০	১০	১০	১০০%
১৯৬১	০৪	০৩	৯৯%
১৯৬২	০৮	০৮	১০০%
১৯৬৮	১০	০৯	৯৯%
১৯৭১	০৩	০৩	১০০%
১৯৭২	০৮	০৮	১০০%
১৯৮১	০২	০২	১০০%
১৯৮২	০৮	০৬	৮০%
১৯৮৩	১০	০৬	৬০%
১৯৮৪	০৮	০৫	৬৩%
মোট	১৭৫	১৬৬	৮৯.১৪%

[৮৩] মাদরাসারা রেকর্ড ফাইল, শরীয়াতিয়া কামিল মাদরাসা; সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ আব্দুস সালাম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া কামিল মাদরাসা, মাদারীপুর।

[৮৪] মাদরাসার রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেওেক সংগ্রহ।

উপরিউক্ত সারণীর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় অত্র মাদরাসায় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পাশের হার ৮৯.১৪%, মোট দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ১৭৫ জন এর মধ্যে পাশ করে ১৫৬ জন।

সারণী-৪/৪

আলিম পরীক্ষার ফলাফল[৮৫]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৪৮	০৭	০৭	১০০%
১৯৪৯	০৭	০৩	৪৩%
১৯৫০	০৬	০২	৩৩.৩৩%
১৯৫১	০৭	০৫	৭১.৪২%
১৯৫৫	১৭	১৬	৯৪.১১%
১৯৫৬	১৯	১৩	৬৮.৪২%
১৯৫৭	১৯	০৪	২১.০৫%
১৯৫৮	১৭	১২	৭০.৫৮%
১৯৫৯	২১	১২	৫১.১৪%
১৯৬০	১৫	০৭	৪৬.৬৬%
১৯৬১	১৫	১১	৭৩.৩৩%
১৯৬২	০৮	০৮	১০০%
১৯৬৮	১৪	০৭	৫০%
১৯৭১	০৭	০৫	৭১.৪২%
১৯৭২	০৮	০৮	১০০%
১৯৮১	০৪	০৪	১০০%
১৯৮২	০৫	০৪	৮০%
১৯৮৩	০৪	০২	৫০%
১৯৮৪	১১	১০	৯০.৯০%
মোট	২১১	১৪০	৬৬.৩৫%

উল্লেখিত সারণী থেকে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অত্র মাদরাসার আলিম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছিল ২১১ জন এবং কৃতকার্য হয় ১৪০ জন। শতকরা হারে পাশ করে ৬৬.৩৫%। অত্র মাদরাসায় ফলাফল মোটামুটি ভাল।

---

[৮৫] মাদরাসা রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া কামিল মাদরাসা, সাক্ষাতকার: জনাব মাওলানা মোঃ আঃ সালাম অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া কামিল মাদরাসা।

সারণী- ৪/৫

ফাযিল পরীক্ষার ফলাফল[৮৬]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৪৮	০৭	০৬	৮৫.৭১%
১৯৪৯	০৫	০২	৪০%
১৯৫০	০৯	০৯	১০০%
১৯৫১	০৭	০২	২৮.৫৭%
১৯৫৫	১৭	১৬	৯৯%
১৯৫৬	০৬	০৩	৫০%
১৯৫৭	০৮	০৮	১০০%
১৯৫৮	১৫	১২	৮০%
১৯৫৯	১৭	০৭	৪১.১৭%
১৯৬০	১৫	০৯	৬০%
১৯৬১	১৪	০২	১৪.০২%
১৯৬২	১৪	০৯	৬৪.২৮%
১৯৬৮	২৬	২২	৮৪.৬১%
১৯৭১	০৮	০৭	৯৯%
১৯৭২	১২	১১	৯৯%
১৯৮১	০২	০২	১০০%
১৯৮২	০৪	০৩	৯৯%
১৯৮৩	০৫	০৩	৬০%
১৯৮৪	০৩	০২	৬৬%
মোট	১৯৪	১৩৫	

উপরিউক্ত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফাযিল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থ ছিল ১৯৪ জন এর মধ্যে পাশ করেছে ১৩৫ জন। পাশের শতকরা হার ৬৯.৫৮%।

[৮৬] তদেব।

সারণী- ৪/৬
কামিল পরীক্ষার ফলাফল[৮৭]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৭১	২২	২১	৯৫.৪৫%
১৯৭২	২৪	২৩	৯৫.৮৩%
১৯৮১	২২	২০	৯০.৯০%
১৯৮২	২০	০৫	২৫.০০%
১৯৮৩	১২	০৩	২৫.০০%
১৯৮৪	১৫	১২	৮০.০০%
মোট	১১৫	৮৪	৭৩.০৪%

উপরিউক্ত ফলাফল থেকে লক্ষ করা যায় যে, অত্র মাদরাসার কামিল গ্রুপ থেকে ৬ বছরের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১৫ জন এর মধ্যে পাশ করে ৮৪ জন। পাশের হার শতকরা ৭৩.০৪% ।

৪.২.৯.২ বিশ্বজাকের মঞ্জিল আলিয়া মাদরাসা

১৯৭৭ সালে মরহুম হাশমতুল্লাহ ফরিদপুরী[৮৮] (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ার প্রত্যয়ে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাটি প্রথমে একটি ছোনের কুড়ে ঘরে মক্তবের মাধ্যমে গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে শুরু হলেও এটি বর্তমানে কামিল মাদরাসায় পরিণত হয়েছে।[৮৯] ১৯৮৪ সালে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৫০ জন। ২০০৭ সালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ১০০০ জন। মাদরাসাটি ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার শেষে এবং ভাঙ্গা থানার শুরুর মাঝামাঝি আটরশি নামক স্থানে অবস্থিত। ফরিদপুর থেকে অত্র মাদরাসার দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। মাদরাসাটি যখন শুরু হয়

---

[৮৭] *তদেব।*

[৮৮] মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শেরপুর জেলার সদর থানার পাকুরিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আলাউদ্দিন। তিনি প্রথমে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি নান্দিনা হাইস্কুল থেকে এস এস সি পাস করেন। তিনি স্কুলের লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষকের নিকট আরবী, ফারসি ও শিখতেন। মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষক ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ইউনুছ আলী। তিনি পাবনা জেলার এনায়েতপুরের বাসিন্দা ছিলেন বলে এনায়েতপুরী হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। তিনি এনায়েতপুর দরবার শরীফে দীর্ঘদিন একনিষ্ঠভাবে খেদমত করে আধ্যাত্মিক সাধনার সকল শিক্ষাই সমাপ্ত করেন। তিনি ১৯৩৮/৪০ সালের দিকে ফরিদপুরে ইসলামের সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকার অঞ্চলটি বর্তমানে বিশ্বজাকের মঞ্জিল নামে পরিচিত। পীর হাশমতুল্লাহ ফরিদপুর জেলার সদরপুরে মানুষের জনসেবার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তিনি ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরী করেছেন। তিনি একটি কামিল মাদরাসা, একটি হাইস্কুল এবং ফরিদপুর জেলায় সবচেয়ে বড় একটি মসজিদ এর স্থপতি।

[৮৯] মাদরাসা বার্ষিকী, ১৯৯৪, পৃ: ৭।

তখন শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ জন। অত্র মাদরাসাটি ইবতেদায়ী ১৯৭৭ সালে, দাখিল ১৯৭৯ সালে, আলিম ১৯৮৩ সালে চালু করা হয়। মাদরাসায় শিক্ষার মান পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৯৮৫ সালে ফাযিল শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং ১৯৮৭ সালে কামিল শ্রেণীতে উন্নীত হয়। বর্তমানে মাদরাসার অধ্যক্ষসহ মোট ২৪ জন শিক্ষক রয়েছে। এর মধ্যে ১৩ জন সহকারী শিক্ষক বাকী সব প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক।[৯০] বিশ্বজাকের মঞ্জিল আলীয়া মাদরাসায় দাখিল ও আলিম শ্রেণীর জন্য মানবিক ও বিজ্ঞান কোর্স এবং ফাযিল শ্রেণীর জন্য কলা আর কামিল শ্রেণীর জন্য হাদিস গ্রুপ রয়েছে।[৯১]

অত্র প্রতিষ্ঠানে এবতেদায়ী ১ম শ্রেণী থেকে দাখিল ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সেমিষ্টারভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং সকল শ্রেণীতে সাময়িক পরীক্ষাসহ টিউটোরিয়াল টেষ্ট পরীক্ষার পদ্ধতি চালু আছে। ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ত্রৈমাসিক দেয়াল পত্রিকা ও বার্ষিকীর ব্যবস্থা আছে এবং দাখিল পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা আছে।[৯২] আলীয়া মাদরাসার ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতিকল্পে কম্পিউটার ল্যাব আছে। বর্তমানে মাদরাসায় ১০টি কম্পিউটার আছে। এখানে কারিগরী প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।[৯৩] এ ছাড়া অত্র মাদরাসায় ২য় তলা বিশিষ্ট একটি লাইব্রেরী আছে। বর্তমানে লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।[৯৪]

সারণী-৪/৭

অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষের তালিকা নিম্নরূপ: [৯৫]

নাম	যোগদান হতে	পর্যন্ত
মাওলানা মোঃ আঃ জলিল (সুপার)	২৫.০৯.১৯৭৭	৩০.০৪.১৯৭৮
মাওলানা মোঃ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (সুপার)	০১.০৫.১৯৭৮	৩১.১২.১৯৭৮

[৯০] মাদরাসা বার্ষিকী, *বিশ্বজাকের মঞ্জিল আলীয়া মাদরাসা*, পৃঃ ১৬-১৭।

[৯১] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[৯২] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল এবং মাদরাসা বার্ষিকী, ১৯৯৩, পৃঃ ৮।

[৯৩] মাদরাসা রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[৯৪] *তদেব*।

[৯৫] *তদেব*।

মাওলানা মোঃ আফসার উদ্দিন (অধ্যক্ষ)	০১.০১.১৯৭৯	২৯.০২.১৯৮৪
মাওলানা মোঃ আবু তাহের (অধ্যক্ষ)	২৯.০২.১৯৮৪	২০০১
মাওলানা মোঃ আলাউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	২০০১	অদ্যাবধি

সারণী- ৪/৮

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল[৯৬]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৭৯	০২	০২	১০০%
১৯৮০	০৪	০৪	১০০%
১৯৮১	০৫	০৫	১০০%
১৯৮২	০৫	০৫	১০০%
১৯৮৩	০৭	০৭	১০০%
১৯৮৪	১১	১১	১০০%
মোট	৩৪	৩৪	১০০%

ফলাফল থেকে লক্ষণীয় যে, বিশ্বজাকের মঞ্জিল আলীয়া মাদরাসার দাখিল পরীক্ষার ফলাফল বেশ ভাল। অত্র প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৯-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ৩৪ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৩৪ জন এবং পাশের হার গড়ে ১০০%।

সারণী- ৪/৯

আলিম পরীক্ষার ফলাফল[৯৭]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার
১৯৮৩	০৬	০৬	১০০%
১৯৮৪	১০	১০	১০০%
১৯৮৫	০৮	০৬	৯০%
মোট	২৪	২২	৯১.৬৬%

---

[৯৬] মাদরাসার রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেকে সংগৃহীত।

[৯৭] তদেব।

অত্র প্রতিষ্ঠানের আলিম পরীক্ষার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। আলিম পরীক্ষার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯৮৩-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ২৪ জন এর মধ্যে পাশ করে ২২ জন এবং পাশের গড় ছিল ৯১.৬৬%।

সারণী- ৪/১০

ফাযিল পরীক্ষার ফলাফল[৯৮]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট পাশ	পাশের হার
১৯৮৫	২৮	০৬	১৭	০২	২৫	৮৯.২৮%
১৯৮৮	১৯	০৪	১১	০১	১৬	৯০%
১৯৮৯	১৪	-	০৩	০৭	১০	৮৫%
১৯৯০	২২	-	০৫	০৮	১২	৭০%
১৯৯১	২৪	০১	০৯	০৯	১৯	৭০%
মোট	১০৭	১১	৪৫	২৭	৮৩	৭৭.৫৭%

উপরের ফলাফল থেকে বলা যায় যে, মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৭ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ৮৩ জন। পাশের হার প্রায় ৭৭.৫৭%।

সারণী- ৪/১১

কামিল পরীক্ষার ফলাফল[৯৯]

সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট পাশ	পাশের হার
১৯৮৮	১৭	-	১২	০৫	১৭	১০০%
১৯৮৯	২১	-	১৬	০৪	২০	৯৫%
১৯৯০	২৬	-	১৩	০৮	২০	৯০%
১৯৯১	১৯	-	০৩	১৩	১৬	৮৯%
১৯৯২	০৯	-	০৬	-	০৬	৬৬%
মোট	৯২	-	৫০	৩০	৮০	৮৬.৯৫%

উক্ত বিবরণীর মাধ্যমে বলা যায় যে, মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৯২ জন। পাশ করে ৮০ জন। পাশের হার প্রায় ৮৭%। বিশ্বজাকের মঞ্জিল আলিয়া মাদরাসা ফরিদপুর জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিয়া মাদরাসা। মাদরাসার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক।

---

[৯৮] তদেব।

[৯৯] তদেব।

৪.২.১০ আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস

৪.২.১০.১ ইবতেদায়ী মাদরাসা

ইবতেদায়ী মাদরাসা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত- ১. মাদরাসা আলীয়া, ২. দরসে নিজামী বা কওমী মাদরাসার অনুকরণে।

মাদরাসা আলীয়ার অনুকরণে ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে জুনিয়র প্রথম বর্ষ, জুনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ, জুনিয়র তৃতীয় বর্ষ, জুনিয়র চতুর্থ বর্ষ নামে অভিহিত ছিল।[১০০] মাদরাসা শিক্ষার সূচনা থেকে চার বছরের ইবতেদায়ী কোর্সের উক্ত ধারা চলে আসছে। কোন কোন মাদরাসায় ইবতেদায়ী ক্লাসের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল। আবার যে সকল মাদারাসার সাথে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ইবতেদায়ী ক্লাসগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখা হতো। ইবতেদায়ী মাদরাসার জন্য কোনরূপ সরকারি অনুদান বা বেতন দেওয়া হতো না। তবে ১৯৫৭ সালে শিক্ষা সংস্কার কমিটি ইবতেদায়ী মাদরাসাকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করার সুপারিশ করেছিল।[১০১]

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম ইবতেদায়ী মাদরাসার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শিক্ষার সকল স্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল সাঃ নং ৮/১০/এম-৮/৮৬/২৭৬/(১৫০) শিক্ষা নং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং কমিটি যথা সময়ে তাদের সুপারিশ পেশ করেন।[১০২] ইবতেদায়ী স্তর সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ মালাঃ

(ক) ইবতেদায়ী স্তরের মেয়াদকাল হবে পাঁচ বছর এবং এ স্তরে অনুর্দ্ধ ছয় বছরের শিশুরা ভর্তি হবে।

(খ) ইবতেদায়ী মাদরাসাসমূহ বেসরকারি প্রচেষ্টায় ও আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে। তবে অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে স্থাপন না করে প্রয়োজন অনুসারে অবস্থানগত সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন।

---

[১০০] আরবীতে ক্লাসগুলোর নাম যথাক্রমে- جوتير سال حباوم، جوتيرسالرم، مونير سال دوم، جوتيرسال أفل দ্রঃ মোঃ আব্দুস সাত্তার, *তারিখে মাদরাসা আলিয়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২।

[১০১] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৯০-২৯১।

[১০২] *তদেব*, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬।

(গ) এ সকল মাদরাসার শিক্ষার মান উন্নতি করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের যোগ্যতার মান দ্বীনিয়াত শিক্ষাদানের জন্য মাদরাসা শিক্ষা প্রাপ্ত (আলিম) শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষকদের সকলেরই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া দরকার। এ উদ্দেশ্যে আপাতত প্রইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহ ইবতেদায়ী শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা সংরক্ষিত থাকা দরকার। শিক্ষকদের বেতনক্রম ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

(ঘ) প্রতিটি মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণী কক্ষ শিক্ষা উপকরণ আসবাপত্র ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার ও স্থানীয় জিনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে এক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীনে উপজেলা পর্যায়ে ইবতেদায়ী মাদরাসা সমূহের নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

(চ) দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার বিষয়সমূহ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহের (বাংলা, গণিত, সমাজ ইত্যাদি) গণ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক সমূহ ইবতেদায়ী মাদরাসায় পঠিত হবে। ধর্মীয় বিষয়সমূহের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকই হবে। এতে দুই ধারায় একই পর্যায়ের শিক্ষার মানের সমতা বেশ খানিকটা চলে আসবে।

(ছ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিনামূলো পাঠ্যপূস্তকে বিতরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা ইবতেদায়ী মাদরাসার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাবলীর ক্ষেত্রেও অনুরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(জ) প্রত্যেকটি ইবতেদায়ী মাদরাসার সার্বিক পরিচালনা ও উন্নতির জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে।

(ঝ) শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের উপকরণসমূহ যে সব মাদরাসায় বিজ্ঞান পড়ানো হয়, সে সব মাদরাসায় প্রদান করা উচিত।

(ঞ) ইবতেদায়ী স্তরের পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বর্তমান বৃত্তি পরীক্ষা চালু থাকবে।

(ট) ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে: [১০৩]

---

[১০৩] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৫২৮; মোঃ নিযাজউদ্দিন, 'বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-২০০০)', অপ্রকাশিত *এম.ফিল অভিসন্দর্ভ* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ: ১০৬।

সারণী- ৪/১২

ইবতেদায়ী স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	যোগ্যতা	বেতনক্রম
সুপারিনটেনডেন্ট-১ জন	ফাযিল, সি. এড[১০৪]	প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান
সহকারী মৌলভী-২ জন	আলিম, সি. এড	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ
সহকারী শিক্ষক-১ জন	আলিম বা উচ্চ মাধ্যামিক, সি. এড	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ
ক্বারী-১ জন	মুজাব্বিদ মাহির, সি. এড	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা এর প্রণীত ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ:

১। ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী: পূর্ণমান-৫০০

কুরআন, আরবী, আকাইদ ও ফিকহ, বাংলা, গণিত, ইংরেজি।

২। ইবতেদায়ী ২য় শ্রেণী: পূর্ণমান-৫০০

কুরআন, আরবী, আকাইদ ও ফিকহ, বাংলা, গণিত, ভূগোল ও সমাজ পাঠ, উর্দূ, ইংরেজি

৩। ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণী: পূর্ণমান-৭০০

কুরআন, ফিকহ, আকাইদ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজবিজ্ঞান (অতিরিক্ত বিষয়)

৪। ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণী: পূর্ণমান-৭০০

কুরআন, ফিকহ ও আকাইদ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজবিজ্ঞান (অতিরিক্ত বিষয়)

৫। ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী পূর্ণমান-৫০০

কুরআন, আরবী ১ম পত্র, আরবী ২য় পত্র, আকাইদ, ফিকহ, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজপাঠ, বিজ্ঞান।[১০৫]

মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য তিনশত নম্বরের পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম রয়েছে।[১০৬] যথা-

---

[১০৪] সি. এড বলতে এখানে বি.এড-এর অনুরূপ একটি কোর্স।

[১০৫] বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি থেকে গৃহীত, পৃ: ৩-৮।

[১০৬] তদেব, পৃ: ২৯-৩০।

আরবী ৭৫, আকাইদ ও ফিকহ্ ৭৫, বাংলা ৭৫, গণিত ৭৫

৪.২.১০.২ দাখিল স্তর ও আলিম স্তর

উপনিবেশিক আমলে মাদরাসা শিক্ষা বহুলাংশে ধ্বংস করা হলেও কলিকাতা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত মাদরাসা সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আমলেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ আমলেও মাদরাসা স্থাপনের গতিধারা অব্যাহত আছে।

পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচিঃ বাংলাদেশ সূচনালগ্নে আলিয়া মাদরাসায় পাকিস্তান আমলের পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত ছিল। সে সময়ে দাখিল শ্রেণীগুলোকে দাহম, নাহম, হাশতম ও হাফতম নামে অভিহিত করা হতো। হাফতম শ্রেণীতে একটি বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সাথে এর কোন মান নির্ধারিত ছিলনা। দাখিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচি নিম্নরূপঃ

১. আবশ্যিক বিষয় দাহম, জুনিয়র ১ম বর্ষ

ক) ছরফ-মিযান, মুনশায়াব (পূর্ণ)

খ) ফারসী-ফারসী কি পয়লী কিতাব।

গ) উর্দূ-উর্দূ কি দোসরী কিতাব

ঘ) অংক-জমা তাফরীক।

ঙ) তাজবীদ

ঐচ্ছিক বিষয়

চ) ইংরেজি অথবা

ছ) বাংলা

২. নাহম/জুনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ।

আবশ্যিক বিষয়

ক. আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ- বাকুরাতুল আদব, ১ম খণ্ড, পাঞ্জেগাঞ্জ, নাহুমীর, জুমাল, মিয়াতু আমিল।

খ. ফারসী-ফারসী কি দোসরী কিতাব, সাফওয়াতুল মাসাদীর।

গ. উর্দূ-উর্দূকি তেসরী কিতাব।

ঘ. অংক।

ঙ. তাজবীদ।

ঐচ্ছিক বিষয়

চ. ইংরেজি

ছ. বাংলা

হাশতম/জুনিয়র তৃতীয় বর্ষ।

৩. আবশ্যিক বিষয়

ক. আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ-কায়লুবী, ফুসুলে আকবরী, হেদায়াতুন্নাহু, তরজুমায়ে আরবী।

খ. মানতিক-ইছাগুজী, মিযানুল মানতেক।

গ. ফারসী-গুলিস্তা-১ম অধ্যায়, বোস্তা ২য় অধ্যায়, মিফতাহুল কাওয়ায়িদ।

ঘ. উর্দূ-মুযাল্লামত তাহজীব, ২য় খণ্ড

ঙ. অংক।

চ. ইতিহাস ও ভূগোল।

ঐচ্ছিক বিষয়

৭. ইংরেজি অথবা বাংলা।

৪. হাফতম/জুনিয়র, ৪র্থ বর্ষ

আবশ্যিক বিষয়

ক. আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ-ফসুলে আকবরী, কাফিয়া;

খ. মুনিয়াতুল মুসুল্লী;

গ. মানতেক-মেরকাত;

ঘ. ফারসী-আখলাকুল মুহসেনীন, মিফতাহুল কাওয়ায়েদ;

ঙ. উর্দূ-মুযাল্লিমুত তাহজীব (১ম অংশ);

চ. অংক;

ছ. ইতিহাস ও

জ. ভূগোল।

ঐচ্ছিক বিষয়

ঝ. ইংরেজি

ঞ. বাংলা

আলিমঃ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরঃ নিম্নে সারণীর মাধ্যমে আলিম শ্রেণীর সিলেবাস তুলে ধরা হলোঃ [১০৭]

সারণী-৪/১৩

আলিম শ্রেণীর সিলেবাস

২ বছর মেয়াদী	পত্র	পূর্ণমান
১. হাদিস ও তাফসীর	২টি	২০০
২. আরবী সাহিত্য পদ্য, আরবী সাহিত্য গদ্য, বালাগাত, ইসলামের ইতিহাস	৪টি	২৫০
৩. ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ	২টি	১৫০
৪. মানতিক এবং হিকমত	২টি	১০০
৫. ইংরেজি অথবা ফারসী	যে কোন ১টি	১০০
৬. উর্দূ	১টি	১০০
ঐচ্ছিক		
৭. ফারসী সাহিত্য	১টি	১০০

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তান আমলের উক্ত পাঠ্যসূচি ১৯৭১ সালের পরও মাদরাসাগুলোতে বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। এ কমিশনের সুপারিশ পেশ করার পর এর বিচার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে বাস্তব পরামর্শ দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার রেজুলেশন নং শা-১৫৬০ শিক্ষা, তারিখ ১১.১১.১৯৭৫ ইং এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুহাম্মদ শামছুল হক। কমিটি দেশের মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য তৎকালীন 'মাদরাসা-ই-আলীয়া' এর অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম আইয়ুব আলীকে চেয়ারম্যান করে একটি সাব-কমিটি গঠন করেন।

উপরিউক্ত সাব-কমিটি মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৫ সালে সংশোধিত শিক্ষাক্রমের ত্রুটি বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। সাব-কমিটির গৃহীত রিপোর্টটি জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটিতে পেশ করেন। পরবর্তী জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটির সাবকমিটি উক্ত রিপোর্ট অনুমোদন করেন। এভাবে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের ১৯৭৫ সালে সংশোধিত পাঠ্যতালিকা জাতীয়

[১০৭] মোঃ আব্দুস সাত্তার, *তারিখ-ই-মাদরাসা-ই-আলীয়া* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃঃ ২৫২।

শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত হয়। এ পাঠ্য তালিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল মাদরাসা শিক্ষাকে দেশের প্রচলিত শিক্ষার সাথে সমন্বিত করা।[১০৮]

কমিটি ১৯৭৬ সালে মাদরাসা পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার পর দাখিল ও আলিম স্তরের যে পাঠ্যসূচি অনুমোদন করে তা ছিল নিম্নরূপঃ

সারণী-৪/১৪

দাখিল স্তর (মাধ্যমিক) ৬ বছর মেয়াদী

ক্রমিক নং	বিষয়	পূর্ণমান
১	পবিত্র কুরআন তাজবীদ পাঠ্যভ্যাস	১০০
২	নির্বাচিত সূরার অনুবাদ	১০০
৩	আকাইদ	১০০
৪	আল-ফিক্হ	১০০
৫	উসুলে ফিকহ্	১০০
৬	আরবী সাহিত্য ও অনুবাদ	১০০
৭	আরবী ব্যাকরণ ও অনুবাদ	১০০
৮	বাংলা	১০০
৯	গণিত	১০০
১০	সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি)	১০০
১১	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
১২	ইংরেজি	১০০
১৩	শারীরিক শিক্ষা ও আর্টস এন্ড ক্রাফটন	১০০
১৪	ফারসী অথবা উর্দূ	১০০
	সর্বমোট নম্বরঃ	১৪০০

[১০৮] Dr. A.K.M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), P. 189; সেকেন্দার আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: জাতীয় পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৮৯।

সারণী- ৪/১৫

আলিম স্তর (উচ্চ মাধ্যমিক) ২ বছর মেয়াদী[১০৯]

ক্রমিক নং	বিষয়	পূর্ণমান
১	পবিত্র কুরআন অনুবাদ	১০০
২	আল হাদীস ও উসূলুস হাদীস	১০০
৩	আরবী সাহিত্য	১০০
৪	আল-ফিক্‌হ (ইসলামী আইন)	১০০
৫	উসূলে ফিকহ (ইসলামী আইনের নীতিমালা)	১০০
৬	ইল্‌মূল মিরাস (স্বত্ত্বাধিকার আইন)	১০০
৭	ইল্‌মূল মানতেক	১০০
৮	ইসলামের ইতিহাস	১০০
৯	বাংলা	১০০
১০	নিম্নে যে কোন দু'টি বিষয় ক. ইংরেজি, খ. উর্দূ গ. ফারসী ঘ. সাধারণ বিজ্ঞান	২০০
	সর্বমোট নম্বর:	১১০০

সারণী- ৪/১৬

আলিম বিজ্ঞান গ্রুপের সিলেবাস

ক্রমিক নং	বিষয়	পূর্ণমান
১	আল-কুরআনের অনুবাদ	১০০
২	আল হাদীস ও উসূলুল হাদীস	১০০
৩	আরবী সাহিত্য	১০০
৪	আল-ফিক্‌হ	১০০
৫	ইল্‌মূল-মিরাস	৫০
৬	বাংলা	১০০
৭	ইংরেজি	১০০
৮	সাধারণ গণিত	১০০
৯	পদার্থ বিজ্ঞান	১০০

---

[১০৯] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪৮০-৪৮১; History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, *op,cit*, P. 209-212; সেকেন্দার আলী ইব্রাহিমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান*, পৃ: ৯০-৯১।

১০	রসায়ন	১০০
১১	উদ্ভিদ বিজ্ঞান/গণিত	১০০
১২	ঐচ্ছিক বিষয় যে কোন ২টি ক. গণিত খ. উদ্ভিদ বিজ্ঞান গ. উচ্চতর ইংরেজি ঘ. উর্দূ ঙ. ফারসী চ. উচ্চতর বাংলা ছ.কৃষি জ. ইস: ইতিহাস ঝ.উসূলে ফিকহ ঞ. তর্ক-শাস্ত্র	১০০
	সর্বমোট নম্বর:	১৪০০

১৯৭৫ সালে গঠিত ও ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত মাদরাসা শিক্ষার উক্ত পাঠ্যসূচি ও কারিকুলাম মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদন করে নেয়। ফলে ১৯৭৬ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দাখিল ছয় বৎসরের ও আলিম দুই বছরের কোর্স চালু হয়। অন্যান্য স্তর যেভাবে ছিল সেইভাবেই থেকে যায়। এ কারিকুলাম ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বৎসর কার্যকর ছিল।[১১০] ১৯৭৯ সালে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ মালায় ৬ষ্ঠ নম্বরের উল্লেখ করেছেন যে, মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের পর দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক, আলিম স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাযিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমর্যাদা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।[১১১] এ সুপারিশের আলোকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫.১১.১৯৮৫ তারিখের এক আদেশে মাদরাসা শিক্ষা ধারার দাখিল স্তরকে সাধারণ শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক স্তরে এবং মাদরাসা শিক্ষার আলিম স্তরকে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণ্য করে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, দাখিল স্তরের সমমান ১৯৮৫ সাল হতে এবং আলিম স্তরকে ১৯৮৭ সালে সমমান কার্যকর হবে।[১১২] সে অনুযায়ী সিলেবাসকে আরও আধুনিকীকরণ করা।

[১১০] বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল, আলিম ও দাখিল পরীক্ষায় ১৯৮৪ পাঠ্যক্রম ও অতীত ও বতমান, পৃ: ৯০; বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যসুচী ও পাঠ্যক্রম, ১৯৮৪, পৃ: ১।

[১১১] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ: ৫০১।

[১১২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫.১১.১৯৮৫ তারিখে শা: ৯/৬এনসি-১৩/৮৪/৭৪১(১১)-শিক্ষা নং আদেশ।:

সারণী- ৪/১৭

দাখিল (এস এস সি) ও আলিম (এইচ এস সি) সিলেবাস

ক. দাখিল

বিভাগ সমূহের নাম	বিষয়সমূহের নাম		পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ (মানবিক বিভাগ)	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মজীদ ও তাজবিদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজি	১০০
		৮. সাধারণ গণিত	১০০
		৯. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		১০. ভূগোল ও অর্থনীতি	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. পৌরনীতি, ২. মানতিক ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. উচ্চতর বাংলা, ৫. উর্দু, ৬. ফারসী ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য) ৮. কৃষি শিক্ষা ৯. উচ্চতর গণিত, ১০. কম্পিউটার শিক্ষা, ১১. সাধারণ বিজ্ঞান ১২. বেসিক ট্রেড	১০০
		সর্বমোট	১১০০
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ ও তাজবিদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজি	১০০
		৮. সাধারণ গণিত	১০০
		৯. সাধারণ বিজ্ঞান ১ম পত্র	১০০
		১০.সাধারণ বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উচ্চতর গণিত, ২.উচ্চতর বাংলা ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. উর্দু, ৫. ফারসী, ৬. কৃষি শিক্ষা ৭. গার্হস্থ্য অর্থনীতি (শুধু মেয়েদের জন্য) ৮. ভূগোল ও অর্থনীতি ৯. কম্পিউটার শিক্ষা ১০. বেসিক টেড, ১১. ইসলামের ইতিহাস ১২. সামাজিক বিজ্ঞান	১০০
		সর্বমোট	১১০০
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ ও তাজবিদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্	১০০
		৬. বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজি	১০০

		৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৯. তাজবিদ ও নসর নযম	১০০
		১০. কিরআতে তারতীল ও হাদর (মৌখিক)	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উর্দু, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট	১১০০
হিফজুল কোরআন বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ	১০০
		২. হাদীস শরীফ	১০০
		৩. আরবি সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৪. আরবি সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৫. ফিকহ ও উসূলে ফিকহ	১০০
		৬.বাংলা	১০০
		৭. ইংরেজি	১০০
		৮. ইসলামের ইতিহাস	১০০
		৯. তাজবিদ	১০০
		১০. হিফজুল কুরআন হাদর	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. উর্দু, ২. ফারসী, ৩. সাধারণ গণিত	১০০
		সর্বমোট	১১০০

খ) আলিম

বিভাগের নাম	বিষয়সমূহের নাম		পূর্ণমান
সাধারণ বিভাগ (মানবিক বিভাগ)	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলে হাদীস	১০০
		৩. আল ফিকহ ১ম পত্র	১০০
		৪. আল ফিকহ ২য় পত্র	১০০
		৫. আরবী সাহিত্য ১ম পত্র	১০০
		৬.আরববী সাহিত্য ২য় পত্র	১০০
		৭. বাংলা	১০০
		৮. ইংরেজি	১০০
		৯. ইসলামের	১০০
		১০. বাংলা ও মানতিক	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামি অর্থনীতি ২. পৌরনীতি ৩. উচ্চতর ইংরেজি ৪. উর্দু, ৫.ফারসী	২০০
		সর্বমোট	১২০০
বিজ্ঞান বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলে হাদীস	১০০
		৩. ফিকহ (সাধারণ বিভাগের	১০০
		১ম পত্রের অনুরূপ)	১০০
		৪. আরবী সাহিত্য	১০০
		৫. বাংলা	১০০
		৬.ইংরেজি	১০০
		৭. পদার্থ বিজ্ঞান ১ম পত্র	১০০
		৮. পদার্থ বিজ্ঞান ২য় পত্র	১০০

		৯. রসায়ন ১ম পত্র	১০০
		১০. রসয়ন ২য় পত্র	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. জীববিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র ২. উচ্চতর গণিত ১ম ও ২য় পত্র ৩. আরবি সাহিত্য ১ম ও ২য় পত্র	২০০
		সর্বমোট	১২০০
মুজাব্বিদ বিভাগ	আবশ্যিক বিষয়	১. কুরআন মাজীদ ও তাজবিদ	১০০
		২. হাদীস ও উসূলে হাদিস	১০০
		৩. ফিক্‌হ (সাধারণ বিভাগের ফিকহ্ ১ম পত্রের অনুরুপ)	১০০
		৪. বাংলা	১০০
		৫. ইংরেজি	১০০
		৬. আরবি সাহিত্য (বিজ্ঞান বিভাগের অনুরুপ)	১০০
		৭. তাজবিদ ১ম পত্র	১০০
		৮. তাজবিদ ২য় পত্র	১০০
		৯. কিরআতে তারতীল	১০০
		১০. কিরআতে হাদর	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামি অর্থনীতি ২. পৌরনীতি ৩. উচ্চতর গণিত ৪. উচ্চতর ইংরেজি ৫. উর্দু, ৬. ফারসি	২০০
		সর্বমোট	১২০০

ফাযিল স্তরকে স্নাতক ডিগ্রীর সমমান এবং কামিল স্তরকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ বিবেচনাধীন থেকে যায়।[১১৩] দাখিল এবং আলিম সংক্রান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের ফলেই একজন দাখিল শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ১ম বর্ষ অথবা স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

৪.২.১০.৩ ফাযিল ও কামিল স্তর

মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি অনুসারে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফাযিল শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতা অর্জিত হয়। সাধারণভাবে ফাযিল ডিগ্রীকে মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ স্তর এবং কামিলকে বিশেষ স্তর মনে করা হয়। এ দু'টি স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

১৯৭৬ সালের প্রণীত ফাযিল শ্রেণীর সিলেবাস

Fazil (Graduate-Degree) Stage, Humanities Gruop of 2 (two) year' duration.

Subjects of Study :

i) Tafsir-al qur'an-al-karim & Usul-al-Tafsir.

---

[১১৩] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ: ৪১৪।

ii) Al-Hadith & Usul - al hadith

iii) Arabic Literature (three papers)

iv) Al-Fiqh

v) Usul -al-fiqh

vi) Ilm-al-Tawhid wal Aqaid

vii) Islamic History

viii) Bengali

ix) Any two of the following :

a) English

b) Urdu

c) Parsian

d) Logic

e) Al- Tasaw-wuf

f) Ilm-al-iqtisad-al-Islami

g) Islamic Philophy

h) Ilm-al-Akhlaq awa-adabul Islami

i) Ilm-al Iqtisad (Modern)

j) Agriculture.

Fazil (Graduate-Degree) Stage, Science Gruop of 2 (two) year' duration.

Subjects of Study :

i) Al-Tafsir

ii) Al-Hadith

iii) Arabic Literature (Two papers)

iv) Bengali

v) English

vi) Physics

vii) Chemistry

viii) Biology/Mathematich

ix) Aditional Subject

ix) Any two of the following:

a) Elective Mathematich

b) Biology

c) Bengali (Elective)

d) English (Higher)

e) Agriculture

f) Al-Fiqh& Usul -al-Fiqh

g) History of Islam. [১১৪]

পাঠদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচিঃ ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে দেখা যায় যে, ফাযিল শ্রেণীতে সাধারণ ও বিজ্ঞান দু'টি বিভাগই পরিবর্তিত ছিল। ফাযিল শ্রেণীতে পাঠ্যসূচির বিষয়সমূহ ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষে পাঠদান করা হতো এবং বোর্ড পরীক্ষা হতো ২য় বর্ষের শেষে। ফাযিল সাধারণ বিভাগে আবশ্যিক বিষয় ১০টি এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে কোন ১টি।

সারণী- ৪/১৮

ফাযিল সাধারণ বিভাগ[১১৫]

ক্রমিক নং	বিষয়	মান
১	পবিত্র কুরআনের তাফসীর	১০০
২	আল-হাদীস	১০০
৩	আরবী সাহিত্য (১ম পত্র)	১০০
৪	আরবী সাহিত্য (২য় পত্র)	১০০
৫	আল ফিক্‌হ (১ম পত্র)	১০০
৬	আল ফিক্‌হ (২য় পত্র)	১০০

---

[১১৪] Dr. A.K.M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), P. 211-213.

[১১৫] বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল পরীক্ষায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসুচী-১৯৮৪, পৃ: ২৩-২৪।

৭	আকাঈদ	১০০
৮	ইসলামের ইতিহাস	১০০
৯	বাংলা	১০০
১০	ইংরেজি	১০০
	ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিম্নের যে কোন একটি	
১	সাধারণ অর্থনীতি ও ইসলামের অর্থনীতি	২০০
২	পৌরনীতি সূত্রাবলী ও বাংলাদেশ পৌরনীতি	২০০
৩	মুসলিম দর্শন ও তাসাউফ	২০০
৪	উর্দূ	২০০
৫	ফারসী	২০০

সারণী- ৪/১৯

ফাযিল বিজ্ঞান বিভাগ[১১৬]

ক্রমিক নং	বিষয়	মান
১	তাফসীর ও হাদীস	১০০
২	আরবী সাহিত্য	১০০
৩	বাংলা	১০০
৪	ইংরেজি	১০০
৫	পদার্থ বিজ্ঞান	২০০
৬	রসায়ন	২০০
৭	গণিত/বায়োলজি	২০০
	ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিম্নের যে কোন একটি	
১	গণিত	২০০
২	বায়োলজি	২০০
৩	ইসলামী দর্শন	২০০
৪	অর্থনীতি	২০০

বায়োলজি বা গণিত এর যে বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবে তা ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।

[১১৬] *তদেব*।

সারণী- ৪/২০

১৯৮৯ সালের ফাযিল শ্রেণীর সিলেবাস

খ) ফাযিল

বিভাগের নাম	বিষয়সমূহের নাম		পূর্ণমান
ফাযিল	আবশ্যিক বিষয়	১. মাতৃভাষা (বাংলা/উর্দু/ইংরেজি বিকল্প) ১টি পত্র	১০০
		২. উলসূল কুরআন ওয়াল হাদীস, ৩টি পত্র	৩০০
		৩. উলসূল আরাবীয়া ওয়াশ শরীয় (সাধারণ বিভাগের জন্য) উলসূল তাজবীদ ওয়াল ক্বিরাত (মুজাব্বিদ বিভাগের জন্য) ৩টি পত্র	৩০০
	ঐচ্ছিক বিষয় (যে কোন ১টি)	১. ইসলামের ইতিহাস, ২. উদূ, ৩. ফারসী, ৪. আরবি, ৫. বাংলা, ৬. ইসলামি দর্শন, ৭.রাষ্ট্র বিজ্ঞান ৮. অর্থনীতি ৯. ইংরেজি	৩০০
		সর্বমোট	১০০০

কামিল

আলিয়া মাদরাসার কামিল স্তর- ২ বৎসর মেয়াদী, কামিল স্তরের মোট ৫ টি বিভাগ।

১। কামিল-হাদীস

২। কামিল-ফিক্হ

৩। কামিল-তাফসীর

৪। কামিল-আদব

৫। কামিল-মুজাব্বিদ

১৯৭৬ সালের প্রণীত কামিল শ্রেণীর সিলেবাস

Kamil (Post-Graduate) Stage (Tafsir Group) of 2 Yearr duration

Subjects of study:

(i)Tafsir-4 papers (Al-Kash-shaf & Al-Baidawi).

(ii) Usul-al-Fafsir-1 paper

(iii) Al-Hadith-(Kkitab-al-Tafsir in canonical traditions)-1

(iv) Fiqh-al-Quaran-1 paper.

(v) I`jazul-Quran wa Ma`ani-ul-Qur`an-I paper

(vi) Islamic History (Including Modern period)-2 Papers.

Kamil (Post-Graduate) Stage-Fiqh Group) of 2 Years duration.

Subjects of study:

(i) Al-Hadith-2 papers-(Jami-al Bukhari)

(ii) 'Ilm-al-Tawhid & Al-Kalam-2 papers

(iii) Al-Fiqh-al-Islami-2 papers

(iv) Usul-al-Fiqh-2 papers

(v) Islamic History-2 papers (Including Moder period)

Kamil (Post-Graduate) Stage (Al-Adad-al-Arabi group) of 2 years' duration.

(i) Arabic Literature (Classical prose)-2 papers

(ii) Arabic Literature (Classical prose)-2 papers

(iii) Arabic Literature (Modern property)-1 papers

(iv) Arabic Literature (Modern prose)-2 papers

(v) Rhetoric, prosody & i'jazul Qur'an-1 paper

(vi) Literary criticism-1 paper

(vii) Art of writting & Oratory (Theoritical & practical)-1 paper

(viii) History of Arabic Language & Literature-1 paper

(vi) 'Ilm-al-Mirath (Law of Inheriance).

(vii) 'Ilm-al-Mantiq (Logic).

or

Al 'ulum-al Riadia (Mathematics).

(viii) History of Islam

(ix) Bengali.

(x) Any two of the following:

(a) English

(b) Urdu

(c) Persian

(d) General Science.[১১৭]

---

[১১৭] Dr. A.K.M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education Bangladesh*, P. 211-213.

১৯৭১ সালে থেকে উক্ত পাঁচটি বিভাগের প্রতিটিতে ১০০০ নম্বরে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চলে আসছিল। ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে দেখা যায় যে, কামিল শ্রেণীর প্রতিটি শাখার জন্য ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাসহ মোট ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২ বৎসর পাঠদানের পরে এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কামিল শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে কোন পরিবর্তন নেই।

সারণী- ৪/২১

কামিল স্তর ২ বছর মেয়াদী সিলেবাস[১১৮]

বিভাগের নাম	পত্র নং	বিষয়সমূহের নাম	পূর্ণমান
হাদীস	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	হাদীস ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	হাদীস ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	হাদীস ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	হাদীস ৬ষ্ঠ পত্র	১০০
	৭ম পত্র	তাফসীর ও উসূলে তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	তাফসীর ও উসূলে তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০
ফিকাহ্ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	কালাম ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	কালাম ২য় পত্র	১০০
	৫ম পত্র	ফিকহ্ ১ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	ফিকহ্ ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	উসূলে ফিকহ্ ১ম পত্র	১০০
	৮ম পত্র	উসূলে ফিকহ্ ২য় পত্র	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০
আদব বিভাগ	১ম পত্র	আরবি সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	আরবি সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	আরবি সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	আরবি সাহিত্য (প্রাচীন গদ্য) ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	আরবি সাহিত্য (আধুনিক গদ্য)	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	আরিবি সাহিত্য (আধুনিক পদ্য)	১০০
	৭ম পত্র	বালাগাত, আরুজ ও কাফিয়া	১০০

[১১৮] বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত কামিল পরীক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী।

	৮ম পত্র	নাকদুল আদাব	১০০
	৯ম পত্র	আল কিতাবাতু ওয়াল খিতাবাতু	১০০
	১০ম পত্র	আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০
তাফসীর বিভাগ	১ম পত্র	তাফসীর ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	তাফসীর ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	তাফসীর ৩য় পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	তাফসিরুল হাদীস	১০০
	৭ম পত্র	ফিক্হুল কুরআন	১০০
	৮ম পত্র	ইজাজুল কুরআন ও মায়ানিউল কুরআন	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০
মুজাব্বিদ বিভাগ	১ম পত্র	হাদীস ১ম পত্র	১০০
	২য় পত্র	হাদীস ২য় পত্র	১০০
	৩য় পত্র	উসূলে ক্বিরাআত আ'শারা ১ম পত্র	১০০
	৪র্থ পত্র	তাফসীর ৪র্থ পত্র	১০০
	৫ম পত্র	উসূলে তাফসীর ৫ম পত্র	১০০
	৬ষ্ঠ পত্র	উসূলে ক্বিরাআত আ'শারা ২য় পত্র	১০০
	৭ম পত্র	ইযরা ক্বিরাআত আ'শারা	১০০
	৮ম পত্র	মশ্ক ক্বিরাআত আ'শারা	১০০
	৯ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র	১০০
	১০ম পত্র	ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র	১০০
		মৌখিক পরীক্ষা	১০০
		সর্বমোট	১১০০

৪.২.১১ মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও সিলেবাস এবং আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়

সারাদেশে যে ওল্ডস্কীম মাদরাসা প্রচলিত রয়েছে তার আদি সুতিকাগার হচ্ছে কলিকাতা আলিয়া মাদারাসা; যাকে ঘিরে সকল মাদরাসার কার্যক্রম যুগযুগ ধরে অতিবাহিত হয়ে আসছে, এ ভাবেই বৃটিশ আমলে ১৭৮০ সালে অক্টোবর মাসে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মোল্যা মাজদুদ্দিন ও কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার দারসে নিজামী মাদরাসার শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসুচী অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন; যা যুগের পরিবর্তনশীল চাহিদার তাগিদে সময় সময় কিছুটা পরিবর্তিত হলেও আজও চালু রয়েছে। বিশেষত তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ এর ইসলামী

শাস্ত্রের মূল বিষয়গুলো আজও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে।[১১৯] যে সকল পাঠ্যসুচী ও পাঠ্য পুস্তক তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত ছিল তা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পাঠ্যপুস্তক
১	সরফ (শব্দপ্রকরণ)	মিযান, মুনশাইব পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদাহ সারফমীর, দাস্তবুল মুবতাদী, ফসুলে আকবরী ও ইত্যাদি।
২	নাহউ (বাক্য প্রকরণ)	নাহুমীর, শরহেমেয়াতের আমিল, হিদায়াতুন্নাহু, কাফিয়া, শরহেযামী ইত্যাদি।
৩	বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র)	মুখতাসারুল মায়ানী, মুতাওয়াল ও তালখীসুল মিফতাহ ইত্যাদি।
৪	আদব (আরবী সাহিত্য)	নুফহাতুল ইয়ামান, সাবআহ মুয়াল্লাকাহ, দিওয়ানে হামাসা, দীওয়ানে মুতান্নাবী, মাকামাতে হারীরী।
৫	ফিকাহ (হালামী আইন)	কুদুরী, শারহে বিকায়াহ, হিদায়াহ ইত্যাদি।
৬	উসুলে ফিকহ (আইন শাস্ত্রের নীতি মালা)	নুরুর আনওয়ার, তাওযীহ-তালবীহ, মুসাল্লাম ইত্যাদি।
৭	মানতিক (তর্কশাস্ত্র)	সুগরা, কুব্রা, মীযান, মানতিক, কুদুরী, শারহে তানবীর, মোল্লা হাসান, হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি।
৮	হিকমত (প্রাকৃতিক দর্শন)	মায়বুযী, সাদ্‌রা ও শাম্‌সে বাযেগা ইত্যাদি।
৯	কালাম (ধর্মতত্ত্ব)	শরহে আকায়েদ নাসাফী, খেয়ালী, মীরযাহেদ, উসুলে আম্মাহ ইত্যাদি।
১০	ফারাইস (অংশীদারিত্ব)	সিরাজী, শারীফিয়াহ ইত্যাদি।
১১	রিয়াযী ও হায়াত (গনিত ও জ্যোতিবিদ্যা)	খুলাসাতুল হিসাব, তাহরীর-ই ওকলীদাস, তাহরীর, শারহে চুগমানি, তাসরীহ ইত্যাদি।
১২	মুনাযিরা (প্রতিযোগিতা)	রশীদিয়াহ।
১৩	তাফসীর (কোরআনের সংখ্যা)	তাফসীরে জালালাইন, বায়হাকী।
১৪	হাদীস (রাসূলের বাণী)	বুখারী শরিফ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও ইবনে মাজাহ।[১২০]

তখন কলিকাতা মাদরাসার শিক্ষার মাধ্যম ছিল মুলত আরবী ভাষা। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উর্দূ ও ফারসী ভাষা ব্যবহারেরও সুযোগ ছিল।[১২১] মাদরাসার শিক্ষার উন্নয়নকল্পে ও কলিকাতাবাসীদের

---

[১১৯] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৩; Dr. A.K.M. Ayyub Ali, *History of Tradituinal islamic Education in Bangladesh*, P. 34-35

[১২০] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৪; Dr. A.K.M. Ayyub Ali, *History of Tradituinal Islamic Education in Bangladesh*, P. 35-36.

[১২১] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৪-২৫।

দাবীর প্রেক্ষিতে আর্লে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিসেবে ১৯০৭ সারে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় টাইটেল কোর্স খোলা হয়। টাইটেল ক্লাস খোলার পর প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমে এ টাইটেল ক্লাসের মেয়াদ ছিল তিন বছর। এ তিন বছর মেয়াদী টাইটেল (কামিল) কোর্স সমাপ্তির পর পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হলে 'ফখরুল মুহাদ্দেসীন' ডিগ্রী (উপাধি) প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তখন কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেতে মোট নম্বর লাগতো শতকরা ৬৬ এবং ২য় শ্রেণী পেতে মোট নম্বর লাগতো শতকরা ৫০। [১২২] ১৮২০ সাল পর্যন্ত সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের কোন নিয়ম কানুন ছিল না। মাদরাসা কমিটি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সর্ব প্রথম ১৮২১ সালে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়।

এ নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা কেন্দ্র দেখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উচচপদস্থ অনেক অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ভীড় করতে দেখা যায়। কারণ এ ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতি স্থানীয় লোকের কাছে ছিল তখনকার দিনে অপরিচিত ও এক নতুন ঘটনা।[১২৩] ১৯২১ সালে গঠিত নওয়াব স্যার সামসুল হুদা কমিটির সুপরিশক্রমে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ১৯২৬ সালে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। মুসলমান শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পযায়ে ইংরেজি শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাদরাসা প্রাঙ্গণে এবং মাদরাসার অধ্যক্ষ মিঃ এ. এইচ. হার্লের তত্ত্বাবধানে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাকেই প্রথমে উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়।[১২৪]

অত্র মাদরাসায় ভর্তির বয়স ছিল তের থেকে পনের বছর। মক্তবে বা অন্য শিক্ষকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের মাদরাসার জুনিয়র বিভাগে হাশতুম বা অষ্টম জামায়াতে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাত বছরের পাঠ সমাপনান্তে তাদের সনদ দেয়া হতো। ১৮৭১ সালে মাদরাসার শিক্ষাকাল আট বছর করা হয়- জুনিয়র শ্রেণী চার বছর এবং সিনিয়র শ্রেণী চার বছর। ১৮৭৭ সালে জুনিয়র শ্রেণীর শিক্ষাকাল ক্রমে বাড়িয়ে সাত বছর করা হয় এবং ১৯০৪

---

[১২২] তদেব, পৃ. ২৫-২৬।

[১২৩] *তদেব*, পৃ. ২৬।

[১২৪] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬; মোঃ আব্দুস সাত্তার, *আলীয়া মাদরাসার ইতিহাস*, পৃ. ৭২-৭৩।

সাল সিনিয়র শ্রেণীর শিক্ষাকাল পাঁচ বছর করা হয়; যা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।[১২৫] ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম 'বোর্ড অব সেন্ট্রাল এগ্জামিনেশন' নামে একটি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন হয়। তৎকালীন সময়ে মাদরাসার প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শামসুল উলামা খাজা কামালুদ্দিন আহমদ সাহেব। তাকেই পদাধিকার বলে বোর্ডের সহ-সভাপতি হিসেবে সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয় হয়। ওল্ড স্কীম মাদরাসাসমূহের পরীক্ষা পরিচালনার কতিপয় নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়। এ বোর্ডের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মাদরাসা-ই-আলীয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১২৬] বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে অনেক কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়। তার মধ্যে ১৯১৪ সালে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়েছিল তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাটি 'মাদরাসা সংস্কার পরিকল্পনা' (Reformed Madrasah Scheme) নামে সুপরিচিত। উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন বৃটিশ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন। ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাঠ্য বিভাগ হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বিভাগ খোলার নিমিত্তে এ প্রদেশে মাদরাসাগুলোর পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয়তা এবং সংস্কার সাধন করেন। এ পরিকল্পনানুসারে মাদরাসা কোর্সের সংস্কার সাধন করে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে তদানীন্তন হাইস্কুল এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভূক্ত করে হাই মাদরাসা ও জুনিয়র মাদরাসা নামে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এ সব মাদরাসাগুলোই 'নিউ স্কীম মাদরাসা' (New Schem Madrasah) নামে অভিহিত হয়।[১২৭] বঙ্গদেশ কলিকাতা মাদরাসার অনুকরণে প্রচলিত মাদরাসাগুলো নতুন সংস্কারকৃত মাদরাসার সংশোধিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ না করে পূর্ববতই থেকে যায়, যাকে ওল্ড স্কীম মাদরাসা বলা হয়ে থাকে।

পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে আতাউর রহমান খান কমিশনের সুপারিশের আলোকে নিউ স্কীম মাদরাসাগুলো উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরচালিত হয়ে বর্তমান শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। তবে ওল্ড স্কীম মাদরাসাগুলোই বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে আলীয়া মাদরাসার ব্যবস্থা হিসেবে আজও এদেশে টিকে আছে। পুরাতন স্কীমের মাদরাসাগুলোর মধ্যে দুটি পাকিস্তান আমল থেকে সরকারি মাদরাসা হিসেবে চালু রয়েছে। ঢাকা মাদরাসা-ই-আলীয়া ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পরপরই কলকাতা মাদরাসার একটি অংশ ১৯৪৭ সালে

---

[১২৫] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬।

[১২৬] *তদেব*, পৃ. ২৬-২৭।

[১২৭] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬৪; এ.কে এম আজাহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৭।

স্থানান্তরিত করা হয় ঢাকা মাদরাসা-ই-আলিয়া নামধারণ করে। সিলেট আলীয়া মাদরাসা ১৯১৩ সালে স্থাপিত হয়ে সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।[১২৮]

৪.২.১১.১ পরীক্ষার পদ্ধতি

পাকিস্তান আমলের শুরুতে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল বা মাধ্যমিক স্তরে কোন পাবলিক পরীক্ষা ছিল না তখন ছিল আলিম, ফাযিল, কামিল পরীক্ষা। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে থেকে দাখিল পরীক্ষা পূর্বপাকিস্তানেও প্রবর্তন করা হয়। ফলে পাকিস্তান আমল থেকেই মাদরাসাগুলোর চারটি পরীক্ষা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা অদ্যবধি চালু আছে। মাদরাসার স্তর ও প্রতিস্তরের মেয়াদ নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	স্তরের মেয়াদ
১	ইবতেদায়ী (প্রাথমিক)	৪ বছর মেয়াদী
২	দাখিল (নিম্নমাধ্যমিক ও মধ্যমিক)	৬ বছর মেয়াদী
৩	আলিম (উচ্চমাধ্যমিক)	২ বছর মেয়াদী
৪	ফাযিল (স্নাতক)	২ বছর মেয়াদী
৫	কামিল (স্নাতকোত্তর)	২ বছর মেয়াদী[১২৯]

১৯১৫-১৬ সালে প্রবর্তিত নিউ স্কীম মাদরাসার প্রথম ছাত্ররা যখন দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তিতে দাখিল পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত তখন ঢাকা বোর্ড বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি স্থাপিত হয়নি বিধায় তদানীন্তন সরকারের সরকারি শিক্ষা বিভাগ তাদের প্রথম পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এ পরীক্ষার নাম দেওয়া হয় ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন। এ পরীক্ষায় যারা পাস করে, তাদের ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য সরকারি কলিকাতা মাদরাসায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস খোলা হয়।

এসব ক্লাসে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সুপরিশকৃত শিক্ষাসূচী অনুসৃত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ সমাপনান্তে যে পরীক্ষা নেয়া হয় প্রথমে তা নাম ছিল ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। যথা সময়ে ঢাকা বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন স্থাপিত হলে এ পরীক্ষা ও পূর্বে

---

[১২৮] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬৪-২৬৫; এ.কে এম আজাহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৫-১৩৭।

[১২৯] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬৫; এ.কে.এম. আজাহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৮।

উল্লেখিত ইসলামিক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দায়িত্ব এ বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু কিছু দিন পরেই উভয় পরীক্ষার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় যথাক্রমে 'হাই মাদরাসা পরীক্ষা' ও 'ইন্টারমিডিয়েট (সি-গ্রুপ)' পরীক্ষা।[১৩০]

৪.২.১১.২ শিক্ষা কমিশন

পাকিস্তান আমলে যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার আলোকে তৎকালীন মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের একটি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত করা হলো:

মাওলানা আকরাম খান কমিটি (১৯৪৯-১৯৫১)

১৯৪৯ সালে গঠিত মাওলানা আকরাম খান কমিটি ১৯৫১ সালে একটি রিপোট পেশ করেন। এ কমিটি মাদরাসা শিক্ষার এবতেদায়ী স্তরকে বিলুপ্ত করে অপার চারটি স্তর বহাল রাখা এবং দাখিল চার বছর মেয়াদী, আলিম চার বছর মেয়াদী, ফায়িল দুই বছর মেয়াদী এবং কামিল ২ বছর মেয়াদী করার সুপরিশ করে। এ রিপোর্টে কামিল স্তরকে ৬টি গ্রুপে বিন্যস্ত করা হয় যথা (ক) হাদীস ও তাফসীর (খ) ফিকহ ও উসুল ফিকহ (গ) আদব (আরবী সাহিত্য) (ঘ) ইসলামী দর্শন ও সুফিবাদ (ঙ) তাবলীগ (Comparative Religion) (চ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কমিটি উর্দূ ও আরবী ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষার প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করে।[১৩১] মাওলানা আকরাম খানের পূর্ববঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির আলোকেই সৈয়দ মুয়াযযামুদ্দীন হোসেন কমিটি ১৯৪৭ সাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরে তদানীন্তন সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির আলোকে মাদরাসার দু'টি (ওল্ড স্কীম ও নিউ স্কীম) ধারায় অভিজ্ঞমন্ডলীর দ্বারা মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসের উপর প্রযোজনীয় পর্যালোচনা ও চিন্তা ভাবনা করে সরকারের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য সুপারিশ পেশ করেন। এ মর্মে ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই সরকারি আদেশ বলে ১৯ সদস্যের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।[১৩২] কমিটির বিভিন্ন সুপারিশমালার উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা ছিল ঃ

---

[১৩০] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

[১৩১] Report of the East Bengal Education System Reconstruction Committee, 1949-1951; এ.কে.এম. আজাহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৮; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬৭-২৮২।

[১৩২] Dr. A.K.M. Ayyub Ali, P. *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*, 121; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৩৪।

১। বাংলা মুসলমানদের জন্য একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং মাদরাসা শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২। পুরাতন স্কীম মাদরাসার জন্য প্রচলিত 'সেন্ট্রাল মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড' বেতনভুক্ত সচিব নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতে হবে এবং অবিলম্বে 'বেঙ্গল মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড' নামে পুনর্গঠন করতে হবে।

৩। সনাতনী স্কীমভুক্ত মাদরাসার কর্মকর্তাগণের সাথে বেঙ্গল মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডের সচিবের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হবে উর্দূ ভাষা।

৪। যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা পরিদর্শনের জন্য একটি ভিন্ন পরিদর্শন কার্যালয় স্থাপন করে সেখানে ইসলামী বিষয়ে শিক্ষিত, যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিতে হবে।

৫। সনাতনী স্কীমভূক্ত মাদরাসাগুলোতে গ্রান্ট-ইন-এন্ড দেয়ার ব্যাপারে খরচের হার ও বেসরকারি দান ইত্যাদি বিষযে কোনরূপ সহযোগিতা না করেই মঞ্জুরী প্রদানের সুপারিশ করা হল।

৬। প্রতিটি মাদরাসায় (সনাতনী ও নতুন) অবৈতনিক প্রাথমিক শাখা থাকবে, যার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা ফাণ্ড থেকে অর্থায়ন করা হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে কিছু পরিমার্জন করার প্রয়োজন হবে।

৭। শিক্ষা ব্যবস্থাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম থেকে ইংরেজি শিক্ষা বিলোপ করার জোর সুপারিশ করা হয়।

৮। মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে পৃথক হবে; তা হবে ইসলাম ধর্মের আলোকে এবং মুসলমান ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে।

৯। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলামী নীতি শিক্ষাসহ পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে।

১০। সনাতনী-স্কীমের মাদরাসার ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়া উচিৎ তবে সেক্ষেত্রে নরমাল পাশ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেন কোন বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করা না হয়, তার সুপারিশ করা হয়।

১১। সনাতনী স্কীমভুক্ত মাদরাসার নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পরে বাংলা অবশ্যই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

১২। উর্দূ ভাষা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এবং সকল মাদরাসায় ৩য় শ্রেণী হতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবিষয় হিসেবে থাকবে। এ স্তরের পর থেকে উর্দূ হবে ঐচ্ছিক বিষয়।

১৩। পাঠদানের ও পরীক্ষায় উত্তর নিখনের ক্ষেত্রে আলিম স্তর পর্যন্ত বাংলা ও উর্দূ উভয় ভাষা ব্যবহার করা হবে। তবে আলিম ও ফাযিলের ক্ষেত্রে তা হবে উর্দূ বা আরবী কিন্তু কামিল শ্রেণীতে আরবী ভাষা অত্যাবশ্যকীয় হবে।

১৪। বিভিন্ন স্তরে সনাতনী স্কীম মাদরাসার পাঠদানের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	**স্তরের নাম**	**মেয়াদকাল**
১	জুনিয়র	৬ বছর মেয়াদী
২	আলিম	৪ বছর মেয়াদী
৩	ফাযিল	২ বছর মেয়াদী
৪	কামিল	২ বছর মেয়াদী

১৫। ওল্ড স্কীম মাদরাসার পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য ৪ সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। একটি জুনিয়র কোর্সের সমাপ্তিতে, অপরটি আলিম কোর্সের পর, তৃতীয়টি ফাযিল কোর্সের শেষে এবং সর্বশেষ পরীক্ষাটি হবে কামিল কোর্স সমাপনের পর।

১৬। ওল্ড স্কীমের বিভিন্ন স্তরের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	কয়টি নেওয়া যাবে	ঐচ্ছিক বিষয়ের নাম
১	জুনিয়র স্তর	একটি	ইংরেজি অথবা ফারসী
২	আলিম স্তর	দুইটি	বাংলা, ইংরেজি, আরবী, উর্দূ, ফারসী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৩	ফাযিল স্তর	একটি	বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ, ফারসী ও অর্থনীতি।

১৭. মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ভাষা ও পাঠ্যবিষয় হবে নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	**স্তরের নাম**	**ভাষা**
১	প্রাথমিক স্তর	আরবী, বাংলা ও উর্দূ

২	জুনিয়র স্তর	আরবী, বাংলা, উর্দূ, ইংরেজি ও ফারসী
৩	আলিম স্তর	আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজি, ও ফারসীর মধ্যে যেকোন দুটি ভাষা
৪	ফাযিল স্তর	আরবীসহ উর্দূ, বাংলা, ইংরেজি ও ফারসী মধ্যে যে কোন একটি ভাষা

১৮. মাদরাসার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য বিষয়

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	পাঠ্য বিষয়ের নাম
১	প্রাথমিক স্তর	আরবী, বাংলা, উর্দূ, দীনিয়াত, গণিত, ভূগোল ও গ্রামীণ বিজ্ঞান
২	জুনিয়র স্তর	আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণসহ, কুরআন, হাদিস ফিকহ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজি/ফারসী
৩	আলিম স্তর	আরবী সাহিত্য, ফারায়েয, মানতিক, মুনাযারাও উসূলে ফিকহ, বালাগাত, ইসলামের ইতিহাসসহ যে কোন দুটি বিষয় (ইংরেজি, ফারসী, বাংলা, উর্দূ ও পৌরনীতি ও তৎসহ একটি কর্মমূখী বিষয় (দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ, সাবান প্রস্তুতি)
৪	ফাযিল স্তর	আরবী সাহিত্য (ব্যাকরণ ও কম্পজিশনসহ), হাদিস, উসুলে ফিকহ, কালাম, আধুনিক দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও তাসাউস, ইংরেজি/ফারসী/বাংলা, উর্দূ /অর্থনীতি (যে কোন একটি) দর্জি বিজ্ঞান, সাবান প্রস্তুত ও কাঠের কাজের মধ্যে এটি কর্মমূখী বিষয়) আলিম ও ফাযিল কোর্সে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের মান হবে এস.এস. সি এর সমতুল্য
৫	কামিল স্তর	নিম্নোক্ত ৬টি গ্রুপ প্রযোজনীয় বিষয়াদি পড়ার সুযোগ থাকতে হবেঃ ১.হাদিস ও তাফসীর ২. ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ২. আদাব আরবী সাহিত্য (মডার্ন ও ক্লাসিক্যাল) ৩. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. ইসলামি দর্শন এবং তাবলীগ

১৯. মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে বিশেষত ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায়। আর এটি হবে ঐচ্ছিক বিষয়ের একটি। এ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে প্রতি বিভাগের একটি কেন্দ্রে।

২০. আলিম ও ফাযিল কোর্সের সাথে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবে (দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ ইত্যাদি)

২১. ওল্ড স্কীম মাদরাসা বিস্তারিত সিলেবাস সুপারিশমালার প্রস্তাব অনুসারে তৈরি হবে।

২২. বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্স-এর রূপরেখা সম্পর্কিত সুপারিশ অনুসারে, বোর্ডের সদস্য নীচের নীতিমালার আলোকে চয়ন করা হবে। 'বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্স'-এর রূপরেখা হবে নিম্নরূপঃ

১.	সভাপতি	ঃ	হাই কোর্টের একজন মুসলমান বিচারক।
২.	সহ-সভাপতি	ঃ	অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদরাসা
৩.	সেক্রেটারি	ঃ	একজন বেতনভূক্ত নিয়মিত কর্মকর্তা।
৪.	সদস্য	ঃ	আলিয়া মাদরাসা একজন সিনিয়র প্রফেসর।
৫.	সদস্য	ঃ	মাদরাসা সমূহের চীপ ইন্সপেক্টর।
৬.	সদস্য	ঃ	সংশ্লিষ্ট মাদরাসার ছয়জন প্রতিনিধি।
৭.	সদস্য	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান
৮.	সদস্য	ঃ	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ও ইসলামিক শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান
৯.	সদস্য	ঃ	তিনজন বেসরকারি সদস্য (তন্মধ্যে একজন শিয়া সদস্য)
১০.	সদস্য	ঃ	সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা।

'বোর্ড অব এগ্‌জামিনার্স'-এর কর্ম-পরিধি

১. বোর্ডের অধিকারভূক্ত কার্যাদি বোর্ডের বর্তমান কার্যাদি যেমন পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন ছাড়াও নতুন মাদরাসার স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসার স্বীকৃতি মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তার নবায়ণ ইত্যাদি সকল একটি বোর্ডের অধীনে প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে মাদরাসা বোর্ডের সচিব ও চিহ্নিত পরিদর্শক যাদের ব্যাপারে ১৯৮০ সালের 'মাদরাসা এডুকেশন কমিটি' সুপারিশ অনুসারে মাদরাসা পরিদর্শনের অধিকার দেয়া হয়।

২. বেসরকারি মাদরাসা সরকারি অনুদান দেয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থায় বা পরিচালককে দেয়া হয়েছে তা ভবিষ্যতে মাদরাসা পরিদর্শকের সুপারিশের আলোকে দেয়া হবে।

৩. প্রস্তাবিত নতুন পুনর্গঠিত বোর্ড আলিয়া মাদরাসা থেকে সরিয়ে মাদরাসা বোর্ডের জন্য পৃথক অফিস খুলতে হবে। যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারি অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে,

যেমনভাবে 'বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশনে'-এ আছে। বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পদবী ও প্রস্তাবিত স্কেল নিম্নে সুপারিশ করা হলঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পদবী	সংখ্যা	প্রস্তাবিত মাসিক বেতন
১	নিয়মিত সচিব	একজন	৪০০ টাকা
২	কেরানি	একজন	১১০ টাকা
৩	কেরানি	একজন	৪৫ টাকা
৪	নিয়মিত আর্দালি	একজন	১৩
৫	নিয়মিত পিয়ন	দুইজন	১২ টাকা

এ কমিটিতে যেহেতু শুধু শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বেও ছিলেন। তাই তিনি আগ্রহভাবে নিজেই এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। তাই যখন কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত করত প্রথানুসারে সরকারের কাছে পেশ করা হলেই অবিলম্বেই সরকার ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তা অনুমোদন করেন।

সরকার কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টের ওল্ড-স্কীম মাদরাসা সিলেবাস সংক্রান্ত যে সব সুপারিশ ১৫-২০ ক্রমিকে পেশ করেছেন, তা অনুমোদন করেছে। সিলেবাস ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই থেকে সংশ্লিষ্ট মাদরাসায় চালু করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

সরকারি ঘোষণা অনুসারেই ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই থেকেই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নতুন সিলেবাস কলকাতা আলিয়া মাদরাসাসহ অন্যান্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসাগুলোতে চালু করা হয়। কমিটি অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে যেগুলো ক্রমিক নং ৩, ৫, ১০, ১২, ১৩, ১৪-তে সুপারিশ করা হয় তা একটি পৃথক চিঠির মাধ্যমে অনুমোদনের ঘোষণা দেয়া হয়। যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেও কোন বাধা বিপত্তি পড়ার আগেই যে মালপত্র পূর্বপাকিস্তানে নিয়ে আসা যায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে ভারতের পক্ষে এস. এন. রায় এবং পাকিস্তানের পক্ষে এস. এম. খান পরস্পর দস্তখত করে মাল বুঝে নেন। মুসলিম লীগের নেতাও এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং মাদরাসার উক্ত মাল সামান্য আসবাব পত্র, রেকর্ড, নথি, বই পুস্তক, পূর্বে পাকিস্তানে আনার সিদ্ধান্ত হয়।

মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষকদের 'অপশান' দেয়া হয় যে, যাঁরা ইচ্ছা করবেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারেন, আর যাঁরা চাইবেন কলকাতায় থেকে যেতে পারবেন। তবে কারো চাকরির ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষতি করা হবে না। আর তাঁদের গচ্ছিত অথ ও ঠিকমত তাঁদের মালিকানায় থাকবে। এ

চাকরি স্বাধীনতা পাবার ফলে, কলকাতা আলিয়া মাদরাসার দু'জন জুনিয়র শিক্ষক ব্যতীত প্রায় সকল শিক্ষকই ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় এসে যোগদান করেন। কলকাতা মাদরাসার আসবাবপত্র, কিতাবাদি ও সাজ-সরঞ্জাম একত্রিক করে আনার জন্য প্যাকেটকরণসহ প্রয়োজনীয় কাজে মাদরাসার শিক্ষকরা অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। একত্রিত মালসামানার প্রথম পৃথক তালিকা প্রস্তুতকরণে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তন্মধ্যে মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ খানের নাম উল্লেখযাগ্য। তিনি লাইব্রেরির বই পুস্তকসহ তার জিনিষপত্র গছিয়ে আনতে অমানবিক পরিশ্রম করেছেন। ঢাকা আলিয়া মাদরাসার লাইব্রেরির প্রতিটি দ্রব্যের সাথে তার ছোঁয়া আজও লেগে আছে। প্রচলিত ও লালিত নিউ স্কীম মাদরাসাগুলো ক্রমান্বয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তবে অতীত দুর্ভাগ্যের বিষয় এ যে, আকরাম খান কমিশনের সুপারিশের মাত্র কিছু কিছু সুপারিশ সরকার বাস্থবায়ন করেন। সুপারিশের সংস্কার প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই বাস্থবায়িত হয়নি।[১৩৩]

আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি রির্পোট (১৯৫৬)

পূর্ব বাংলার মাদরাসা সংস্কার সাধনের লক্ষে ২৯শে নভেম্বর ১৯৫৫ সালের সিদ্ধান্তের আলোকে তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির নাম ছিল 'পূর্ববঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি'। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আশরাফুদ্দিন চৌধুরী। তার নামানুসারে এ কমিটির নাম হয় 'আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি'। মাদরাসা শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণ এবং আধুনিকায়নই ছিল এ কমিটি গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের প্রখ্যাত আলিমবর্গ ও মাদরাসা শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে মুল কমিটি ও সাবকমিটি গঠন করে ১৯৫৬ তারা চুড়ান্ত রির্পোট পেশ করেন। এ বিপোর্টে মাদরাসার শিক্ষা আধুনিকায়নের জন্য ফাযিল স্তরে সাধারণ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষার সমমানের বাংলা, ইংরেজি ও গণিত অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া এ রিপোর্টে বাংলার সাথে উর্দূ ও আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যেও জোর সুপারিশ করা হয়।[১৩৪] কিন্তু তার সুপারিশের অধিকাংশ ধারাই বাস্তবায়ন হয়নি।

---

[১৩৩] Dr. Sekander Ali Ibrahimi, *Report of the Islamic Eucation and Madrasah Education in Bengal*, P. 586-588; এ.কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৮; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৩৪-২৪৪।

[১৩৪] Asraf Uddin Chowdhury Committee, The Advisory Committee for Madrasah Education East Bengal 1956; এ কে এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৮-১৩৯; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৮৩।

আতাউর রহমান খান কমিশন (১৯৫৭)

১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে পূর্বপাকিস্তানের সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। চেয়ারম্যানের নামানুসারে এ কমিশন রিপোর্টের নাম 'আতাউর রহমান খান কমিশন রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এ কমিশনের রিপোর্ট মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত কেউ অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এ কমিশন রিপোর্ট মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ ছিল। এতে ইবতেদায়ী স্তরকে বন্ধ করে প্রাথমিক স্তরে একই শিক্ষাব্যবস্থা এবং নিউ স্কীম মাদরাসাগুলোকে সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত করার সুপারিশ করা হয়। মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে উর্দু, আরবী ও ফারসীর পরিবর্তে মাতৃভাষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'অযোগ্য ও অপ্রোয়জনীয়' ওল্ড স্কীম মাদরাসাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধের জন্য সুপারিশ করা হয়।[১৩৫]

এস. এ. শরীফ কমিশন রিপোট (১৯৫৯)

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারী নবাব এস.এম. শরীফের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনের রিপোর্টে স্তর ও মাদরাসার শিক্ষা অংশ মোট দশটি অনুচ্ছেদে এ শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস ঐতিহ্য সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয়েছে। এ রিপোর্টে মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন, গতিশীলতা ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রদিগকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।[১৩৬]

হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট (১৯৬৬)

১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বিচার প্রতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কিত একটি কমিশন গঠন করে। কমিশন ১৯৬৬ সালে ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কে রিপোটি পেশ করে। এ কমিশনের রিপোর্টে মাদরাসা শিক্ষাকে

---

[১৩৫] *The Education Reform Commission East Pakistan*, 1957; এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৯; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৮৭-২৯১।

[১৩৬] The Commission on National Education, 1959; এ. কে. এম আজাহারুল ইসলাম, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৯; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৯৩-৩০৬।

আধুনিকায়ন, বৈজ্ঞানিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সুপারিশ করা হয়।[১৩৭]

নূরখান শিক্ষানীতি (১৯৬৯)

পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খানের নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় এবং উত্তর প্রদেশের কয়েক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত স্টাডি গ্রুপ নিয়োগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে গঠিত কয়েকটি স্টাডি গ্রুপের রিপোর্টের ভিত্তিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে 'নিউ এডুকেশন পলিসি' বা নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গঠনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকলের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার (সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা) মধ্যে সমন্বয় সাধনের সাধারণ শিক্ষায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলক বিষয় এবং এর উপরের শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সিলেবাস অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করে। অপর দিকে মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করে।[১৩৮]

শামসুল হক কমিটি শিক্ষানীতি (১৯৭০)

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকার নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য আবারও একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির রিপোর্টে ২৬ মার্চ ১৯৭০ সালে চুড়ান্তভাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে। এ কমিটি প্রণীত শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

(ক) মাদরাসাগুলোকে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট অক্ষুন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবেও স্বীকৃত মানসম্পন্ন করে উন্নীত করা দরকার, যাতে কাংক্ষিত মানের সেবাদানের সক্ষম হয়।

---

[১৩৭] Report of the Commission Hamooddur Rahman Student Problem and Welfare, 1966, p. 141-144.; এ.কে. এম. আজাহারুল ইসলাম, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৯-১৪০; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ.৩১১-৩১৬।

[১৩৮] M. Nur Khan, *Commission- The Proposals for New Education*, 1969; এ.কে. এম. আজাহারুল ইসলাম, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৪০; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিমনও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩২৫-৩৩০।

(খ) পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বাস্তবমুখী পরামর্শ প্রদানের লক্ষে একটি করে কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিদ্বয় নিম্নবর্ণিত লক্ষ অর্জন নিশ্চিতকরণার্থে পরামর্শ দিবেন:

(১) মাদরাসা শিক্ষা ধারাকে সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে স্তরভিত্তিক সমতা বিধানে পন্থা চিহ্নিত করা

(২) মাদরাসা শিক্ষাধারায় শিক্ষিতদের সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষিতদের ন্যায় এমনভাবে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা; যাতে তারা জাতীয় জীবনে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

(৩) কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন যে, কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডটিকে আরো সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও সংবিধিবদ্ধ বোর্ড হিসাবে উন্নীত করা যায় এবং সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানেও একই উদ্দেশ্যে একটি অনুরূপ বোর্ড স্থাপন করা যায়।[১৩৯]

কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রির্পোট (১৯৭৪)

১৯৭২ সালে ২৫ শে জুলাই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি হন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরাত-ই-খুদা। এ কমিশনের সভাপতিসহ সাতজন পূর্ণকারী সদস্য ও ষোল জন খণ্ডকালীন সদস্য ছিলেন। কমিশন মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতিকে একদেশদশী, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এর বিলুপ্তি এবং বাধ্যতামূলকভাবে এর সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার সুপারিশ করে।[১৪০]

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬)

ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে সরকারের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ রির্পোট পেশ করে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের পূর্বেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন ঘটে। এরপর সরকার একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে ড. কুদরাত-ই-খুদার রির্পোট ও সুপারিশ এবং শিক্ষা মন্ত্রানালয়ের নির্দেশের আলোকে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রচলিত শিক্ষাক্রম শিক্ষাসূচীর উপযুক্ত পূর্ণ বিন্যাসের জন্য বলা হয়। মুলকমিটি ছাড়াও দশটি সাব কমিটি এবং ৩১টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুহাম্মদ শামস-উল-হক। দেশের মাদরাসা শিক্ষার

---

[১৩৯] Shamsul Haque Committee, *The New Education Polocy of the Government of Pakistan*, 1970;এ.কে. এম. আজাহারুল ইসলাম, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৪০-১৪১; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩৩২-৩৪১।

[১৪০] এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৪১।

কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়নের জন্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী কমিটির আওতায় একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি সদস্য বেশীর ভাগই মাদরাসা শিক্ষার সাথে জড়িত। এরা মাদরাসা সিলেবাস, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করার পর ইবতেদায়ী স্তর থেকে কামিলস্তর পর্যন্ত একটি বিশদ সিলেবাস অনুমোদন করে।[১৪১]

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (১৯৭৯) জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরষদের সুপারিশ

১৯৭৯ সালে সরকার দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে শিক্ষা একটি অন্তবর্তী কালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যাবলী সরকারকে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই এ পরিষদ গঠিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এ পরিষদের সুপারিশ ছিল নিম্নারূপ:

১. মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্দ্যেগ গ্রহণ ;

২. মাদ্রাসা শিক্ষা ইবতেদায়ী স্তরগুলোকে সার্বজনীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে, তবে উক্ত পাঠ্য তালিকায় মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি অতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ;

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ শিক্ষার্থীর তুলনায় চূড়ান্ত পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করতে দু'বছর সময় অতিরিক্ত ব্যয় হয় বলে সে দু'বছর সময় কমিয়ে এনে মোট ব্যয়িত সময়ে সমন্বয় সাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪. মাদরাসার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান;

৫. মাদরাসা শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকায়নের জন্যে অবিলম্বে বাংলাদেশ শিক্ষা সম্পসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মাদরাসা শিক্ষকগণের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা সম্পসারণ;

৬. দু'ধারা শিক্ষার মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদেরও স্কুল-কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরুপ বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান।

৭. সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তন ও আধুনিকীকরণের পর মাদরাসার দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক, আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাযিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর মর্যাদা প্রদান করা।[১৪২] উপরে উল্লেখিত কমিশনগুলোতে মাদরাসা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকায়নে স্থান পেয়েছে।

---

[১৪১] তদেব, পৃ. ১৪২।

[১৪২] তদেব, পৃ. ১৪২-১৪৩।

৪.২.১১.৩ মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সুপারিশমালার বাস্তবায়ন

বাংলাদেশে মাদরাসার ইতিহাস অতিপ্রাচীন। ভারতের বৃটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান আমলেও এ শিক্ষা চালু ছিল। আমলাভিত্তিক বিচারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান আমলের মাদরাসা শিক্ষা, বৃটিশ আমলের চেয়ে আরো একটু উন্নত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশও মাদরাসা শিক্ষা প্রচলিত আছে, তা পাকিস্তান আমলের চেয়ে গুণে মানে আরো উন্নত হয়েছে।[১৪৩]

ইবতেদায়ী স্তর

পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে ইবতেদারী স্তরটি ছিল তার কোন পাবলিক পরীক্ষা বলতে ছিল না। বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরকে ইবতেদায়ী নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে এটি প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ পাঁচটি ক্লাসে সুবিন্যাস্ত। পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ইবতেদায়ী স্তর বলতে ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে ইবতেদাযী পঞ্চম শ্রেণীকে মোট ৫টি শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে।[১৪৪]

দাখিল স্তর

দাখিল স্তর বলতে সাধারণত ৫ম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণীকে বুঝায়। তবে পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে পাবলিক পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। এটি ১৯৫০ সাল থেকে চালু হয়। দাখিল স্তর ছিল ৬ বছর মেয়াদী। বর্তমানে দাখিল স্তর বলতে ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝায়। ১৯৮৫ সাল হতে দাখিলকে এস.এস. সির সমমান করা হয়। দাখিল পাশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে ভর্তি হতে পারে। ১৯৮৫ সালের আগে দাখিলকে অষ্টম শ্রেণীর মান দেওয়া হতো। বর্তমানে এটা অনেক উন্নতি হয়েছে।[১৪৫] দাখিলে তিনটি গ্রুপ রয়েছে। (১) মানবিক (২) বিজ্ঞান (৩) মুজাব্বিদ (কারী)।

---

[১৪৩] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪০০।

[১৪৪] এ.কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*,পৃ. ১৩৮ ও ১৬২।

[১৪৫] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪১৭ ও ৫২৬; এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৬-১৩৮।

আলিম স্তর

পাকিস্তান আমালের প্রথমদিকে মাদরাসা শিক্ষার আলিম স্তরের বয়স ছিল ২ বছর মেয়াদী। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডে আলিম শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৮৭ সালের পূর্বে আলিম পাশ করলে এস.এস.সির মান পেত। ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচ. এস.সি-র সমমান সরকারিভাবে লাভ করে। এমনভাবে পর্যায়ক্রমে আলিম স্তরের মান উন্নতি হতে থাকে। আলিম পাস করে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সুযোগ পাচ্ছে আবার কেউ ফাযিল শ্রেণীতে পড়ছে।[১৪৬] আলিম শ্রেণীতে তিনটি গ্রুপ রয়েছে। (১) মানববিক (২) বিজ্ঞান (৩) মুজাব্বিদ (কারী)।

ফাযিল স্তর ও কামিল স্তর

ফাযিল স্তর বলতে স্নাতক সমমানকে বুঝায় কামিল স্তর বলতে স্নাতকোত্তর সমমানের জিগ্রীকে বুঝায়। কিন্তু ডিগ্রীর ও স্নাতকোত্তর সমমানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি এ বিষযে তাদের সুনিদিষ্ট সুপারিশ পেশ করেছেন। বিভিন্ন মহল থেকে ফাযিল ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তোর এর সমমানের জন্য জোরদাবী জানান। ২০০৬ সালে এক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ২০০৭-০৮ সেশনে ফাযিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর সমমান দেয়া হয়েছে। ফাযিল পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে ফাযিল ২ বছর মেয়াদী বর্তমানে ফাযিল ৩ বছর মেয়াদী লেখাপড়া হয়। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে কামিল ছিল ২ বছর মেয়াদী বর্তমানে ও কামিল ২ বছর মেয়াদী। ফাযিলে ১টি গ্রুপ রয়েছে। (১) মানবিক। কামিলে পাঁচটি গ্রুপ রয়েছে। (১) তাফসীর (২) হাদীস (৩) আদব (আরবী সাহিত্য) (৪) মুফতি (ফিক্হ উসুলেফিকহ্) ও (৫) মুজাব্বিদ কামিল।[১৪৭]

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

পাকিস্তান আমলে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সে সব কমিশন ও কমিটিগুলো মাদরাসা শিক্ষার তথা শিক্ষকদের উন্নয়নের জন্য অনেক মূল্যবান সুপারিশ করেন। তার মধ্যে শিক্ষণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একটি সুপারিশ ছিল। কিন্তু পুর্বের কমিশনগুলোর ন্যায় এগুলোর সুপারিশ শুধুই সুদুপদেশেই পরিণত হয়েছে। ফলে

---

[১৪৬] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪১৭ ও ৫২৬; এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৭-১৩৮ ও ১৮১।

[১৪৭] এ.কে এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১৩৭-১৩৮ ও ২২৩।

মাদরাসা শিক্ষার শুধু কিতাবী শিক্ষায় সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষা জগতের সাথে তালমিলিয়ে চলার জন্য মাদরাসা শিক্ষার জন্য যা করার ছিল তা হয়তো কিয়দংশই সম্পাদন করা হয়েছে।[১৪৮]

মাদরাসায় শিক্ষাদানের নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব। যুগ যুগ ধরে মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের কথা বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে কিন্তু সরকার কোন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তবে ইতিপূর্বে ১৯৯৫-৯৬ সালে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারের নিকটে তিন একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বহুদিনের প্রতীক্ষিত মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য অন্তত একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য এত সব আয়োজন। অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার ও আশাপ্রদ বটে, কিন্তু তা যে প্রয়োজনের তুলনায় অতীব অপ্রতুল। তবে যে টুকু হয়েছে তা সকলেরই কিছুটা হলেও আশ্বস্ত।[১৪৯] হাজারো সমস্যা ও বৈষম্যকে ঘাড়ে নিয়ে সরকারি সহায়তায় স্কুল-কলেজের সাথে হাত ধরাধরি করে মাদরাসার অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব সুরম্য দালান কোঠায় বসে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। এটিও কম আশার দিক নয়।

৪.৩ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৯১-৯২ হিসাব মতে বৃহত্তম ফরিদপুরে সরকারি-বেসরকারি প্রাইমারী, হাই স্কুল ও কলেজ প্রায় ৩০৭৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেগুলোর বিবরণ জেলাভিত্তিক সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ [১৫০]

সারণী- ৪/২২
ফরিদপুর

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারি	৫৪৫	২২০৯	১৪৯৬৫৮	১ঃ৬০
	বেসরকারি	১০৪	৩৯৯	১৮৮৯৬	১ঃ৪৭
মাধ্যমিক	সরকারি	০৫	৭৬	২৯৮৭	১ঃ৩৯
	বেসরকারি	১০৭	১৩৮১	৩১০১৮	১ঃ২৩
মহাবিদ্যালয় স্নাতক	সরকারি	০৬	১৮২	৭৯০০	১ঃ৪৩

[১৪৮] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৬৬ ও ৪১৮।

[১৪৯] তদেব, পৃ. ৪১৮।

[১৫০] ফরিদপুর জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা পরিসংখ্যান অফিস; বাংলাদেশ আদমশুমারী, ১৯৯১; ইউনিয়ন পরিসংখান, ডিসেম্বর ১৯৯৩; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান, ১৯৯১; বেনবেইস শিক্ষা মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২; মোঃ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরের ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪-১১৫।

	বেসরকারি	০৩	৭১	৩৫৮১	১:৫০
মোট	সরকারি	৫৫৬	২৪৬৭	১৬০৫৪৫	১:৬৬
	বেসরকারি	২১৪	১৮৫১	৫৩৪৯৫	১:২৯
সর্বমোট		৭৭০	৪৩১৮	২১৪০৪০	১:৫০

সারণী- ৪/২৩
রাজবাড়ী

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারি	২৬১	১০৭৮	৭৬১৪০	১:৭১
	বেসরকারি	৫৫	১৯৫	৬২৯৪	১:৩২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	০৪	৪৭	২৯৯৬	১:৬৪
	বেসরকারি	৭০	-	--	--
মহাবিদ্যালয় স্নাতক	সরকারি	০১	৩৬	১৩৩২	১:৩৭
	বেসরকারি	০৩	৯৩	৩১১৮	১:৩৪
মোট	সরকারি	২৬৬	১১৬১	৮০৪৬৮	১:৬৯
	বেসরকারি	১২৮	২৮৮	৯৪১২	১:৩৩
সর্বমোট		৩৯৪	১৫৪২	৯২৯৯৮	১:৬২

সারণী- ৪/২৪
মাদারীপুর

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারি	৪৩৬	১৭৭৯	১০৪৫২৪	১:৫৯
	বেসরকারি	৭৮	৩০৬	১৬৮৪৯	১:৫৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	০২	৪৮	১৮১৩	১:৩৮
	বেসরকারি	৮৪	১৩৩৬	২৬১১৭	১:২০
মহাবিদ্যালয়/স্নাতক	সরকারি	০২	৬৮	২৫৩১	১:৩৭
	বেসরকারি	০৪	১০৭	৪৫৭৫	১:৪৩
মোট	সরকারি	৪৪০	১৮৯৫	১০৮৮৬৮	১:৫৭
	বেসরকারি	১৬৬	১৭৫২	৪৭৫৪১	১:২৭
সর্বমোট		৬০৬	৩৭৫৪	১৬০৯৮৪	১:৪৩

সারণী- ৪/২৫

শরীয়তপুর

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারি	৩৯৫	১৩৬৮	৭৭৪৯৫	১:৫৭
	বেসরকারি	১১২	২৮৪	১২২৮৬	১:৪৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	০২	১৭	১১৫০	১:৬৮
	বেসরকারি	৪৫	৮৭৯	১৭৪৭২	১:২০
মহাবিদ্যালয়/স্নাতক	সরকারি	০২	৩৭	২৪৯৭	১:৬৭
	বেসরকারি	০৩	৬১	৩১৫১	১:৫২
মোট	সরকারি	৩৯৯	১৪২২	৮১১৪২	১:৫৭
	বেসরকারি	১৬০	১২২৪	৩২৯০৯	১:২৭
সর্বমোট		৫৫৯	২৬৪৬	১১৪০৫১	১:৪৩

সারণী- ৪/২৬

গোপালগঞ্জ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক ছাত্র অনুপাত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সরকারি	৫১৭	২০১০	১২১২০৫	১:৬০
	বেসরকারি	১০০	৪৩৬	২৫৯৬১	১:৬০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি	১৪	৬৩	২২৯৯	১:৩৬
	বেসরকারি	১০৬	১৯৫৭	৩২৪৪১	১:১৭
মহাবিদ্যালয়/স্নাতক	সরকারি	০৪	৮৫	৫০৩৫	১:৫৯
	বেসরকারি	০৫	১১৬	৫৬৯৯	১:৪৯
মোট	সরকারি	৫৩৫	২১৫৮	১২৮৫৩৯	১:৬০
	বেসরকারি	২১১	২৫০৯	৬৪১০৯	১:২৬
সর্বমোট		৭৪৬	৪৬৬৭	১৯২৬৪৮	১:৪১

৪.৩.১ নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

৪.৩.১.১ পদমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পদমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নবাব মীর মোহাম্মদ আলী[১৫১] এবং এলাকার জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় সম্ভবত ১৮৫০ সালে বা এর কিছু পূর্বে বর্তমান রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার পদমদী গ্রামের নবাব বাড়ীতে প্রথমে ইংলিশ স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে এখানে ব্রিটিশরা মীর মশারফ হোসেনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং স্কুলটিতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। বৃটিশরা স্কুলটির লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। পর্যায়ক্রমে স্কুলটিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৪৭ সালের দিকে এটি বাংলার আধুনিক শিক্ষার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। পরবর্তীকালে স্কুলটি ফ্রি প্রাইমারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন এটি তার মধ্যে অন্যতম। স্কুলটি শুরুর সময় গুটি কয়েক ছাত্র- ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর অত্র এলাকায় আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০ জন। ক্রমে ক্রমে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৪ সালে অত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছিল প্রায় ৩০০ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী আছে ৩০৫ জন। স্কুল শুরুর সময় শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল সেটা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে ১৯৪৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা ছিল তিনজন। ১৯৮৪ সালে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৬ জন। ২০০৭ সালে শিক্ষক সংখ্যা আছে ৪ জন। স্কুলটি শুরুর সময় নবাব বাড়ীর টিনের ঘরে ক্লাস শুরু হয়। পরবর্তীকালে মীর মশাররফ হোসেনের মাজার সংলগ্নে স্কুলটি স্থানান্তর করা হয়। স্কুলের জমির পরিমান ৫২ শতাংশ। ১৯৬৮ সালে স্কুলে এক তলা একটি ভবন তৈরী করা হয়। ১৯৮৪ সালে শিক্ষার বিকাশ বৃদ্ধির কারণে আরো একটি বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমানে (২০০৭) সালে একটি বিল্ডিং নির্মাণাধীন আছে।

অত্র প্রতিষ্ঠানে যারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত থেকে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ করেছেন তারা হলেন, জনাব আফসার উদ্দিন (১৯৫০-১৯৬০), শ্রী বিমল সিংহ (১৯৬০-১৯৬৭), সুবোধ চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৬৮-১৯৭২), কাজী মিজানুর রহমান (১৯৭২-১৯৭৪), নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস

---

[১৫১] নবাব মীর মোহাম্মদ আলী হযরত সাধ উল্লাহ (রহ.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি বিংশ শতব্দীর প্রথম দিকে নবাব পবিরারে পদমদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর আলী আশরাফ। তিনি সমাজ সেবক ও জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন।

(১৯৭৪-১৯৯৪)। উল্লিখিত স্কুলটি ফরিদপুর জেলার আধুনিক শিক্ষার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৫২]

৪.৩.১.২ গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর

গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯১৮ সালে নিন্দু ঠাকুর,[১৫৩] হরিন্দ্র মিত্র এবং জয়নাল আবেদীন এর প্রচেষ্টায় বর্তমান ফরিদপুর শহরে হাজী শরীয়তুল্লাহ বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিন্দু ঠাকুরের পাঠশালা নামে আখ্যায়িত ছিল। পরবর্তীতে স্কুলটি *মডেল স্কুল* নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি প্রথমে পৌরসভার অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হয়। অত্র স্কুলে প্রথমে একটি মাটির ঘরে অল্প কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। এরপর পর্যায়েক্রমে একটি টিনের ঘর তৈরী করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে তিনটি টিনের ঘর এবং একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন আছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সমৃদ্ধশালী মিনি লাইব্রেরী আছে। স্কুলটি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটি পর্যায়ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। ১৯৭৩ সালে অত্র স্কুল সরকারিকরণ করা হয়। তখন থেকে অত্র স্কুলের নামকরণ করা হয় গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্তমানে অত্র স্কুলটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাইমারী স্কুল হিসেবে পরিচিত।[১৫৪]

৪.৩.১.৩ রাজবাড়ী টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজবাড়ী

মরহুম আহমদ আলী মৃধা[১৫৫] এবং এলাকার জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় রাজবাড়ী পৌরসভার সজ্জনকান্দা মৌজায় ৪ শতাংশ জমির উপর ১৯২৮ সালে রাজবাড়ী টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি ১৯২৮ সালেই রাজবাড়ী পৌরসভার অনুদান লাভ করে। এরপর থেকে স্কুলটি পৌরসভার অধীনে পরিচালিত হয়। প্রথমে এ বিদ্যালয়ে ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন

---

[১৫২] স্কুল রেকর্ড ফাইল, পদমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী, সাক্ষাতকার জনাব কাজী মিজানুর রহমান, সহকারী শিক্ষক পদমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী।

[১৫৩] নিন্দু ঠাকুর ফরিদপুর শহরে গোয়ালচামটে আনুমানিক ১৮৫০ সালে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সরকারি চাকুরীজীবি ছিলেন। তিনি সমাজ সেবক ছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আমুমানিক ১৯৪৫/৪৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[১৫৪] স্কুল রেকর্ড ফাইল, গোয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর; সাক্ষাতকার মোঃ মোকসেদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক গোয়ালচামট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

[১৫৫] মরহুম আহমদ আলী মৃধা রাজবাড়ী শহরে আনুমানিক ১৮৭০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। একজন সাহিত্যিক ও সমাজ সেবক ছিলেন। তিনি সরকারি চাকুরী করতেন। আনুমনিক ১৯৪০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

করতো। এর মধ্যে ৬ জন ছাত্র কুরআন পাঠ, ৫ জন উর্দু এবং ২৬ জন আমপারা পড়তো। এ জন্য এ বিদ্যালয়ের নাম ছিল টাউন মক্তব। মৌলভী ইউসুফ আলী চৌধুরী বিদ্যোৎসাহী এবং গোয়ালন্দ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যালয়ের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। পরবর্তীতে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে সরকারি বিধি মোতাবেক অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যলয়ের ন্যায় উক্ত বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতে থাকে। অত্র স্কুলটি ১৯৭৩ সালে সরকারিকরণের ফলে অত্র স্কুলের নামকরণ করা হয় *রাজবাড়ী টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়*।

স্কুল প্রতিষ্ঠা শুরুর সময় মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৩৭ জন। বর্তমানে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১০০ জন। স্কুলে দুটি শাখা রয়েছে। প্রথম থেকে দ্বিতীয় অন্যটি তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় মাত্র একটি টিনের ঘর ছিল । ২০০৭ একটি তিনতলা ও দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন রয়েছে, স্কুলে একটি সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী আছে। মোট ১১ কক্ষ বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। বর্তমানে স্কুলে ট্যালেন্ট ফুলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪১ জন। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী শ্রী ষষ্ঠীচরণ সিকদার (১৯২৮-১৯৪৫), আব্দুর বর (১৯৪৬-১৯৬৯), জনাব আহমদ আলী (১৯৬০-১৯৭২), কাজী মাহবুব উল্লাহ (১৯৭২-১৯৯২)।[১৫৬]

৪.৩.১.৪ ঝিলটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর

১৯৫০ সালে মোঃ জয়নুল আবেদীন[১৫৭] এবং এলাকার জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ফরিদপুর পৌরসভার অম্বিকা হলে প্রথমে ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে স্কুলটি অবস্থিত একটি হিন্দু জমিদারের বাড়িতে যার জমির পরিমান ১২৫ শতাংশ। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মডেল স্কুল হিসাবে। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন স্কুল শুরুর সময় গোল ঘর ছিল এ জন্য অম্বিকা হলে ক্লাস শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এলাকার শিক্ষা গুরুদের প্রচেষ্টায় স্কুলটি ভালভাবে পরিচালিত হতে থাকে। অত্র স্কুল অন্যান্য প্রাইমারী স্কুলের ন্যায় ১৯৭৩ সালে সরকারিকরণ হয়। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্র সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। তবে ২০০৭ সালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫০০

---

[১৫৬] স্কুল রেকর্ড ফাইল, রাজবাড়ী টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাবাড়ী, সাক্ষাতকার-মোঃ জালালউদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রাজবাড়ী টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজবাড়ী।

[১৫৭] মোঃ জয়নুল আবেদীন ফরিদপুর শহরে ঝিলটুলিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সমাজ সেবক ছিলেন।

জন। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় নিজস্ব কোন ভবন ছিল না বলে অম্বিকা হলে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে স্কুলের দু'টি টিনের ঘর তৈরি হয়। তবে ২০০৭ সালে সেমিপাকা ৪টি টিনের ঘর রয়েছে। স্কুলে একটি সমৃদ্ধ ছোট লাইব্রেরী আছে। স্কুলটি সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মোঃ জয়নুল আবেদীন (১৯৫০-১৯৮৪)।[১৫৮]

৪.৩.১.৫ টেপাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর

১৯৩৫ সালে রাখাল দাস[১৫৯] ও এলাকার জ্ঞানী বর্গের প্রচেষ্টায় ফরিদপুর পৌরসভার ১ নং হাবিলী গোপালপুরে খতিয়ান নং ৭১, দাগ নং ৭৮৮ ও ৭৮৯, ৩০ শতাংশ জমির উপর টেপাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি প্রথমে বৈরাগী স্কুল নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এটি মডেল স্কুল নামে খ্যাতি অর্জন করে। স্কুলটি পৌরসভার অধীনে পরিচালিত হতো এবং পৌরসভা থেকে শিক্ষকদের অনুদান দেওয়া হতো। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে স্কুলটি বেশ কিছু বাঁধার সম্মুখিন হয়। এলাকার জ্ঞানী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এ সমস্ত সমস্যা দূরীভূত করে খুব সুনামের সাথে স্কুল চালাতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্কুলটি অন্যান্য প্রাইমারী স্কুলের ন্যায় ১৯৭৩ সালে সরকারিকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কত ছিল সেটা সঠিকভাবে জানা যায় না। ১৯৪৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। ১৯৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় ৩০০ জন। ২০০৭ সালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৩১ জন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে একটি টিনের ঘরে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দু'টি টিনের ঘর ছিল। ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি কারণে ১৯৮৪ সালে দুটি টিনের ঘর ও একটি একাডেমিক ভবন ছিল। ২০০৭ সালে স্কুলে তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবন রয়েছে। স্কুলে যারা কালন্তরে প্রধান শিক্ষক ছিলেন তারা হলো- রাখাল দাস (১৩৩৫-১৯৬২), শেখ মহিউদ্দিন (১৯৬২-১৯৮০), শেখ হাতেম আলী (১৯৮০-১৯৯০)।[১৬০]

৪.৩.১.৬ ভাঁটি লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর

শিক্ষানুরাগী মৌলভী আব্দুর রহমান, মোঃ আবদুস সামাদ ও এলাকার জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ফরিদপুর পৌরসভার ভাঁটি লক্ষীপুরে ৬৬ শতাংশ জমির উপর ১৯৩৫ সালে অত্র স্কুল

---

[১৫৮] স্কুল রেকর্ড ফাইল, ঝিলটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[১৫৯] রাখাল দাস

[১৬০] স্কুল রেকর্ড ফাইল, টেপাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মক্তবের মাধ্যমে স্কুলটি শুরু হয়। পরবর্তীকালে স্কুলটি মিডল স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। স্কুলটি প্রথমে পৌরসভার অধীনে পরিচালিত হতো। পৌরসভা থেকে শিক্ষকদের অনুদান প্রদান করা হতো। অন্যান্য প্রাইমারী স্কুলের ন্যায় স্কুলটি ১৯৭৩ সালে সরকারি জাতীয়করণ করা হয়। এরপর এ স্কুলের নামকরণ করা হয় ভাটি লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অত্র স্কুল শুরুর সময় ছাত্র-ছাত্রী কত ছিল সেটি সঠিকভাবে জানা যায় না। ২০০৭ সালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫০১ জন। স্কুল শুরুর সময় একটি টিনের ঘরে ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে অত্র স্কুলে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট একটি ভবন ও একটি টিনের ঘর রয়েছে। স্কুলের একটি লাইব্রেরী রয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় শিক্ষক সংখ্যা ২ জন ছিল। বর্তমানে অত্র স্কুলে শিক্ষক ৯ জন। অত্র স্কুলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ছিলেন তাদের নাম হল: মৌলভী আঃ রহমান (১৯৫০-১৯৫৩), মোঃ হাতেম আলী খান (১৯৫৩-১৯৬২), তাজ উদ্দিন আহমেদ ১৯৬২-১৯৯৮)।[১৬১]

৪.৩.১.৭ পৌর অফিস সংলগ্ন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদারীপুর

১৯৫৮ সালে অত্র এলাকার জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় পৌরসভার মাধ্যমে মাদারীপুরের কালী বাড়ীতে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির শুরুতেই পৌরসভার কমিউনিটি সেন্টারে ক্লাস শুরু হয়। প্রথমে ফ্রি প্রাইমারী-অবৈতনিক স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে জমির পরিমাণ ছিল ১৯ শতাংশ। প্রতিষ্ঠালগ্নে একটি টিনের ঘর ছিল। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ২টি টিনের ঘর, একটি একতলা বিশিষ্ট এবং একটি তিনতলা বিশিষ্ট দালান আছে। অত্র প্রতিষ্ঠান শুরুর সময় গুটি কয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৮৪ জন। অত্র প্রতিষ্ঠানে শুরু সময় শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২ জন। ১৯৮৪ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ জন। ২০০৭ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ ফজলুর রহমান (১৯৫৮-১৯৭০), কাজী মহসীন (১৯৭০-১৯৮০) এবং আব্দুল মজিদ মিয়া (১৯৮০-১৯৮৪)।[১৬২]

---

[১৬১] স্কুল রেকর্ড ফাইল, ভাটি লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[১৬২] স্কুল রেকর্ড ফাইল, পৌর অফিস সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাক্ষাতকার-দিলওয়ারা বেগম, প্রধান শিক্ষক পৌর অফিস সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদারীপুর।

৪.৩.২ নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

৪.৩.২.১ ফরিদপুর জেলা স্কুল

ফরিদপুর জেলায় স্কুল পর্যায়ে যে সমস্ত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলা স্কুল অন্যতম। ১৮৩৬ সালে স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও ১৮৪০ সালে ফরিদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে কমলাপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ফ্রানকয়েম ও লেফেবরা নামে দু'জন ইউরোপিয়ান শিক্ষাবিদ এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।[১৬৩] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এটি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের ফলাফল ও বেশ সন্তোষজনক।

ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর জিলা স্কুলে তিনতলা বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক ভবনসহ ৮টি আলাদা ইমারত, ১টি ছাত্রাবাস ও ১টি ব্যায়ামাগার রয়েছে। ৩টি বড় খেলার মাঠসহ ১টি বাস্কেটবল গ্রাউণ্ড ও ২টি বড়পুকুর রয়েছে। বিদ্যালয়ের মাঠ, পুকুর ইত্যাদিতে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তঃবিদ্যালয়, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের্‌ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[১৬৪] ফরিদপুর জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কতজন শিক্ষক ছিল এটা কোন রেকর্ড ফাইলে সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। বর্তমানে জিলা স্কুল দু'টি শাখায় বিভক্ত। প্রভাতি ও দিবা শাখা। প্রতিটি শাখায় ২৫ জন করে মোট ৫০ জন শিক্ষক রয়েছে। এছাড়া অফিস সহকারীর সংখ্যা ২ জন, এম. এল. এস. ও নৈশ প্রহরী মিলে রয়েছে ১০ জন। সূচনালগ্নে গুটি কয়েক ছাত্র নিয়ে স্কুলটির ক্লাস শুরু হয়েছিল। বর্তমানে অত্র স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৪৫০ জন।[১৬৫]

ফরিদপুর জেলা স্কুলে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে আধুনিক ও সময় উপযোগী প্রায় ১০ হাজার বই রয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানউন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত ও কৃষি শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক গবেষণাগার রয়েছে। এতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ও রাসায়নিক দ্রবাদি রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বাস্তবজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।[১৬৬] ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ে

---

[১৬৩] বার্ষিকী, ২০০১, ফরিদপুর জেলা স্কুল, ফরিদপুর, পৃ. ৭৮।

[১৬৪] তদেব, পৃ. ৭৯; স্কুল রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[১৬৫] তদেব, পৃ. ৭৯; স্কুল রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[১৬৬] বার্ষিকী, ২০০১, ফরিদপুর জেলা স্কুর, ফরিদপুর, পৃ. ৭৯।

কম্পিউটার বিষয়ের শ্রেণী কক্ষসহ একটি বড় কক্ষে কম্পিউটার ল্যাবরেটরী সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যসূচি বহির্ভূত বিভিন্ন প্রোগামের নিয়মিত চর্চা হয়।[১৬৭] ফরিদপুর জেলা স্কুলের ফলাফল বেশ সন্তোষজনক।

সারণী- ৪/২৭

ফরিদপুর জেলা স্কুলের ফলাফল[১৬৮]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৬৩	৫৩	৫২	৯৮.১১
১৯৬৪	৪৩	৪৩	১০০
১৯৬৫	৫১	৫০	৯৮.০৩
১৯৬৬	৪৯	৪৯	১০০
১৯৬৭	৪৯	৪৮	৯৭.৯৫
১৯৬৮	৩৬	৩৬	১০০
১৯৬৯	৫১	৫১	১০০
১৯৭০	৫২	৫২	১০০
১৯৭১	১১৮	১০৮	৯১.৫২
১৯৭২	৬৭	৬৫	৯৭.০১
১৯৭৩	৭৫	৭০	৯৩.৩৩
১৯৭৪	৭২	৬৩	৮৭.৫০
১৯৭৫	৩৮	২৫	৬৫.৭৮
১৯৭৬	৬১	৫৭	৯৩.৪৪
১৯৭৭	৫৬	৪৪	৭৮.৫৭
১৯৭৮	৪৭	৪৬	৯৭.৮৭
১৯৭৯	৬৭	৫২	৭৭.৬১
১৯৮০	৬৭	৫৭	৮৫.০৭
১৯৮১	৮৮	৭৮	৮৮.৬৩
১৯৮২	৮৬	৭৮	৯০.৬৯

---

[১৬৭] তদেব, পৃ. ৮০।

[১৬৮] স্কুল রেজাল্ট রেরর্ড ফাইল (১৯৬৩-১৯৮৪ ইং) ফরিদপুর জেলা স্কুল, ফরিদপুর, *বার্ষিকী*, ২০০১, ফরিদপুর জেলা স্কুল, ফরিদপুর।

১৯৮৩	৯২	৪৮	৫২.১৭
১৯৮৪	৯৯	৮৯	৮৯.৮৯
মোট	১৪১৭	১২৬১	৮৮.৯৯

উপরিউক্ত ফলাফল থেকে লক্ষণীয় যে, আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান ফরিদপুর জেলা স্কুল। অত্র স্কুলের ফলাফলে ১৯৬৩-১৯৮৪ ইং সাল পর্যন্ত অত্র স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৪১৭ জন। এর মধ্যে মোট তিন গ্রুপ থেকে পাশ করে ১২৬১ জন। আর মোট পাশের হার ৮৮.৯৯%।

সারণী- ৪/২৮

ফরিদপুর জেলা স্কুলের কালান্তরে প্রধান শিক্ষকের নাম (১৯৪৭-১৯৮৪):[১৬৯]

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১	মি. এল. ফ্রানকয়েস লেফেবরা	০১-১১-১৮৫৩	-
২	বি. এম. সেন	০১-০১-১৮৮১	১৮৮৫
৩	ঈশান চন্দ্র রায়	০১-০১-১৯০৮	১-৫-১৯১৮
৪	রা. সা. বসন্ত কুমার দাস	জুলাই ১৯১৮	-
৫	অতুল চন্দ্র ব্যানার্জী	১৫-০৮-১৯২২	১১-১১-১৯২৬
৬	নগেন্দ্র নাথ মজুমদার	১২-১১-১৯২৬	০৪-০৪-১৯২৭
৭	অমৃত লাল লস্কর	০৫-০৪-১৯২৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৪১
৮	এ. এম. আরশাদ	১১-০২-১৯৪১	জানুয়ারী ১৯৪৪
৯	এম. হামিদুর রহমান	মার্চ ১৯৪৪	মার্চ ১৯৪৬
১০	গোলাম মোস্তাফা (কবি)	মার্চ ১৯৪৬	ডিসে ম্বর১৯৪৮
১১	শুকুর মোহাম্মদ	মার্চ ১৯৪৮	ডিসেম্বর১৯৫০
১২	মুজিবুল হক	নভেম্বর ১৯৫১	মার্চ ১৯৫৩
১৩	কাজী নূরুল হক	নভেম্বর ১৯৫৩	মার্চ ১৯৫৪
১৪	মুজিবুল হক (২য় বার)	মার্চ ১৯৫৪	অক্টোবর ১৯৫৪
১৫	কাজী আম্বর আলী	নভেম্বর১৯৫৪	জুন ১৯৫৮
১৬	গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া	জুন ১৯৫৮	আগষ্ট ১৯৫৮
১৭	এম. সামসুল আলম	০৪-০৮-১৯৫৮	১৮-০৪-১৯৫৯

[১৬৯] স্কুল রিজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেকে, *বার্ষিকী* ২০০৫, ফরিদপুর জিলা স্কুল, ফরিদপুর, পৃ. ১৯।

১৮	এম. মোকসেদ আলী	১৮-০৪-১৯৫৮	১১-০৬-১৯৬০
১৯	কে. এ. বারী	০৫-১২-১৯৬০	০২-০৬-১৯৬২
২০	সিদ্দিক আহমেদ	১১-০৬-১৯৬২	৭-১০-১৯৬৪
২১	এস. জে. এ. রিজভী	১৯-১০-১৯৬৪	১৮-০১-১৯৬৫
২২	রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ	২৫-০১-১৯৬৫	১২-০২-১৯৬৭
২৩	এম. এ. গণি	২৪-০৫-১৯৬৭	১৩-০৮-১৯৬৯
২৪	সি. এ. লতিফ	১৩-০৮-১৯৬৯	০২-০৩-১৯৭২
২৫	এ. এ. এম. আনোয়ারুল হক	০২-০৩-১৯৭২	০২-০৪-১৯৭৪
২৬	মু. রবিউল আওয়াল হক	০৩-০৪-১৯৭৪	০৮-০৩-১৯৭৮
২৭	আব্দুর রশিদ মোল্যা	০৯-০৩-১৯৭৮	০৭-০৯-১৯৭৯
২৮	মু. সোবহান বখ্শ	৩০-০৮-১৯৭৯	৩১-০৮-১৯৮১
২৯	সৈয়দ আবদুল আলীম	২৪-০৯-১৯৮১	০৯-০১-১৯৮৬

৪.৩.২.২ ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়

ফরিদপুর জেলায় স্কুল পর্যায়ে যে সমস্ত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। এটি ১৮৫১ সালে ফরিদপুরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবান চন্দ্র বসু, চন্দ্র মোহন মৈত্র ও শহরের বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি বর্গের প্রচেষ্টায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরিদপুর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এটি প্রথমে মিড্ল ভার্নাকুলার স্কুল বা বাঙলা স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭০] যুগের চাহিদা পূরণের জন্য মিডল ভার্নাকুলার স্কুলটি ১৮৮৯ সালে মিডল ইংলিশ স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর রায় অক্ষয় কুমার সেন বাহাদুরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৩৪ সালে মিডল ইংলিশ স্কুলটি উচ্চ বিদ্যালয় নামে উন্নতি লাভ করে।[১৭১] ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি ২য় তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনসহ মোট ৮টি ইমারত রয়েছে। স্কুল শুরুর প্রথমে গুটি কয়েক ছাত্রছাত্রী নিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস আরম্ভ করে। তারপর ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস খোলা হয়। তার পরবর্তীকালে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৯৫০ জন। অত্র স্কুলের শুরুর থেকে শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে বর্তমানে স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে ২০ জন।[১৭২] ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও পরিচালকগণের সমবেত

[১৭০] *বার্ষিকী ২০০৪*, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফরিদপুর, পৃ. ২০।

[১৭১] *তদেব*।

[১৭২] *শতবর্ষে সরণিকা*, ১৯৯২, ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয়, পৃ. ১৪-১৫।

প্রচেষ্টায় এর অতীত ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা আছে।[১৭৩] বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ে দুটি সুসজ্জিত বিজ্ঞানগার আছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য কম্পিউটার ল্যাবের ব্যবস্থা আছে।[১৭৪] অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪৫০০ কপি।[১৭৫] ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭৩ সালে একটি মিলনায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭৬] অত্র স্কুলের ছাত্ররা খেলা ধুলায়ও পিছিয়ে নেই। ফুটবল ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল ও হকিখেলায় সুনামের সাথে ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখেছে।[১৭৭] ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বি. এন. সি. সি. শুরু হয় আশির দশকে। শুরু থেকে এ প্লাটুনটি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।[১৭৮]

অত্র স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলেন-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'জগদীশ চন্দ্র বসু, ঈশান চন্দ্র ঘোষ প্রমূখ। জাতীয় অগ্রগতির মুল চালিকা শক্তি শিক্ষা। ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুদীর্ঘ গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রেখে আগত দিনে শিক্ষা সম্প্রসারণে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

সারণী- ৪/২৯

ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ফলাফল[১৭৯]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৪৭	৮১	৫৭	৭০.৩৭
১৯৪৮	৭৩	৪৮	৬৫.৭৫
১৯৪৯	৪২	১২	২৮.৫৭
১৯৫০	৩৮	১০	২৩.৩১
১৯৫১	১৯	১০	৫৩
১৯৫২	২৪	১৬	৬৭
১৯৫৩	২৮	১৯	৬৮
১৯৫৪	৩১	১৮	৫৮
১৯৫৫	৩২	২৮	৮৮

[১৭৩] তদেব, পৃ. ১৫।

[১৭৪] তদেব।

[১৭৫] তদেব।

[১৭৬] তদেব।

[১৭৭] *বার্ষিকী*, ২০০৪, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর পৃ. ৪৯।

[১৭৮] তদেব।

[১৭৯] তদেব।

১৯৫৬	৩৪	২১	৬২
১৯৫৭	৩৬	৩৩	৯২
১৯৫৮	৩৪	২	৫৯
১৯৫৯	৬৩	৫৪	৮৬
১৯৬০	৬১	৪১	৬৭
১৯৬১	৬০	৪৮	৮০
১৯৬২	১০৫	৭৪	৭১
১৯৬৩	৮৯	৭৮	৮৮
১৯৬৪	৬০	৪৭	৭৯
১৯৬৫	৮৩	৮০	৯৬
১৯৬৬	১১০	৭১	৬৫
১৯৬৭	১২৯	৯৫	৭৪
১৯৬৮	১৩৮	১০৩	৭৫
১৯৬৯	১৬৫	৯৯	৬০
১৯৭০	১৮৫	১৩১	৭১
১৯৭১	১২৯	১১৫	৮৯
১৯৭২	১৮১	১৫৯	৮৮
১৯৭৩	১৫৩	১০৯	৭২
১৯৭৪	১১৮	৭০	৬৯
১৯৭৫	১৪৯	৪৯	৩৩
১৯৭৬	১২৭	৫৬	৪৪
১৯৭৭	১১৫	৫৫	৪৮
১৯৭৮	১৪৯	৯৩	৬৩
১৯৭৯	১৫৩	৯০	৫৯
১৯৮০	১১৮	৬৩	৫৪
১৯৮১	১৩৫	৯২	৬৮
১৯৮২	১০২	৬০	৫৯
১৯৮৩	১২৩	৬৬	৫৪
১৯৮৪	২২৫	১৩৪	৬০
মোট	৩৬৯৭	২৪৮০	৬৭

উক্ত ফলাফল থেকে লক্ষণীয় যে, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি বেসরকারি স্কুল হলেও এ স্কুলটি আধুনিক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উক্ত স্কুলে মানবিক, বিজ্ঞান, কমার্স গ্রুপে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৬৯৭ জন। এর মধ্যে পাশ করে ২৪৮০ জন এবং পাশের হার ৬৭%। উক্ত স্কুলের ফলাফল বেশ সন্তোষজনক।

স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন, বসন্ত কুমার ভক্ত, ১৯৩৪-১৯৫৯; ফজলুল করিম, ১৯৫৯-১৯৬৫; নলিনী রঞ্জন চক্রবর্তী, ১৯৬৫-১৯৭৪; জয়নুল আবেদীন, ১৯৭৪-১৯৮৪ প্রমূখ।[১৮০]

৪.৩.২.৩ সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

নারী শিক্ষার উন্নয়নকল্পে ১৯৭৬ সালের ৭ জানুয়ারী গোয়াল চামট বাসষ্ট্যাণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে তৎকালীন ফরিদপুর জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী এবং বাবু চন্দ্র কান্ত নাথ ও এলাকার জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ৪২ শতাংশ জমির উপর সারদা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৮১] অত্র স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্নে মাত্র ছোট ছোট তিনটি ভবন নিয়ে গঠিত। বর্তমানে সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে দ্বিতলা বিশিষ্ট ২টি এবং ১ তলা বিশিষ্ট ১টি ভবন এবং একটি টিনের ঘর আছে।[১৮২] অত্র স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্নে শিক্ষক সংখ্যা কতজন ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ১৭ জন।[১৮৩] অত্র স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্নে ২৯ জন ছাত্রী নিয়ে ষষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে ৯ম শ্রেণী এবং ১৯৭৮ সালে ১০ম শ্রেণী খোলা হয়।[১৮৪] ১৯৭৯ সালে অত্র স্কুলে প্রথম বোর্ড পরীক্ষায় ৭ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে এর মধ্যে ৬ জন উত্তীর্ণ হয়।[১৮৫] ১৯৮১ সালে এস. এস. সি. পরীক্ষায় অনিতা রানী সাহা গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান দখল করে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে।[১৮৬] অত্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১০০০ জন।[১৮৭] ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য একটি গ্রন্থাগার আছে। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে প্রায় ৩০০০ কপি বই আছে।[১৮৮]

ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানউন্নয়নের জন্য স্কুলের ১টি বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত ও কৃষি শিক্ষার জন্য গবেষণাগার রয়েছে। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রবাদি রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান

---

[১৮০] স্কুল রেকর্ড ফাইল, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[১৮১] রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[১৮২] তদেব।

[১৮৩] তদেব পৃ. ১১

[১৮৪] তদেব পৃ. ৯।

[১৮৫] তদেব, পৃ. ১৬।

[১৮৬] তদেব।

[১৮৭] তদেব, পৃ.১১।

[১৮৮] স্কুল রেকর্ড ফাইল, সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।[১৮৯] অত্র স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এটার দ্বারা ছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারে। বর্তমান এ স্কুলের ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যসূচির বহির্ভুত বিভিন্ন প্রোগ্রামের নিয়মিত চর্চা হয়। বর্তমান স্কুলে মোট ১০টি কম্পিউটার আছে।[১৯০] এছাড়া অত্র স্কুলে বি. এন. সি. সি.ও স্কাউট দল আছে।

সারণী- ৪/৩০

সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ফলাফল[১৯১]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৭৯	৭	৬	৮৫.৭১
১৯৮০	২২	৫	২২.৭২
১৯৮১	২৯	১১	৩৭.৯৩
১৯৮২	৪২	৬	১৪.২৮
১৯৮৩	৩৭	১৮	৪৮.৬৭
১৯৮৪	৪৭	২৩	৪৮.৯৩
মোট	১৮৪	৬৯	৩৭.৫০

উক্ত স্কুলের ১৯৭৯-১৯৮৪ ইং সাল পর্যন্ত এস. এস. সি. পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮৪ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৬৯ জন। মোট পাশের হার হচেছ ৩৭.৫০ %। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত স্কুলের ফলাফল সন্তোষজনক না হলেও ইদানিং ফলাফল ও শিক্ষার মান বেশ উন্নত হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত শাহজাদী বেগম প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

৪.৩.২.৪ রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (গোয়ালন্দ হাই স্কুল)

ফরিদপুর জেলায় স্কুল পর্যায়ের যে সকল আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। ১৮৯২ সালে বানিবহরের জমিদার বাবু গীরিজা শংকর এর প্রচেষ্টায় রাজবাড়ী সদরের সজ্জন কান্দায় রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯২] এটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্নে ১টি টিনের ঘরে ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে স্কুলের ভবন সংখ্যা হচ্ছে ৪টি।[১৯৩] প্রতিষ্ঠালগ্নে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক

---

[১৮৯] স্কুল রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[১৯০] স্কুল রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[১৯১] স্কুল রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[১৯২] *স্বরনিকা*, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ১৬-১৭।

[১৯৩] স্কুল রেকর্ড ফাইল, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, রাজবাড়ী।

তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ২৩ জন।[১৯৪] অত্র প্রতিষ্ঠানের শুরুর সময় ছাত্র সংখ্যা কত ছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি তবে ১৯৪৭ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০০ জন। ১৯৮৪ সালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫০০ জন এবং বর্তমানে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০০ জন।[১৯৫] অত্র স্কুলে একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। বর্তমানে স্কুলের বই সংখ্যা প্রায় ২৮০০ কপি। রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞানাগার আছে। এখানে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে।[১৯৬] অত্র প্রতিষ্ঠানে আশির দশক পর্যন্ত কোন কম্পিউটার কক্ষ ও ল্যাব ছিলনা। ৯০ এর দশকের দিকে অত্র স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষণের জন্য ৩ বা ৪টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়। বর্তমানে অত্র স্কুলের ছাত্রদের কম্পিউটার শিখানোর জন্য কম্পিউটার ল্যাব আছে।[১৯৭] স্কুলে দু'টি শাখা রয়েছে। প্রভাতি ও দিবা শাখা। অত্র স্কুলের ফলাফল বেশ সন্তোষজনক।

সারণী- ৪/৩১

১৯৫৬-১৯৬৭ সাল থেকে স্কুলের ফলাফল [১৯৮]

সাল	মোট পরীক্ষায়	পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৫৬	৩৭	২৬	৭০.২৭
১৯৫৭	৩৩	২৪	৭২.৭২
১৯৫৮	৩০	১৪	৪৬.৬৬
১৯৫৯	৩৯	২৫	৬৪.১০
১৯৬০	৩১	২১	৬৭.৭৪
১৯৬১	৩৩	২৫	৭৫.৭৫
১৯৬২	৪৫	৪৫	১০০
১৯৬৩	৪৮	৪৪	৯১.৬৬
১৯৬৪	৪৩	৩৩	৭৬.৭৪
১৯৬৫	৪৬	৩৩	৭১.৭৩
১৯৬৬	৫৫	৩৭	৬৭.২৭
১৯৬৭	৫০	৪৪	৮৮
মোট	৪৯০	৩৭১	৭৫.৭১

[১৯৪] *স্মরনিকা*, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ১৪।

[১৯৫] স্কুল রেকর্ড ফাইল, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, রাজবাড়ী।

[১৯৬] স্কুল রেকর্ড ফাইল, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, রাজবাড়ী।

[১৯৭] স্কুল রেকর্ড ফাইল, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, রাজবাড়ী।

[১৯৮] *বার্ষিক স্মরণিকা*, রাজবাড়ী, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী, ১৯৯০, পৃ. ১৭।

রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল। এ স্কুলে ১৯৫৬-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৯০ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ৩৭১ জন। পাশের হার হচ্ছে ৭৫.৭১%। অত্র স্কুলটি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম একটি উৎস। অত্র স্কুলে ফলাফল বেশ ভাল। এখান থেকে হাজার হাজার ছাত্র পাশ করে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করেছে।

সারণী- ৪/৩২

রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের একটি তালিকা।[১৯৯]

ক্রমিক	নাম	হতে	পর্যন্ত
১	বাবু শ্যামচরণ ভট্টাচার্য	১৮৯২	১৯০১
২	বাবু মহেন্দ্র কুমার পাল	১৯০২	১৯০৬
৩	বাবুল অখিল ভুষণ মৈত্র	১৯০৭	১৯৩২
৪	বাবু এস. এন. সেন	১৯৩৩	১৯৩৮
৫	বাবু নরেন্দ্র কুমার দাস গুপ্ত	১৯৩৯	১৯৪৭
৬	বাবু শরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য	১৯৪৭	১৯৫৩
৭	বাবু বিজয় গোবিন্দ আচার্য্য	১৯৫৩	১৯৫৪
৮	জনাব মোঃ নূরুল হক	১৯৫৪	১৯৭২
৯	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	১৯৭৩	১৯৭৬
১০	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	১৯৭৬	১৯৮০
১১	জনাব সৈয়দ আব্দুল আলিম	১৯৮০	১৯৮১
১২	জনাব মোঃ হোসেন	১৯৮২	১৯৮৪

৪.৩.২.৫ ইউনাইডেট ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর

আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর। ১৮৮৫ সালে মাদারীপুর হাই স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মাদারীপুর জেলার পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। স্কুলটি আড়িয়াল খাঁ নদীর উত্তর পাড়ে গড়ে ওঠে। এখানে মাদারীপুর শহরটি অবস্থিত ছিল। নদী ভাঙ্গনের ফলে শহরটি বিলীন হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে কলেজ রোডের পশ্চিম প্রান্তে যে স্থানে পাবলিক হেল্‌থ এর গুদাম অবস্থিত সেই জায়াগায় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়।[২০০] ১৯১৩ সালে বর্তমান নাজিম উদ্দীন কলেজের যে স্থান রয়েছে, সেখানে

---

[১৯৯] *বার্ষিক স্মরণিকা*, রাজবাড়ী, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী, ১৯৯০, পৃ. ১৭।

[২০০] আব্দুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি*, (মাদারীপুরঃ বুক সোসাইটি, ১৯৯৪), পৃ.।

ইসলামিয়া হাইস্কুল নামে আর একটি হাইস্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইসলামিয়া হাইস্কুল তার নিজস্ব জায়গায় কলেজকে ছেড়ে দিয়ে মাদারীপুর হাইস্কুলের সাথে মিলত হয়। একারণে দুটি স্কুলের মিলিত নাম *ইউনাইটেড ইসলামিয়া মাদারীপুর হাইস্কুল*। ১৯৬৮ সালে স্কুলটি জাতীয়করণ করা হয়।[২০১] *ইউনাইটেড ইসলামিয়া মাদারীপুর হাইস্কুলের* দ্বিতলা বিশিষ্ট একটি ভবন রয়েছে। ভবনটি চারদিকে পরিবেষ্টিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্র স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বর্তমানে স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ৩৯ জন এবং ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৩০০ জন।[২০২]

অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারে আধুনিক ও সময় উপযোগী প্রায় ৫ হাজার বই রয়েছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা কক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, কৃষি শিক্ষার জন্য গবেষণাগার রয়েছে। এতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।[২০৩] ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয়ের শ্রেণী কক্ষসহ একটি বড় কক্ষে কম্পিউটার ল্যাবরেটরী সম্প্রতি তৈরী করা হয়েছে। পেন্টিয়াম- IV সহ মোট ৫টি কম্পিউটার আছে।[২০৪] ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল প্রধান শিক্ষকের নাম জানা যায়নি।

সারণী- ৪/৩৩

প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড ফাইল অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকগণের তালিকা।[২০৫]

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	যোগদান	
		হতে	পর্যন্ত
১	আব্দুল হামিদ আকন্দ	৩০-৩-১৯৬৮	৩০-৩-১৯৬৯
২	মোঃ নাছির উদ্দীন	০১-০১-১৯৬৯	১৩-২-১৯৬৯
৩	মোঃ মতিউর রহমান	১৩-০২-১৯৬৯	২০-৬-১৯৬৯
৪	এম. এম. আজিজ	২০-৬-১৯৬৯	২-৫-১৯৬৯

[২০১] *সাময়িকী*, ২০০১, ইউনাইটেড সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুরঃ পৃ.১।

[২০২] স্কুল রেকর্ড ফাইল, ইউনাইটেড সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর।

[২০৩] স্কুল রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,মাদারীপুর।

[২০৪] স্কুল রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,মাদারীপুর।

[২০৫] স্কুল রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

৫	মুহাঃ সাখাওয়াতুল্লাহ সরকার	৩-৫-১৯৭২	২৬-৯-১৯৭২
৬	মুহাঃ মুহিবুল্লাহ	২৭-৯-১৯৭২	৮-৬-১৯৭৩
৭	এম. এ. হোসেন	৮-৮-১৯৭৩	২১-৩-১৯৭৪
৮	এ. এম. এম. আনোয়ারুল হক	৮-৪-১৯৭৪	১১-১১-১৯৮৩
৯	ফরহাদ হোসেন	১০-১১-১৯৮৩	৪-৮-১৯৮৪

৪.৩.২.৬ ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানটি বৃহত্তম ফরিদপুর জেলার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।[২০৬] এটি ফরিদপুর শহরের সদর হাসপাতালের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। স্কুলটি ১ একর পঞ্চাশ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত।[২০৭] অত্র স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় একটি টিনের ঘরে ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে স্কুলে ভবনের সংখ্যা হচ্ছে ৫টি।[২০৮] প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক রেকর্ড পাওয়া যায়না। অত্র স্কুলের দু'টি শাখা আছে। প্রভাতী, দিবা শাখা। স্কুলের মোট ৪৯ জন শিক্ষক আছে।[২০৯] স্কুল যখন প্রতিষ্টিত হয় তখন গুটি কয়েক ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে অত্র স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৪০০।[২১০] অত্র স্কুলে প্রায় ২০০০ বই বিশিষ্ট একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।[২১১] বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য কম্পিউটার ল্যাবরেটরী কক্ষ আছে। বর্তমানে স্কুলে ৭ বা ৮টি কম্পিউটার আছে।[২১২] স্কুলের ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য পর্যাপ্ত নয়। তবে ফলাফল সন্তোষজনক।

---

[২০৬] স্কুল রেকর্ড ফাইল, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[২০৭] *তদেব*।

[২০৮] *তদেব*।

[২০৯] *প্রয়াস*, স্কুল বার্ষিকী, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[২১০] স্কুল রেকর্ড ফাইল, ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

[২১১] *তদেব*, পৃ. ৪-৫।

[২১২] *প্রয়াস*, স্কুল বার্ষিকী, ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর, পৃ. ৪-৫।

সারণী- ৪/৩৪

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের তালিকা।[২১৩]

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		থেকে	পর্যন্ত
১	মিসেস সাহেরা বানু	১৯৪৯	১৯৪৯
২	কাজী জাহানারা খান	১৯৫০	১৯৫৩
৩	উম্মে কুলসুম গুল- এ-নূর	১৯৫৪	১৯৫৫
৪	হাসিনা খানম	১৯৫৫	১৯৫৬
৫	উম্মে আয়শা খানম চৌধুরী	১৯৫৬	১৯৫৯
৬	সিদ্দীকা খাতুন	১৯৬০	১৯৬৭
৭	জয়নাব আক্তার জলীল	১৯৬৭	১৯৬৯
৮	উষাদাস	১৯৬৯	১৯৭২
৯	রাবেয়া আহমেদ	১৯৭২	১৯৮১
১০	লায়লা চৌধুরী	১৯৮১	১৯৯১

৪.৩.৩ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনা

দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ এ স্তরের শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে বৃটিশ আমলে এর ক্রটি বিচ্যুতি দূর করার প্রয়োজনীয় তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের দেশের একটা বিরাট অংশ এ স্তরেই তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করে জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। এখান থেকেই সমাপনী ছাড়পত্র সংগ্রহ করেই উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় করে। আবার প্রাথমিক শিক্ষা শুধু উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি পর্বই নয়, জীবন সংগ্রামে প্রস্তুত হবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিশন সেভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করেন।[২১৪] এ যুগের সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ১৯৫৭ সালের শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন ও পাকিস্তান সরকারের ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান প্রধান সুপারিশগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. মাধ্যমিক কোর্সের প্রথম তিন বছর নিয়ে জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরবর্তী তিন বছর নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল অথবা পূর্ণ ছয়টি শ্রেণী নিয়ে সিনিয়র হাইস্কুল স্থাপন করতে হবে।

২. সিনিয়র ও জুনিয়র হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা যেতে পারে।

---

[২১৩] স্কুল রেকর্ড ফাইল, ফরিদপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

[২১৪] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৫৭।

৩. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদেশের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হবে। প্রতি পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যার অনুপাতে একটি সিনিয়র হাইস্কুল এবং পঁচিশ হাজার জনসংখ্যার বসতি এলাকায় একটি জুনিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. সরকারের অনুমতি/ অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন স্কুলই পরিচালিত হবেনা।

৫. সমগ্র প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুলসমূহে শিক্ষার্থীদের বেতনের হার একই থাকবে।

৬. শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করে তোলার জন্য সিনিয়র স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।[২১৫]

শিক্ষার মাধ্যম

(১) মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২) যে সকল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে, উচ্চ কারিগরি অথবা বাণিজ্য শিক্ষাক্রমে অধ্যায়ন করবে তারা ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

(১) জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রম হবে: (ক) ভাষা (খ) সমাজ পাঠ (গ) সাধারণ বিজ্ঞান (ঘ) গণিত শাস্ত্র (ঙ) ধর্ম শিক্ষা/নীতি শিক্ষা (চ) চিত্রকলা (ছ) সঙ্গীত (জ) হস্তশিল্প (ঝ) শরীর চর্চা (ঞ) স্বাস্থ্য শিক্ষা।

(২) সিনিয়র হাইস্কুল বহুমুখী শিক্ষাক্রম থাকবে। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন শাখা হবে (ক) মানবিক (খ) বিজ্ঞান (গ) কারিগরি বিষয়াদি (ঘ) বাণিজ্যিক বিয়য়াদি। (ঙ) কৃষি বিজ্ঞান (চ) চারুকলা (ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (জ) ইসলামী শিক্ষা।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ও ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করে নৈর্বাচনিকরূপে পাঠ্যক্রম থাকবে। (ক) মানবিক (খ) বিজ্ঞান (গ) বাণিজ্য (ঘ) কারিগরি (ঙ) কৃষি বিজ্ঞান (চ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (ছ) ইসলামিক শিক্ষা।

পরীক্ষা ও মুল্যায়ন

পাকিস্তান আমলে উপরোক্ত শিক্ষাক্রম অনুসারে অষ্টম শ্রেণীর শেষে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা হতো। দশম শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা দ্বিতীয় অংশ নামে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হতো।

---

[২১৫] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

পর্যালোচনা ও সমালোচনা

পাকিস্তান আমলের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণ বিচার করলে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালের শিক্ষাসূচী অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি বহুমূখী বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছিল, তাদের অধিকাংশই শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক ও নিষ্ক্রিয়।[২১৬] স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে সুপারিশের আলোকে ১৯৪৯ সালের ১৬ই মার্চ শিক্ষার সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সমন্বয়ে কমিটির গঠন করেন। এ কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের দাবী তোলেন। যেমন:

(১) পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও ৬ বছরের হতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির স্বাভাবিক বয়স ১১ বছর হতে হবে।

(২) উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত হতে হবে-৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ৯ম শ্রেণী থেকে একাদশ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত হবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।

(৩) মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে।

(৪) যে সকল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত অথবা উচ্চ কারিগরি অথবা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা অধ্যায়ন করতে ইচ্ছুক তাদের অবশ্যই ইংরেজি ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে পড়তে হবে।

(৫) ধর্মকে মুসলমান শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় হতে হবে। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় ও নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা স্বীয় ধর্মে অধ্যায়ন করতে না চায়।

(৬) শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রবর্তন করতে হবে। কিছু কিছু নিদিষ্ট বিদ্যালয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) সরকারকে উপযুক্ত স্থানে কারিগরি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে কম্প্রিহেনসিভ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৮) ফলাফল লাভের লক্ষে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একটি কার্যকরি জারিপ পরিচালনা করতে হবে।

---

[২১৬] তদেব, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

(৯) বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন স্কেল যতদুর সম্ভব সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমপরিমাণ হতে হবে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ও চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(১০) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের জন্য ১০ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) প্রতিটি মহাকুমা সদরে একজন করে 'মহকুমা শিক্ষা অফিসার' নিয়োগ দান করত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(১২) সকল মহকুমা বিদ্যালয়ের অন্তত ৫০% খরচ সরকারকে বহন করতে হবে।[২১৭]

উল্লেখিত দাবীসমূহের কিঞ্চিত বাস্তবায়িত হলেও অনেকাংশই অবাস্তবায়িত রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা (এস. এম. শরীফ) কমিশন ১৯৫৯

১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারী পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কমিশনের উদ্ভোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাগড়ে তোলার প্রতি জোর দেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন তা কৃষি, বিজ্ঞান, ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়নের সহায়তা করে। তিনি আরো বলেন, কমিশনকে দেশের সমগ্র জনশক্তি ও জাতীয় সম্পদ সর্বত্তোভাবে কাজে লাগাবার উপয় কি তার পন্থা নির্দেশ করতে হবে। এস. এম. শরীফ কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সুপারিশমালা হয়েছিল তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

(১) মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে যাতে এ স্তরে শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হয়।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম শিশু শিক্ষার্থীকে একজন নাগরিক, কর্মী এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাবে। কিন্তু যতদিন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা না হবে ততদিন ৬ষ্ঠ হতে আস্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। যথা: ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী (অন্তবর্তী), নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (উচ্চ মাধ্যমিক)। উল্লেখিত

---

[২১৭] *তদেব*, পৃ. ২৬৭-২৮০।

কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হলেও পরবর্তীতে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মুখে রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়।[২১৮]

ছাত্রসমাজ ও কল্যাণ সম্পর্কীয় কমিশন (১৯৬৬)

তীব্র ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট পূর্ণ বাস্তবায়ন না করেই তদানীন্তন সরকার বিচারপ্রতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আরো একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ছাত্র ছাত্রীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করেন। এতে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা বাংলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বই পুস্তকের সরবরাহার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ, চিকিৎসা শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, নারী শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন, ভকেশনাল শিক্ষা, হোস্টেল সমস্যাদূরীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে সুপারিশ করেন।[২১৯]

সামছুল হক কমিটি ১৯৭০

১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট তার জাতীয় বেতার ভাষণে এবং পরবর্তীতে এক কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, তার সরকার অতীতের তুলনায় অধিকহারে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করেছে; শিক্ষার সমস্যা নিরসনে, শিক্ষার্থীদের সমস্যা দুরীকরণে ও চাহিদা পূরণে সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা চালাবে। সরকার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নিবিড় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে কয়েকটি অনুধ্যান কমিটি (study grop) গঠন করেন। এ পর্যালোচনার আলোকেই দেশের নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী সরকার সংশোধিত প্রস্তাবাবলীর পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, যাতে তারা বিস্তারিতভাবে এর পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। ১৯৬৯ সালে ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের ঘোষণায় যা বলা হয় তার আলোকে সংশোধিত প্রস্তাবাবলীর পর্যালোচনা করে দেয়ার পর কেবিনেট কমিটির রিপোর্টটি পরবর্তী মন্ত্রী পরিষদ সভায় পেশ করা হয়। উক্ত রিপোর্টটি ১৯৭০ সালের ১৩ ও ২৬ তারিখের মন্ত্রী পরিষদ সভায় গৃহীত হয় এবং তা ২৬ শে মার্চ, ১৯৭০ সালে চুড়ান্তভাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

---

[২১৮] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৯২-২৯৮।

[২১৯] এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৩; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩১১-৩১৭।

উল্লেখিত শামচুল হক শিক্ষানীতীতে মাধ্যমিক শিক্ষার যে সুপারিশমালা পেশ করেছেন তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

চতুর্থ পঞ্চবাষির্কী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের (নবম ও দশম শ্রেণীর) অতিরিক্ত লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে ৪,৩৫০০০জন যাতে করে এ পর্যায়ে পাঠ্যোপযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১২,২০,০০০ জন। সে জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক পর্যায়ে মেধা ভিত্তিতে সকলের ভর্তির সুযোগ সমভাবে প্রযোজ্য হবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের জন্য খণ্ডকালীন ও পূর্ণকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রত্যেকের জন্য অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যুগের চাহিদার দিক লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে পরিমার্জন, বিজ্ঞানাগার ও শিক্ষকদের দক্ষতার বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২২০]

বাংলাদেশ শিক্ষা (কুদরাত-ই-খুদা) কমিশন রির্পোট ১৯৭৪

ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা রিপোর্টে শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং দেশকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগমুখী প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মশক্তিকে বলিয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে এ সরকার এ জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯ জন। এ কমিশনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল:

(১) দেশ প্রেম ও সুনাগরিক গঠন ক. জাতীয়তাবাদ খ. সমাজতন্ত্র গ. গনতন্ত্র ঘ. ধর্ম নিরপেক্ষতা

(২) মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব

(৩) নৈতিক মুল্যবোধ

(৪) সামাজিক রুপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা

(৫) প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা

কুদরাত-ই-খুদার মতে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো:

(১) শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে মৌলিক শিক্ষাকে সম্পসারিত ও সুসংহত করা ।

(২) সুসমন্বিত কল্যান ধমী জীবন যাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ, সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বিকাশ সাধন করা।

(৩) দেশের অর্থনেতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রযোজনীয় কর্তব্য নিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা।

---

[২২০] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩৩২-৩৩৬।

(৪) মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

এসব লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসুচিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার ব্যাপারে কমিশন জোর সুপারিশ করেছেন। মাধ্যমিক স্তরের উল্লেখিত সাধারণ উদ্দেশ্যোবলীর প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণীতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে। দশম শ্রেণীর শেষে উভয়ধারার শিক্ষার্থীরা বহি:পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা নবম-দশম শ্রেণীর বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজন মত একাদশ শ্রেণীতে এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং সার্টিফিকেট পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা লাভেরও পথ উন্মুক্ত থাকবে।[২২১]

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রির্পোটি, ১৯৭৬

জাতীয় আদর্শ সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে শিক্ষক্রম শিক্ষাসূচি সংস্কার ও শিক্ষাক্রম পরিবর্তন যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় তার গতিশীলতার জন্য অপরিহায্য। বাংলাদেশে জাতীয় আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ও তাদের রিপোর্ট শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি পুনর্বিন্যাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। এ পটভূমিতে অগ্রাধিকারভিত্তিক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রেজুলেশন নং শা-১/৫৬০ শিক্ষা তারিখ ১১-১১-১৯৭৫ এর মাধ্যমে কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাবলী ও সুপারিশের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ কমিটির সদস্য সংখ্যাছিল ৪৬ জন।[২২২]

অন্তবর্তী শিক্ষানীতি-১৯৭৯ (জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ)

পাকিস্তান আমলে আকরাম খান, আতাউর রহমান খান শরিফ কমিশন রিপোর্ট শিক্ষা-সংস্কারের লক্ষ্যে মূল্যবান সুপারিশ রাখলেও তা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হয় নি। বাংলাদেশ জন্মের পর ১৯৭৪ সালে যে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হলো; তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি না থাকার ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে ক্রমাগতভাবে শিক্ষার মান কমতে থাকে। তাই এ সব কথ চিন্তা ও বিচার বিবেচনা করে তদানীন্তন সরকার অন্তর্বর্তীকালীন খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য

---

[২২১] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪৪১-৪৫৩ ; আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৪-৮।

[২২২] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪৭১; এ.কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৮।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আবদুল বাতেনের সভাপতিত্বে 'শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদে সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। উল্লেখিত পরিষদের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি স্তর থাকবেঃ নিম্নমাধ্যমিক ৩ বছর, মাধ্যমিক-২ বছর ও উচ্চ মাধ্যমিক-২বছর এবং তিনটি স্তরেই প্রান্তিক পরীক্ষা হবে। নবম শ্রেণী থেকে সাধারণ বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, মানবিক, বৃত্তিমূলক, কারিগরী, কৃষি ও চিকিৎসা শিক্ষাকেও মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থার সংগে সংযোজিত ও সমন্বিত করা হবে। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যে কোন একটি কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকবে। নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সব প্রান্তিক পরীক্ষাই জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করবেন। উক্ত শিক্ষানীতিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্স কৃষিভিত্তিক, ব্যবসা-বাণিজ্যকভিত্তিক, ললিত কলাভিত্তিক, চিকিৎসা এবং কারিগরী শিক্ষার শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উৎকর্ষ সাধন করার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।[২২৩]

১৯৮৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয়। 'মজিদ খান কমিটি' শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনার উপর তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বেশ কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব রাখা হয়। এতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ইসলমিয়াত ব্যধ্যতামূলক করা হয়।[২২৪] পরবর্তীতে শিক্ষানীতি অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি নির্দিষ্ট কোন ফর্মে পৌঁছা সম্ভব হয়নি।

---

[২২৩] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪৯০-৫০৮; এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৯।

[২২৪] এ. কে.এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৯।

৪.৩.৪ নির্বাচিত কলেজসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

৪.৩.৪.১ সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ

অবিভক্ত বাংলায় উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ অন্যতম। অবিভক্ত বাংলার খ্যাতিমান আইনজীবি, রাজনীতিক ও শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিত্ব বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদারের[২২৫] উদ্যোগ এবং সদরপুরের বাইশরশির জমিদার রাজেন্দ্ররায় চৌধুরীর সন্তান রমেশ চন্দ্ররায় চৌধুরীর[২২৬] আর্থিক সহায়তায় ১৯১৮ সালে ফরিদপুরের ঝিলটুলীর পূর্বপ্রান্তে কমলাপুর নামক স্থানে আজকের রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৯ জন। বর্তমানে রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার এবং শিক্ষক সংখ্যা ৮৯ জন।[২২৭] কলেজটি ১৯৬৮ সালে সরকারিকরণ করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজেন্দ্র কলেজে প্রথমে আই,এ এবং আই, এস.সি খোলা হয়। ১৯২১ সালে ডিগ্রী কোর্স খোলা হয়। ১৯৫২ সালে বি.এস.সি কোর্স ও ১৯৬২-৬৩ সালে আই.কম এবং বি.কম কোর্স খোলা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাছিল ২৩২২ জন। শিক্ষক এবং অফিস মেম্বর ছিল ৪১ জন।[২২৮] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে বর্তমানে পর্যায়ক্রমে বাংলা , ইংরেজি, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান,

---

[২২৫] বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৮৫১ সালের ৬ জানুয়ারী বৃহত্তম ফরিদপুরের বর্তমান মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার সোনাদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জমিদার পরিবারের ছেলে। তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। বাবু আম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে ফরিদপুরে ১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা হয়। তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি ১৯১৮ সালে ফরিদপর রাজন্দ্রে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি হচ্ছে Indian National Evolution.

[২২৬] বাবু রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৮ সালের ৪ ডিসেম্বর বৃহত্তম ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার খণ্ড পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন রাজা বল্লবের বংশধর। তিনি ১৯০৫ সালে বিভাগীয় বৃত্তি সহ এন্টাস পাশ করেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতার রিপনল কলেজ থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে এফ. এ. পাশ করেন। ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল কলেজ থেকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশীপ পেয়ে ইতিহাস অনার্স পাশ করেন। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ লেখেন, তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Corporateive in Ancient India Early History of Bengal. দ্রঃ Nurul Islam Khan, *Bangladesh district Gazetteers*, P- 230; *পদ্মা*, রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বার্ষিকী, ২০০২-২০০৩, পৃ. ৪৬।

[২২৭] *তদেব*, পৃ. ২৩।

[২২৮] *তদেব*, পৃ. ২৩।

প্রাণিবিদ্যাসহ মোট ১৫টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হয়।[২২৯] ১৯৯৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স বাদ দেওয়ার পর বর্তমানে ফরিদপুর রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মোট ১৬ টি বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলাম শিক্ষায় প্রাইভেট মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।[২৩০] ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের দু'টি ক্যাম্পাস রয়েছে। শহর ক্যাম্পাস ও বায়তুল আমান ক্যাম্পাস। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ বলতে এক সময়ে মূলত শহর ক্যাম্পাসকেই বুঝানো হতো। কমলাপুরের পশ্চিম প্রান্তে শহর ক্যাম্পাসকে ১৯৮৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শাখার নামকরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক বাদ দেয়ার পর বর্তমান শহর ক্যাম্পাসকে ডিগ্রী শাখা ক্যাম্পাস বলা হয়। বর্তমানে শহর ক্যাম্পাসে প্রশাসনিক ভবন, ডিগ্রী পাস কোর্সের সকল কার্যক্রম ও বিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু ব্যবহারিক ক্লাস নেয়া হয়। শহর ক্যাম্পাসে ছোট বড় মিলে ২০ টি ভবন ও ঘর রয়েছে।[২৩১] বায়তুল আমান ক্যাম্পাসটি আলীয়াবাদ ইউনিয়নের বিলমামুদপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পাসটি প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। চল্লিশের দশকে স্বনির্ভর দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে ফরিদপুরের জমিদার মৌলভী মোঃ ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়ার বড় ভাই লাল মিয়া ও ছোট ভাই তারা মিয়ার সহযোগিতায় বায়তুল আমান ক্যাম্পাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩২] রাজেন্দ্র কলেজে ৪টি ছাত্রাবাস[২৩৩] ২টি ছাত্রী নিবাস, একটি শিক্ষক ডরমেটরী, শিক্ষক কোয়ার্টার ও অধ্যক্ষের বাসভবন রয়েছে।[২৩৪] এছাড়া রাজেন্দ্র কলেজে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে প্রায় ২০ হাজার আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদী রয়েছে।[২৩৫]

---

[২২৯] মোঃ আনসার উদ্দিন, *পদ্মা*, রাজেন্দ্র বার্ষিকী, ২০০২-২০০৩, পৃ. ৪৬।

[২৩০] *তদেব*।

[২৩১] *তদেব*।

[২৩২] *তদেব*, পৃ. ৪৭।

[২৩৩] চারটি ছাত্রাবাস হলো- ১. কবি নজরুল ইসলাম ছাত্রাবাস। এর সিট সংখ্যা ৪৮ টি। ২. কবি জসিম উদ্দীন ছাত্রাবাস। এর সিট সংখ্যা ৪৮টি। এ দু'টি ছাত্রাবাস বায়তুল আমান ক্যাম্পাসে অবস্থিত। ৩. হাজী শরিয়তুল্লাহ ছাত্রাবাস। এর সিট সংখ্যা ৬০ টি। ৪. অম্বিকাচরণ মজুমদার ছাত্রাবাস। এর সিট সংখ্যা ৬০টি। এ দু'টি ছাত্রাবাস শহর ক্যাম্পাসে অবস্থিত। দ্রঃ *রাজেন্দ্র কলেজ বার্ষিকী* , ২০০২-২০০৩, পৃ. ৪৯।

[২৩৪] *তদেব*, পৃ. ৪৮-৪৯।

[২৩৫] *তদেব*, পৃ. ৫০।

সারণী- ৪/৩৫

সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের তালিকা[২৩৬]

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১	জনাব কামাখ্যানাথ মিত্র	০১.০৭.১৯১৮	৩১.১২.১৯৪৩
২	জনাব অবনী মোহন চক্রবর্তী	৩১.১২.১৯৪৩	২৭.০৭.১৯৫৮
৩	জনাব শিশির কুমার আচার্য	২৮.০৭.১৯৫৮	১৬.০৪.১৯৫৯
৪	জনাব এস. এফ. ওয়াহিদ	১৬.০৪.১৯৫৯	১০.০৩.১৯৬২
৫	জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১০.০৩.১৯৬২	০১.০৭.১৯৬৫
৬	এ. কে. এম. হায়দার হোসেন	০১.০৭.১৯৬৫	৩০.০৪.১৯৬৮
সরকারিকরণের পর			
৭	প্রফেসর শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী	২৪.০৪.১৯৬৯	০৫.০৫.১৯৭০
৮	প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান	১১.০৬.১৯৭০	১৯.১২.১৯৭২
৯	প্রফেসর মোঃ মোসলে উদ্দীন	১ ৫.০৩.১৯৭৩	১৭.০৯.১৯৭৬
১০	প্রফেসর গোলাম রসুল	১৭.০৯.১৯৭৬	০৩.০১.১৯৮১
১১	প্রফেসর মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	০১.০২.১৯৮২	০১.০১.১৯৮৭

সারণী- ৪/৩৬

সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল ১৯৪৭-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত[২৩৭]

সাল	বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকার)
১৯৪৭	মানবিক	১০৬	৮৩	৭৮.৩০
	বিজ্ঞান	১০৬	৭৪	৬৯.৮০
	কমার্স	×	×	×
	মোট	২১২	১৫৭	৭৪.০৫
১৯৪৮	মানবিক	৯৩	৪০	৪৩.০১
	বিজ্ঞান	৫৭	২৬	৪৫.৬০
	কমার্স	×	-	-
	মোট	১৫০	৬৬	৪৪
১৯৪৯	মানবিক	৯৮	২২	২১.৪৪

---

২৩৬ রাজেন্দ্র কলেজের রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ; *রাজেন্দ্র কলেজ বার্ষিকী* ২০০২-২০০৩, পৃ. ৬৬।

২৩৭ রাজেন্দ্র কলেজের রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ, *পৃথ্বা বার্ষিক*, রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর, পৃ. ৬৬।

	বিজ্ঞান	৭৯	২৫	৩১.৬৪
	কমার্স	১৪	৬	৪২.৮৫
	মোট	১৯১	৫৩	২৭.৭৪
১৯৫০	মানবিক	৫৪	১৬	২৫.৩৭
	বিজ্ঞান	৩৬	২১	২৯.৭২
	কমার্স	১৪	৯	-
	মোট	১০৪	৪৬	৪৪.২৩
১৯৫১	মানবিক	৬৭	১৭	২৫.৩৭
	বিজ্ঞান	৩৭	১১	২৯.৭২
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১০৪	২৮	২৬.৯২
১৯৫২	মানবিক	৪১	২১	৫১.২৯
	বিজ্ঞান	৫৮	২৯	৫১
	কমার্স	৩	৩	১০০
	মোট	১০২	৫৩	৫১.৯৬
১৯৫৩	মানবিক	৩৩	১৯	৫৭.৫৭
	বিজ্ঞান	৮১	৪৫	৫৫.৫৫
	কমার্স	২	২	১০০
	মোট	১১৬	৬৬	৫৬.৮৯
১৯৫৪	মানবিক	৮২	৪০	৪৯.০৩
	বিজ্ঞান	২৯	১৯	৬৫.৫১
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১১১	৫৯	৫৩.১৫
১৯৫৫	মানবিক	১০২	৪১	৪০.১৯
	বিজ্ঞান	৪৭	১১	২৩.৪
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১৪৯	৮০	৩৪.৮৯
১৯৫৬	মানবিক	৯৮	৪৩	৪৩.৮৮
	বিজ্ঞান	৬৩	৩৭	৫৭.৭৩
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১৬১	৮০	৪৯.৬৮

১৯৫৭	মানবিক	৫৩	৩১	৫৮.৪৯
	বিজ্ঞান	৯১	৫১	৫৬.০৪
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১৪৪	৮২	৫৬.৯৪
১৯৫৮	মানবিক	১২২	৬৪	৫২.৪৫
	বিজ্ঞান	৭০	৩৫	৫০
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১৯২	৯৯	৫১.৫৬
১৯৫৯	মানবিক	১৭৫	৫৭	৩২.৫৭
	বিজ্ঞান	৮৫	৪৯	৫৭.৬৪
	কমার্স	-	-	-
	মোট	২৬০	১০৬	৪০.৭৬
১৯৬০	মানবিক	১৪৪	৫৩	৩৬.৮০
	বিজ্ঞান	৯২	৩৫	৫৭.৬০
	কমার্স	-	-	-
	মোট	২৩৬	৮৮	৩৭.২৮
১৯৬১	মানবিক	১৩১	৬০	৪৫.৮০
	বিজ্ঞান	১২৩	৫৩	৪৩.০৮
	কমার্স	-	-	-
	মোট	২৫৪	১১৩	৪৪.৪৮
১৯৬২	মানবিক	১৮৪	৮৮	৪৮.০
	বিজ্ঞান	১৯১	৭৬	৩৯.৭৯
	কমার্স	-	-	-
	মোট	৩৭৫	১৬৪	৪৩.৭৩
১৯৬৩	মানবিক	৯৮	৩৯	৩৯.৭৯
	বিজ্ঞান	৭৫	২৯	৩৮.৬৪
	কমার্স	-	-	-
	মোট	১৭৩	৭৮	৪৫.০৮
১৯৬৪	মানবিক	৪১	২১	৫১.২১
	বিজ্ঞান	১৪০	৬৯	৪৭.৯১
	কমার্স	৭৭	৫৬	৭২.৭২

	মোট	২৫৮	১৪৬	৫৬.৫৮
১৯৬৫	মানবিক	৬১	২৭	৪৪.২৬
	বিজ্ঞান	-	-	-
	কমার্স	৬১	২৭	৪৪.২৬
	মোট			
১৯৬৬	মানবিক	২৫৬	১০৪	৪০.৬২
	বিজ্ঞান	১৬০	১২০	৭৫
	কমার্স	১২০	৪০	৩৩.৩৩
	মোট	৫৩৬	২৬৪	৪৯.২৫
১৯৬৭	মানবিক	১৫০	৭৫	৫০
	বিজ্ঞান	২৪৮	১২৪	৫০
	কমার্স	২২২	১২৫	৫৬.৩০
	মোট	৬২০	৩২৪	৫২.২৫
১৯৬৮	মানবিক	২৫০	১৩০	৫২
	বিজ্ঞান	৩২৫	১৩৯	৪২.৭৬
	কমার্স	২০৯	১১৪	৫৪.৫৪
	মোট	৬৮৩	৩৮৩	৫৬.০৭
১৯৬৯	মানবিক	১৭৬	৭৬	৪৩.১৮
	বিজ্ঞান	৩৮১	২১৫	৫৬.৪৩
	কমার্স	১৫৩	১১৫	৭৫.১৬
	মোট	৭১০	৪০৬	৫৭.১৮
১৯৭০	মানবিক	১৮৯	১০৭	৫৬.৬১
	বিজ্ঞান	২৯৭	১২৬	৪২.৪২
	কমার্স	১৩২	৬১	৪৬.২১
	মোট	৬১৮	২৯৪	৪৭.৫৭
১৯৭১	মানবিক	১৮৫	৪৮	২৫.৯৪
	বিজ্ঞান	২৪৩	২৩৪	৯৬.২৯
	কমার্স	১০৬	৮৯	৮৩.৯৬
	মোট	৫৩৪	৩৭১	৬৯.৪৭
১৯৭২	মানবিক	১৮০	১৩০	৭২.২২
	বিজ্ঞান	২০৯	২০৪	৯৭.৬০

	কমার্স	১৬৪	৪৩	২৬.২১
	মোট	৫৫৩	৩৭৭	৬৮.১৭
১৯৭৩	মানবিক	২৫৮	৭৪	২৮.৬৮
	বিজ্ঞান	২৪৫	১০৮	৪৪.০৮
	কমার্স	৬২	১৫	২৪.১৯
	মোট	৫৬৫	১৯৭	৩৪.৮৬
১৯৭৪	মানবিক	৭৪	৩৮	৫১.৩৫
	বিজ্ঞান	২২৫	১০৯	৪৮.৪৪
	কমার্স	১০৫	৩১	২৯.৫২
	মোট	৪০৪	১৭৮	৪৪.০৫
১৯৭৫	মানবিক	১৭০	৯০	৫৩
	বিজ্ঞান	২০৯	১১১	৫৩.১১
	কমার্স	৯০	৩৮	৪২.২২
	মোট	৪৬৯	২৩৯	৫০.৯৫
১৯৭৬	মানবিক	১১৯	৬৭	৫৬.৩০
	বিজ্ঞান	১৬১	৬০	৩৭.২৬
	কমার্স	৮০	৪০	৫০
	মোট	৩৬০	৯৬৭	৪৬.৩৮
১৯৭৭	মানবিক	৯৫	৫৮	৬১.০৫
	বিজ্ঞান	১২৩	৬২	৫০.৪০
	কমার্স	৪১	২৯	৭০.৭৩
	মোট	২৫৯	১৪৯	৫৫.৩৯
১৯৭৮	মানবিক	১১০	৬৫	৫৯.০৯
	বিজ্ঞান	১৫১	১৪১	৯৩.৩৭
	কমার্স	৪৮	৩৮	৭৯.১৬
	মোট	৩০৯	২৩৪	৭৫.৭২
১৯৭৯	মানবিক	৮৮	৬২	৭০.৪৫
	বিজ্ঞান	১২২	৯৮	৮০.৩২
	কমার্স	৩৩	২৫	৭৫.৭৫
	মোট	২৪৩	১৮৫	৭৬.১৩
১৯৮০	মানবিক	১৪৭	৭৪	৫০.৩৪

	বিজ্ঞান	১৩৮	১১৮	৮৫.৫০
	কমার্স	৮১	৪৮	৫৯.২৫
	মোট	৩৬৬	২৪০	৬৫.৫৭
১৯৮১	মানবিক	১৫১	৯৯	৬৫.৫৬
	বিজ্ঞান	১৪৯	১২২	৮১.৮৭
	কমার্স	৭৬	৪৯	৬৪.৪৭
	মোট	৩৭৬	২৭০	৭১.৮০
১৯৮২	মানবিক	১৫৮	৫৮	৩৬.৭০
	বিজ্ঞান	১৩৮	৯১	৬৫.৯৪
	কমার্স	৮৬	৪৫	৫২.৩২
	মোট	৩৮২	১৯৪	৫০.৭৮
১৯৮৩	মানবিক	১৬১	৩৮	২৩.৬০
	বিজ্ঞান	২৩০	১৮৬	৮০.৮৬
	কমার্স	১২৩	২৩	১৮.৬৯
	মোট	৫১৪	২৪৭	৪৮.০৫
১৯৮৪	মানবিক	১২৯	১২৬	৯৭.৬৭
	বিজ্ঞান	২৪০	১১৬	৪৮.৩৩
	কমার্স	১৩৯	৯৯	৭১.২২
	মোট	৫০৮	৩৪১	৬৭.১২
সর্বমোট		১২৩৬২ জন	৬৬২৩ জন	৫৩.৫৭

অত্র কলেজটি বৃহত্তম ফরিদপুর জেলার প্রথম ও প্রধান কলেজ। কলেজটির লেখা পড়ার মান খুবই ভাল। অত্র কলেজে এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় ১৯৪৭-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিন গ্রুপ থেকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১২৩৬২ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৬৬২৩ জন। মোট পাশের হার ৫৩.৫৭%। অত্র কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে উচ্চ করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। অত্র কলেজটি ফরিদপুর জেলার মানুষের আধুনিক শিক্ষার প্রথম কলেজ।[২৩৮]

[২৩৮] রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর। (১৯৪৭-১৯৮৪)।

সারণী- ৪/৩৭

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের বি. এ., বি. এস. এস. এবং বি. কম. শ্রেণীর ফলাফল

সাল	বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৪৭	বি. এ	৩৬	৩০	৮৩.৩৩
১৯৪৮	বি. এ	২২	১৮	৮১.৮১
১৯৪৯	বি. এ., বি. কম	৫২	১৩	২৫
১৯৫০	বি. এ	৩০	১৩	৪৩.৩৩
১৯৫১	বি. এ. ও বি. কম	৩৮	১১	২৮.৯৪
১৯৫২	বি. এ. ও বি. কম	৩৮	৩১	৮১.৫৭
১৯৫৩	বি. এ. ও বি. কম	২৫	১৫	৬০
১৯৫৪	বি. এ	৩৬	১১	৩০.৫
১৯৫৫	বি. এ. ও বি. এস. সি	৪৫	৭	১৫.৫৫
১৯৫৬	বি. এ	৭২	৩১	৪৩.০৫
	বি. এস. সি	১৪	১০	৭১.৪৩
মোট		৮৬	৪১	৪৭.৬৭
১৯৫৭	বি. এ	৬৭	২৫	৩৭.৩১
	বি. এস. সি	১৮	১৪	৭৭.৭৮
মোট		৮৫	৩৯	৪৫.৮৮
১৯৫৮	বি. এ	৫৩	১৫	২৮.৩০
	বি. এস. সি	২৫	২৪	৯৬
মোট		৭৮	৩৯	৫০
১৯৫৯	বি. এ	৭৩	৩৩	৪৫.২
	বি. এস. সি	১৬	১০	৬২.৫
	বি. কম	৮৯	৪৩	৪৮.৩১
মোট		১৭৮	৮৬	৪৮.৩১
১৯৬০	বি. এ	৮৯	৪১	৪৬.০৬
	বি. এস. সি	১৫	১৩	৮৬.৬
	বি. কম	১০৪	৫৪	৫১.৯২
মোট		২০৮	১০৮	৫১.৯২

১৯৬১	বি. এ	৮৬	৬৩	৭৩.২
	বি. এস. সি	২৫	১৭	৬৮
মোট		১১১	৮০	৭২.০৭
১৯৬২	বি. এ	২৮	২৫	৮৯.২৮
	বি. এস. সি	২৫	১৭	৬৮
	বি. কম	৫৩	৪২	৭৯.২৪
মোট		১০৬	৮৪	৭৯.২৪
১৯৬৩	বি. এ (পুরাতান)	১৬	১০	৬২.৫
	বি. এ (নতুন সিলেবাস)	৬৩	৫৫	৮৭.৩০
	বি. এস. সি	১৮	১৫	৮৩.৩৩
মোট		৯৭	৮০	৮২.৪৭
১৯৬৪	বি. এ	৮৩	৭৭	৯২.৭৭
	বি. এস. সি	৪০	১৮	৪৫
মোট		১২৩	৯৫	৭৭.২৩
১৯৬৫	বি. এ	৯৩	৫৯	৬৩.৪৪
	বি. এস. সি	১৯	১৪	৭৩.৬৮
	বি. কম	৫	১	২০
মোট		১১৭	৭৪	৬৩.২৪
১৯৬৬	বি. এ	১০০	৯০	৯০
	বি. এস. সি	৯৩	৭০	৭৫.২৬
	বি. কম	৬৯	৩৯	৫৬.৫২
মোট		২৬২	১৯৯	৭৫.৯৫
১৯৬৭	বি. এ	১৮১	৮৭	৩১.৪৯
	বি. এস. সি	১১২	৫৩	৪৭.৩২
	বি. কম	৯১	৫৫	৬০.৪৩
মোট		৩৮৪	১৬৫	৪২.৯৬
১৯৬৮	বি. এ	২০০	৬১	৩০.৫
	বি. এস. সি	১৮৩	৮৩	৪৫.৩৫
	বি. কম	৯৮	৩৩	৩৩.৬৭
মোট		৪৮১	১৭৭	৩৬.৭৯
১৯৬৯	বি. এ	২৩৭	৯৭	৪০.৯২

	বি. এস. সি	২২৯	৮৬	৩৭.৫০
	বি. কম	১৭০	৫৪	৩১.৭৬
মোট		৬৩৬	২৩৭	৩৭.২৬
১৯৭১	বি. এ	১৩১	১১৭	৮৯.৩১
	বি. এস. সি	২২২	২১৯	৯৮.৬৪
	বি. কম	২৫৮	২৫৫	৯৮.৮৩
মোট		৫৯৩	৫৯১	৯৯.৬৬
১৯৭২	বি. এ	১৮৫	১১২	৬০.৫৪
	বি. এস. সি	১২৫	৭৫	৬০
	বি. কম	২০৩	২০০	৯৮.৫২
মোট		৫২৩	৩৮৭	৭৩.৯৯
১৯৭৩	বি. এ	১৮	১৫	৮৩.৩৩
	বি. এস. সি	১৩৯	১৮	১২.৯৪
	বি. কম	৪৮	২	৪.১৬
মোট		২০৫	৩৫	১৭.০৭
১৯৭৪	বি. এ	১৭৬	১৫	৮.৫২
	বি. এস. সি	১২৫	১০	৮
	বি. কম	৩৫	১	২.৯
মোট		৩৩৬	২৬	৭.৭৩
১৯৭৫	বি. এ	১৩৯	১৭	১২.২৩
	বি. এস. সি	১০৩	৩	২.৯১
	বি. কম	৪১	৯	২১.৯৫
মোট		২৮৩	২৯	১০.২৪
১৯৭৬	বি. এ	১২৯	২৮	২১.৭৫
	বি. এস. সি	৬৪	১২	১৮.৭৫
	বি. কম	৪০	৩	৭.৫
মোট		২৩৩	৪৩	১৮.৪৫
১৯৭৭	বি. এ	৮৭	২৫	২৮.৭৩
	বি. এস. সি	৬১	১৮	৩৬.৩৬
	বি. কম	৩৩	১২	২৯.৫০
মোট		১৮০	৫৫	৩০.৫৫

১৯৭৯	বি. এ	১৩১	৪৩	৩২.৮২
	বি. এস. সি	৬৮	৩৭	৫৪.৪১
	বি. কম	৫১	১৩	২৫.৪৯
মোট		২৫০	৯৩	৩৭.০২
১৯৮০	বি. এ	১২০	৫৩	৪৪.১৬
	বি. এস. সি	৬৩	৪৭	৭৪.৬০
	বি. কম	৩৭	১৭	৪৫.৯৫
মোট		২২০	১১৭	৫৩.১৮
১৯৮১	বি. এ	৬৮	১৭	২৫
	বি. এস. সি	৬৪	৩৩	৫১.৫৬
	বি. কম	৪১	১২	২৯.২৩
মোট		১৭৩	৬২	৩৫.৮৩
১৯৮২	বি. এ	১২১	২৫	২০.৬৬
	বি. এস. সি	৭৯	১৬	২০.২৫
	বি. কম	৫০	৪	৮
মোট		২৫০	৪৫	১৮
১৯৮৩	বি. এ	১২৭	৩৫	২৭.৫৫
	বি. এস. সি	১০৭	৩০	২৮.০৩
	বি. কম	৬০	১৫	২৫
মোট		২৯৪	৮০	২৭.২১
১৯৮৪	বি. এ	৮০	২৮	৩৫
	বি. এস. সি	১৩	৮	৬১.৫৩
	বি. কম	৫০	১৭	৩৪
মোট		১৪৩	৫৩	৩৭.০৬
সর্বমোট		৭৫৭৯ জন	৩৫০১ জন	৪৬.২৯%

১৯৪৭ সালে থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফলাফল সারণীতে লক্ষনীয় যে, অত্র কলেজের বি. এ., বি.এস.সি, বি.কম. এ তিন গ্রুপের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৫৭৯ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৩৫০১ জন। পাশের হার ছিল ৪৬.২৯%।[২৩৯]

[২৩৯] ডিগ্রী রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

৪.৩.৪.২ রামদিয়া এস. কে কলেজ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী বাবু চন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে ১৭ একর ২৬ শতাংশ জমির উপর ১৯৪২ সালে তদানিন্তন বাংলার গর্ভনর শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী রামদিয়া কলেজ স্থাপন করেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠার সময় নাম ছিল *রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ*। কিন্তু কলেজটি ১৯৮৪ সালে জাতীয়করণের সময় এর নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় *রামদিয়া এস.কে কলেজ*। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় একটি টিনের ঘর এবং একটি পাকা ভবন নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে অত্র কলেজে একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি একাডেমিক ভবন, একটি বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষকদের থাকার জন্য একটি শিক্ষক ডরমেটরী রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে অধ্যক্ষের বাস ভবন ও তিনটি পুকুর রয়েছে।

অত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল সেটি সঠিকভাবে জানা যায়না। তবে ১৯৮৪ সালে অত্র কলেজ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ জন। ২০০৭ সালে অত্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০৯ জন। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ১০/১২ জন শিক্ষক নিয়ে কলেজ শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে অত্র কলেজে শিক্ষক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ জন। ২০০৭ সালে অত্র কলেজে মোট ৩৮ টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে ২১ টি পদে শিক্ষক রয়েছে আর ১৭ টি পদ এখনও শূন্য রয়েছে। কলেজ শুরুর সময় দুটি শাখা মানবিক ও বাণিজ্য নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান শাখা খোলা হয়। অত্র কলেজে ডিগ্রী শাখায় দুটি পর্যায়ে রয়েছে কলা ও বাণিজ্য। অত্র কলেজে একটি কম্পিউটার ল্যাব, দুটি হোস্টেল এবং একটি বিজ্ঞানাগার রয়েছে। এছাড়া স্কাউট শাখা ও বি.এন.সি.সি শাখা রয়েছে। অত্র কলেজে একটি সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীতে প্রায় ১০ হাজার বই রয়েছে।[২৪০]

সারণী- ৪/৩৮

অধ্যক্ষের তালিকা[২৪১]

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	মিঃ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম.এ	১৯৪২	১৯৪৮
২।	সুধররঞ্জন দাস গুপ্ত, এম.এ. পি-এইচ.ডি	১৯৪৯	১৯৫৫

[২৪০] সাক্ষাৎকার: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, রামদিয়া এস.কে কলেজ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ; ।

[২৪১] কলেজ রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

৩।	সুশীল কুমার গুপ্ত, এম.এ	১৯৫৫	১৯৬০
৪।	উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৯৬১	১৯৭০
৫।	এ.বি.এম আখতারুল হক, এম.এ	১৯৬৬	১৯৭০
৬।	রফিকুল আলম, এম.এ	১৯৭১	১৯৭৫
৭।	আঃ জলিল মিয়া, বি.এ(সম্মান) এম.এ, পি-এইচ.ডি	১৯৭৫	১৯৭৯
৮।	শাহাবুদ্দিন আহমেদ, বি.এ (সম্মান), এম.এ	১৯৮০	১৯৮১
৯।	আব্দুল জলিল খান, বি.এ (সম্মান), এম.এ	১৯৮২	১৯৮৩
১০।	আইউবুর রহমান, এম.এ	১৯৮৩	১৯৮৪
	সরকারি করণ		
১১।	আইউবুর রহমান সিকদার (ভারপ্রাপ্ত)	০১.১১.১৯৮৪	২৭.০৬.১৯৮৬

সারণী- ৪/৩৯

উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল[২৪২]

সাল	মানবিক	বিজ্ঞান	বাণিজ্য	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৯৭৫	১৩৪	৫৮	৩৮	২৩০	৬৯	৩৩.৩৩%
১৯৭৬	১১২	৭৬	১৮	২০৬	৫৪	২৬.২১%
১৯৭৮	১৪৫	১২৮	৩৫	৩০৮	৯৮	৩১.৩১%
১৯৭৯	৮১	৬১	২৭	১৬৯	৬০	৩৫.৫০%
১৯৮০	৮১	৬১	২৭	১৬৯	৫৮	৩৪.৩১%
১৯৮১	৯৮	৫৪	৩৪	১৮৬	৯৭	৫২.১৫%
১৯৮২	৭৫	৪৫	২৬	১৪৬	৬৫	৪৪.৫২%
১৯৮৩	৬৮	৬৩	২৪	১৫৫	৪৯	৩১.৬১%
১৯৮৪	১১৯	৮৬	৬০	২৬৫	১১৯	৪৪.৯০%
মোট	৯১৩	৬৩২	২৮৯	১৮৩৪	৬৬৯	৩৬.৪৭%

উপরিউক্ত সারণী থেকে লক্ষণীয় যে, অত্র কলেজের ৯ বছরের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮৩১ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৬৬৯ জন। পাশের শতকরা হার হলো ৩৬.৪৭% ।

[২৪২] কলেজের রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

৪.৩.৪.৩ সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ

ফরিদপুর জেলার নারী সমাজের উচ্চ শিক্ষার সোপান সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ।[২৪৩] পাকিস্তানের সূচনালগ্নে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি স্থানে মহিলাদের জন্য পৃথক উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ বিভক্তির পরবর্তীকালে ফরিদপুর জেলাতেও মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। ঐ সময় ফরিদপুর জেলাতে মোট ৬টি কলেজ ছিল। এ কারণে মেয়েরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের পর সহশিক্ষার কলেজগুলোতে পড়তে বাধ্য হতো। এ কারণে রক্ষণশীল অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে নিরুৎসাহ বোধ করতেন। ষাট এর দশকের মাঝামাঝি ফরিদপুর শহরের কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এ মুহূর্তে ফরিদপুরের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার জনাব এম. কে আনোয়ার এগিয়ে এলেন। তিনি ফরিদপুর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবীদ ও সমাজ সেবকদের সাথে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনার করে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৪৪] ডেপুটি কমিশনার জনাব এম. কে আনোয়ার এর অনুরোধে ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় দানশীল ব্যক্তিত্ব শ্রী চন্দ্র কান্ত নাথ।[২৪৫] ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে অবস্থিত এক একর দশ শতাংশ জমির উপরে পাঁচটি ছোট বড় দালান ও অন্যান্য ধরনের চারটি ঘর মহিলা কলেজের জন্য দান করতে সম্মত হন। শ্রী চন্দ্র কান্ত একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে তার নিজ বাড়ীতে পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন।[২৪৬]

এরপর কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ডেপুটি কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে কলেজ পরিচালনার জন্য ৫২ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৬ আগস্ট চন্দ্রকান্ত নাথের জননী সারদা সুন্দরী দেবীর পুন্যস্মৃতি ধারণ করে ফরিদপুর জেলায় প্রথম *সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ* প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের প্রারম্ভিককালে শিক্ষক সমস্যা মেটানোর জন্য অর্থ ব্যয় না করে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা হয়। রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী বিনা বেতনে তারা ক্লাস শুরু করেন। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষা বর্ষে ২৯

---

[২৪৩] Nurul Islam, *Bangladesh District Gazetteers*, P-230.

[২৪৪] রজত ২৫ জয়ন্তী, স্বরনিকা, (১৯৬৬-১৯৯১), সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ৫ জানুয়ারী ১৯৯৭, প্রকাশনা স্মরণিকা কমিটি) পৃ. ১৩।

[২৪৫] শ্রী চন্দ্র কান্ত নাথ: শ্রী চন্দ্র কান্ত নাথ গোয়ালচামটে জন্ম গ্রহণ করেন।

[২৪৬] তদেব, পৃ. ১৩।

জন ছাত্রী নিয়ে একাদশ মানবিকের ক্লাস শুরু করেন এবং এ বছরই ঢাকা বোর্ডের স্বীকৃতি লাভ করে।[২৪৭] ফরিদপুরে মহিলা কলেজ চালু হওয়া এবং সেই কলেজ ক্যাম্পাসে হোস্টেলের ব্যবস্থায় থাকায় দূরের অনেক মেয়েরা ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উপকৃত হয়।

১৯৬৮ সালে কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে ২৬ জন ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে পাশ করে ২১ জন। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষা বছরে প্রথম বর্ষ স্নাতক কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষা বছরে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক নিয়োগ করে, ১৯৬৯-৭০ শিক্ষা বছরের মধ্যে কলেজের শিক্ষকের অভাব পূরণ করা হয়। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়।[২৪৮]

সারদা সুন্দরী কলেজের অবস্থান হচ্ছে শহরের পশ্চিমে জনবহুল এলাকায় প্রধান সড়ক তথা আন্তঃজেলা সড়কের একেবারে সন্নিকটে। রাস্তার কোলাহল ও বাস স্ট্যান্ডের দূষিত হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য কলেজটিকে ১৯৬৯ সালে গোয়ালচামট হতে-ঝিলটুলীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ঝিলটুলীতে (এ্যাড. নলীনী সেনের বাড়ি হিসেবে পরিচিত) সরকারের অর্পিত অবস্থিত সম্পত্তির একটি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়। এগার কক্ষ বিশিষ্ট একটি দোতলা দালান ও দু'কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িটি একটি দালানসহ প্রায় দুই একর পঞ্চাশ শতাংশ জমির উপর। বর্তমানে কলেজটি গোয়ালচামটের শ্রীকান্ত বাবুর প্রদানকৃত ভবনগুলো কলেজ হোস্টেলরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯৭৫-৭৬ শিক্ষা বর্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঝিলটুলীতে একটি দালান ভাড়া করে গোয়ালচামটে হতে স্থানান্তরিত করেন। গোয়ালচামটের কলেজ হোস্টেলের বাড়িগুলো একটি কনসালটিং ফার্মের নিকট ভাড়া দেয়া হয়। ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষা বর্ষে কলেজের এ বাড়িটি নব প্রতিষ্ঠিত সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য হস্তান্তর করা হয়। ঝিলটুলীস্থ বাড়িটি বর্তমান কলেজ ক্যাম্পাস।[২৪৯]

১৯৬৬-৬৭ সালে ফরিদপুর সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ মাত্র ২৯ জন ছাত্রী নিয়ে যখন যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষা বর্ষে স্নাতক কোর্স চালু করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষা বর্ষে পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত, ভূগোল বিষয়সহ উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়, ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষা বর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পূনরায় বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে কলেজে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে বিজ্ঞান, ইংরেজি মাষ্টার্স কোর্সের জন্য সমাজ কল্যাণ, ইসলামের ইতিহাস ও

---

[২৪৭] তদেব, পৃ. ১৪।

[২৪৮] তদেব, পৃ. ১৪।

[২৪৯] তদেব, পৃ. ১৪-১৫।

সংস্কৃতি বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে কলেজে ইংরেজি সম্মান কোর্স চালু হয়।[২৫০] সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে ডিগ্রী শাখায় তিনটি গ্রুপ ছিল। সেগুলো হলো- বি.এ. (পাশ), বি. এস. এস (পাশ) এবং বি. এস. সি (পাশ)। অত্র কলেজে সমাজকল্যাণ ও ইংরেজি বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু আছে।[২৫১] এ কলেজের বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা দুই হাজারের বেশী।[২৫২]

ফরিদপুর সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের যখন যাত্রা শুরু হয় তখন কোন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলনা। রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী বিনা বেতনে সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে ক্লাস নিতেন। বর্তমানে অত্র কলেজের শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৫০ জন।[২৫৩] সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে ৪ তলা বিশিষ্ট ২টি কলেজ ছাত্রী হোস্টেল আছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮টি ভবন আছে। সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের যে সকল অধ্যাপক মণ্ডলী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নাম নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ[২৫৪]

সারণী- ৪/৪০

অধ্যক্ষের তালিকা

অধ্যক্ষের নাম	কার্যকাল	
	হতে	পর্যন্ত
জনাব একে এম হায়দার আলী (মরহুম)	০৬-০৮-১৯৬৬	৩১.০১.১৯৬৮
জনাব মুশতারী বেগম	০১.০২.১৯৬৮	১৬.০৪.১৯৭৬
জনাব ফতেহ আক্তার বেগম	২৮.০৬.১৯৭৬	০৩.০৫.১৯৮০
জনাব আবুল হোসেন খান	০৩.০৫.১৯৭৬	১৬.০১.১৯৮১
সুফিয়া খাতুন (মরহুমা)	০৩.০৫.১৯৮০	০৭.০৩.১৯৮৪
অপুর্ব কুমার ঘোষ (প্রয়াস)	২০.০৩.১৯৮৪	৩১.১২.১৯৮৫

[২৫০] *তদেব*।

[২৫১] *তদেব*, পৃ. ১৪-১৫।

[২৫২] সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[২৫৩] সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

[২৫৪] *বার্ষিকী*, ২০০২-২০০৩, ফরিদপুর সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, পৃ. ১।

সারণী- ৪/৪১

সরকারি সারদা সুন্দরী কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল[২৫৫]

সাল	বিভাগ	মোটপরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকার)
১৯৭০	মানবিক	৪৭ জন	১১ জন	২৩.৪০
১৯৭১	,,	৭৭ জন	৩৩ জন	৪২.৮৫
১৯৭২	,,	৭৬ জন	৫৬ জন	
১৯৭৩	,,	৭২ জন	২৫ জন	৭৩.৬৮
১৯৭৪	মানবিক	৯৪	৫৩	৫৬.৩৮
	বিজ্ঞান	২৩	১৫	৬৫.২১
	বাণিজ্য	০৫	০৩	৬০
মোট		১২২	৭১	৫৮.১৯
১৯৭৫	মানবিক	২৫	০৮	৩২
	বিজ্ঞান	-	-	-
	বাণিজ্য	-	-	-
১৯৭৬	মানবিক	৪১	২৭	৬৫.৮৫
	বিজ্ঞান	২৫	১৮	৭২
	বাণিজ্য	০৬	০৩	৫০
মোট		৭২	৪৮	৬৬.৬৬
১৯৭৭	মানবিক	৩৭	২৭	৭২.৯৭
	বিজ্ঞান	০৮	০৪	৫০
	বাণিজ্য	০৫	০৩	৬০
মোট		৫০	৩৪	৬৮
১৯৭৮	মানবিক	৭৮	২৭	৭৮.২০
	বিজ্ঞান	০৮	০৪	৫০
	বাণিজ্য	০৫	০৩	১০০
মোট		৫০	৩৪	
১৯৭৯	মানবিক	৭৫	৫৩	৭০.৬৬
	বিজ্ঞান	২১	১৬	৭৬.১৯

[২৫৫] রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর।

	বাণিজ্য	০৩	০১	৩৩.৩৩
মোট		৯৯	৭০	৭০
১৯৮০	মানবিক	১১০	৪৭	৪২.৯২
	বিজ্ঞান	৩০	১৭	৫৬.৬৬
	বাণিজ্য	০৭	০১	১৪.২৮
মোট		১৪৭	৬৫	
১৯৮১	মানবিক	১১৭	৫৬	৪৭.৮৬
	বিজ্ঞান	৩৫	২০	৫৭.১৪
	বাণিজ্য	০৪	০৩	৭৫
মোট		১৫৬	৭৯	৫০.৬৪
১৯৮২	মানবিক	৭২	৫৮	৮০.৫৫
	বিজ্ঞান	৩৫	২২	৬৬.৬৬
	বাণিজ্য	০৪	০৩	৩৭.৫০
মোট		১৫৬	৮৩	৭৩.৪৫
১৯৮৩	মানবিক	১৩১	৬০	৪৫.৮০
	বিজ্ঞান	৩৮	৩১	৮১.৫৭
	বাণিজ্য	০৮	০৩	৩৭.৫০
মোট		১৭৭	৯৪	৫৩.১০
১৯৮৪	মানবিক	১৭৬	১১৩	৬৪.২০
	বিজ্ঞান	৬৫	৪৯	৭৫.৩৮
	বাণিজ্য	০৬	০২	৩৩.৩৩
মোট		২৪৭	১৬৪	৬৬.৩৯
সর্বমোট		১৫৯০	৯১৯	৫৭.৭৯

অত্র কলেজের ফলাফল থেকে লক্ষণীয় যে, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে এইচ. এস. সি- মানবিক, বিজ্ঞান, কমার্স মোট তিন গ্রুপের ১৯৭০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার্থী ছিল ১৫৯০ জন। এর মধ্যে পাশ করে ৯১৯ জন এবং পাশের গড় ছিল ৫৭.৭৯%।

সারণী- ৪/৪২

সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার বছরওয়ারী ফলাফল: ১৯৭১-১৯৮৪[২৫৬]

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৭১	১১	০৯	৮১.৮১
১৯৭২	১১	১০	৯০.৯০
১৯৭৩	৫২	০৮	১৫.৩৮
১৯৭৪	৩৫	০৪	১১.৪২
১৯৭৫	১৭	০৬	৩৫.২৯
১৯৭৬	২৭	০৬	২৯.৬২
১৯৭৭	২৫	০৭	২৮
১৯৭৮	২৩	০৮	৩৭.৭৮
১৯৭৯	৪২	২৩	৫৪.৭৬
১৯৮০	৪১	২০	৪৮.৭৮
১৯৮১	৯৫	২৭	২৮.৪২
১৯৮২	৫৩	৩৫	৬৬.০৩
১৯৮৩	৪১	২৩	৫৬.০৯
১৯৮৪	৩৫	১১	৩১.৪২
মোট	৮০৮	১৯৯	২৪.৬২

সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে ১৯৭১-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অত্র কলেজের বি. এ. পাস কোর্সে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮০৮ জন। এর মধ্যে পাশ করে ১৯৯ জন এবং পাশের হার ছিল ২৪.৬২%।

সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে প্রায় ২৫ হাজার বইপত্র, মাসিক পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ বিভিন্ন বিষয়ের একাডেমীক এবং বই বাছাইয়ের জন্য বিভিন্ন ক্যাটালগার আছে।[২৫৭]

---

[২৫৬] তদেব।

[২৫৭] *বার্ষিকী*, ২০০১-২০০২, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, পৃ. ৬০।

৪.৩.৪.৪ সরকারি ইয়াছিন কলেজ

১৯৬৮ সালের ১মে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ সরকারিকরণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফরিদপুর শহরে একটি বেসরকারি কলেজের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে বার এসোসিয়েশন হলে সুধী শিক্ষানুরাগীদের এক বৈঠকে একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয় সর্বপ্রথম আলোচিত হয় এবং তা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের গোচরীভুত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫ জুন জেলা প্রশাসকের কনফারেন্স রুমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার জনাব এ. সামাদ (সি. এস. পি.)। উচ্চ পদস্থ অফিসারগণসহ এতে ৩৩ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তী বছর থেকে কলেজে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত হয়।[২৫৮]

প্রস্তাবিত কলেজের জন্য স্থান নির্বাচনসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়টি নির্ধারণের জন্য জেলা প্রশাসক জনাব এ. সামাদকে অনুরোধ করে একটি প্রস্থাব গৃহীত হয় এবং তাকে সভাপতি এবং সদর মহকুমার প্রশাসক জনাব জয়নুল আবেদনীকে সেক্রেটারী করে একটি অন্তবর্তীকালীন পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়া উপস্থিত সকলেই অন্তবর্তীকালীন এ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

বিলুপ্ত ইয়াছিন মুসলিম হাইস্কুলের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে মরহুম ইয়াছিন জমাদার সাহেবের সুযোগ্যপুত্রগণ কলেজ করার প্রস্তাবে এগিয়ে আসেন। ১৯৬৮ সালের ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকালীন পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভায় তাদের এ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়ে *ইয়াছিন কলেজ* নামে সেখানেই প্রস্তাবিত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৫৯] সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজেন্দ্র কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক জনাব এ. এইচ. এম. মহিউদ্দিন কে অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয় এবং কিছু প্রভাষক ও অফিস স্টাফ একই সাথে নিয়োগ দেয়া হয়। ৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ইয়াছিন কলেজের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দু'হাজার।[২৬০] স্থানীয় চাকরীজীবি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য ১৯৭০ সালে ইয়াছিন কলেজে নৈশ্য বিভাগ

---

[২৫৮] Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteer, Faridpur*, P. 229; *ইয়াছিন কলেজ বার্ষিকী*, ১৯৭২-১৯৭৩, পৃ. ৪৯।

[২৫৯] ইয়াছিন জমাদার ১৮৭০ সালে টেপাখোলা, ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়ী ও জমাদার ছিলেন। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য টেপাখোলায় জমিদান করেন। এখানে প্রথমে ইয়াছিন হাই স্কুল পরে ৭০ এর দশকে ইয়াছিন কলেজে রূপান্তরিত করেন। বর্তমানে এটি ফরিদপুর জেলার সরকারি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। দ্রঃ ইয়াছিন জমাদার বার্ষিকী ১৯৭২-১৯৭৩, ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর, পৃ. ৪৯।

[২৬০] *তদেব*, পৃ. ৫১।

সারণী- ৪/৪৩

সরকারি ইয়াছিন কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল[২৬৫]

সাল	বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাশ	পাশের হার (শতকার)
১৯৭০	কলা	১৩৬	৭৫	৫৫.১৪
	বিজ্ঞান	৫১	১৯	৩৪.২৫
	বাণিজ্য	৪০	১৭	৪২.৫
মোট		২২৭	১১১	৪৮.৮৯
১৯৭১	কলা	২৯৮	২২২	৭৪.৫
	বিজ্ঞান	৭২	৫৬	৭৭.৭৭
	বাণিজ্য	৩৪	২৮	৮২.৩৫
মোট		৪০৪	৩০৬	৭৫.৭৪
১৯৭৩	কলা	২১৭	২১	৯.৬৭
	বিজ্ঞান	৬৭	৯	১৩.৮৩
	বাণিজ্য	২১	-	-
মোট		৩০৫	২০	৯.৮৩
১৯৭৪	কলা	২৮৩	৬৫	২২.৯৬
	বিজ্ঞান	৯৮	২৪	২৪.৪৮
	বাণিজ্য	২১	৯	৪২.৮৫
মোট		৪০২	৯৮	২৪.৩৭
১৯৭৫	কলা	৯৫	৩৬	৩৭.৮৯
	বিজ্ঞান	৮২	৩২	.৯.০২
	বাণিজ্য	১২	৮	৬৬.৬৬
মোট		১৮৯	৭৬	৪০.২১
১৯৭৬	কলা	৭৮	২৪	৩০.৭৬
	বিজ্ঞান	১৪৩	৩০	২০.৯৭
	বাণিজ্য	৯	৫	৫৫.৫৫
মোট		২৩০	৫৯	২৫.৬৫
১৯৭৭	কলা	৮১	২৮	৩৪.৫৬
	বিজ্ঞান	১৫৬	৪৪	২৮.২০

[২৬৫] *সৌরভ*, কলেজ বার্ষিকী, ২০০১-২০০২, সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর, পৃ. ৪৪।

	বাণিজ্য	৮	৪	৫০
মোট		২৪৫	৭৬	৩১.০২
১৯৭৮	কলা	৮৫	৩৫	৪১.১৭
	বিজ্ঞান	২২৭	৯৩	৪০.৯৬
	বাণিজ্য	১৪	৮	৫৭.১৪
মোট		৩২৬	১৩৬	৪১.৭১
১৯৭৯	কলা	৮০	৩৫	৪৩.৭৫
	বিজ্ঞান	২০৫	১০১	৪৯.২৬
	বাণিজ্য	১১	৭	৬৩.৬৩
মোট		২৯৬	১৪৩	৪৮.৩১
১৯৮১	কলা	১১৪	৩৭	৩২.৪৫
	বিজ্ঞান	১৮৪	১১৮	৬৪.১৩
	বাণিজ্য	১৯	১১	৫৭.৮৯
মোট		৩১৭	১৬৬	৫২.৩৬
১৯৮২	মানবিক	১১২	২১	১৮.৭৫
	বিজ্ঞান	১৯১	৪২	২১.৯৮
	বাণিজ্য	২৩	২	৮.৬৯
মোট		৩২৬	৬৫	১৯.৯৩
১৯৮৩	মানবিক	১০৪	১১	১০.৫৭
	বিজ্ঞান	২৭৫	৮৯	৩২.৩৬
	বাণিজ্য	২৭	১৩	৪৮.১৪
মোট		৪০৭	১১৩	২৭.৭৬
১৯৮৪	কলা	১৪৪	৩৭	২৫.৬৯
	বিজ্ঞান	৩৪৪	১০৪	৩০.২৩
	বাণিজ্য	৫১	২০	৩৯.২১
মোট		৫৩৯	১৬১	৪১.৪৪
		৪৮৫৭	২০১৩	৪১.৪৪

উপরিউক্ত ফলাফল থেকে লক্ষণীয় যে, সরকারি ইয়াছিন কলেজে এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৮৫৭ জন। এর মধ্যে পাশ করে ২০১৩ জন এবং পাশের গড় হার ছিল ৪১.৪৪%।

সারণী- ৪/৪৪

সরকারি ইয়াছিন কলেজের ডিগ্রির ফলাফল[২৬৬]

সাল	বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের সংখ্যা	পাশের হার (শতকরা)
১৯৭২	বি.এ	১৩২	৭৫	৫৬.৮১
	বি.কম	২২	১৫	৬৮.১৮
মোট		১৫৪	৯০	৫৮.৪০
১৯৭৩	বি. এ	১৫৭	৭	৪.৪৫
	বি. কম	২১	৩	১৪.২৮
	বি. এস. সি	৩৪	৩	৮.৮২
মোট		২১২	১৩	৩.১৩
১৯৭৪	বি. এ	১০৪	১	০.৯
	বি. কম	১৮	৪	২২.২২
	বি. এস. সি	২২	১	৪.৫৪
মোট		১৪৪	৬	৪.১৬
১৯৭৫	বি. এ	৪১	৫	১২.১৯
	বি. কম	১০	৪	৪০.০০
	বি. এস. সি	৮	১	১২.৫
মোট		৫৯	১০	১৬.৯৪
১৯৭৬	বি. এ	৩৮	৮	২১.০৫
	বি. কম	১১	০	০.০
	বি. এস. সি	১৩	১	৭.৬১
মোট		৬২	৯	১৪.৫১
১৯৭৭	বি. এ	৪২	৭	১৬
	বি. কম	১০	১	১০
	বি. এস. সি	১৯	১	৫.২৬
মোট		৭১	৯	১২.৬৭
১৯৭৮	বি. এ	৪০	৯	২২.৫
	বি. কম	১২	৪	৩৩.৩৩
	বি. এস. সি	২০	৪	২০

[২৬৬] কলেজ রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

মোট		৭২	১৭	২৩.৬১
১৯৭৯	বি. এ	৭৩	৩১	৪২.৪৬
	বি. কম	১৭	৪	২৩.৫২
	বি. এস. সি	১১	৬	৫৪.৫৪
মোট		১০১	৪১	৪০.৫৯
১৯৮০	বি. এ	৪৫	৪	৮.৮৮
	বি. কম	২২	৪	১৮.১৮
	বি. এস. সি	২০	৯	৪৫
মোট		৮৭	১৭	১৯.৫৪
১৯৮১	বি. এ	৪৪	৬	১৩.৬৩
	বি. কম	১১	৩	২৭.২৭
	বি. এস. সি	১০	৪	৪০
মোট		৬৫	১৩	২০
১৯৮২	বি. এ	৩৫	১৯	৫৪.২৮
	বি. ক.	১২	৩	২৫
	বি. এস. সি	৮	০	০
মোট		৫৫	২২	৪০
১৯৮৩	বি. এ	২৩	৯	৩৯.১৪
	বি. ক	১৪	৩	২১.৪২
	বি. এস. সি	১৫	৪	২৬.৬৬
মোট		৫২	১৬	৩০.৭৬
১৯৮৪	বি. এ	১৯	২	১০.৫২
	বি. কম	৭	৬	৮৫.৭১
	বি. এস. সি	৯	২	২২.২২
সর্বমোট		৩৫	১০	২৮.৫৭

উল্লেখিত ফলাফল থেকে লক্ষণীয় যে, সরকারি ইয়াছিন কলেজের ১৯৭২-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ডিগ্রী পরীক্ষার্থী ছিল ১১৬৯ জন। এর মধ্যে পাশ করে ২৭৩ জন এবং পাশের গড় হার ২৩.৩৫%।

৪.৩.৪.৫ রাজবাড়ী সরকারি কলেজ

তৎকালীন রাজবাড়ী মহকুমার প্রশাসক কাজী আজহার ও এলাকার জনগণের প্রচেষ্টায় ১৯৬১ সালের ২৩ জুন ৪৭ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় রাজবাড়ী সরকারি কলেজ। বর্তমান রাজবাড়ী

সরকারি কলেজের মোট জমির পরিমান ১৪ একর।[২৬৭] কলেজের শত বছরের পুরতন অফিস ভবনটি খ্রীস্টান পাদ্রী স্যামসন চৌধুরী কলেজ কর্তৃপক্ষের নামে রেজিষ্ট্রেশন করে দেন এবং এ অফিস থেকেই প্রথমে কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম বছরে লাইব্রেরী সামনে চৌ-চালা টিনের ঘরটি ক্লাস রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান অফিস ভবনটি অধ্যক্ষের কক্ষ এবং অফিস কক্ষ।[২৬৮]

১৯৬১ সালে প্রথমে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়। ১৯৬২ সালে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়, তবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কোন ক্লাস বিল্ডিং তৈরী না হওয়ায় কলেজের ছাত্র ছাত্রীর আন্দোলনের মুখে বর্তমান জেলা স্কুলে (তখন গোয়ালন্দ মডেল হাই স্কুল) ক্লাস নেওয়া হতো। পরে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন ভবন তৈরী করা হয়।[২৬৯] তৎকালীন অধ্যক্ষের প্রচেষ্টায় কলেজটি ঐতিহ্য কলেজ হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে ১ মার্চ ১৯৮০ সালে কলেজটিতে সরকারিকরণ করা হয়।[২৭০]

রাজবাড়ী সরকারি কলেজের লেখা পড়ার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। অতঃপর ১৯৯৬-৯৭ সালে কলেজটি ৪ বিষয়ে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রাণিবিদ্যায় অনার্স কোর্স চালু করে।[২৭১] অনার্স কোর্স চালুর পরে অনার্স পার্ট-১, পরীক্ষায় ভাল রিজাল্ট করায় ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে পুনরায় ৮ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। সেগুলো হলোঃ বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, প্রাণিবিদ্যা, ইতিহাস, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গনিত, উদ্ভিদ বিদ্যা। এভাবে অনার্স কোর্স চালুর পর থেকে কলেজটিতে ভাল রিজাল্ট করতে থাকে। তারপর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা যেন উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত হতে পারে এজন্য কলেজে মাষ্টার্স কোর্স খোলার চেষ্টা করে এবং বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও প্রাণিবিদ্যা চারটি খোলার অনুমোদন লাভ করে।[২৭২]

এছাড়াও বর্তমানে কলেজে তিন তলা বিশিষ্ট বিশাল একটি একাডেমী ভবন, তিন তলা বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য ভবন এবং দুই তলা তলা বিশিষ্ট একটি বিজ্ঞান ভবন রয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে শিক্ষকদের ক্লাস নিতে সমস্যা হয়। এছাড়া রয়েছে কলেজের ছাত্রছাত্রীর জ্ঞান অর্জনের জন্য

---

[২৬৭] *তদেব*, পৃ. ২১৭।

[২৬৮] *তদেব*।

[২৬৯] *তদেব*, পৃ. ২১৭।

[২৭০] *তদেব*, পৃ. ২১; *প্রয়াস*, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ বার্ষিকী, ২০০১-০২, পৃ. ৯।

[২৭১] মতিয়ার রহমান, *রাজবাড়ী জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২১৯।

[২৭২] *প্রয়াস*, বার্ষিকী ২০০১-২০০২, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, পৃ. ৯।

বিশাল লাইব্রেরী। আর শিক্ষকের জন্য রয়েছে শিক্ষক ডরমিটরী ভবন। নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ ভবন এবং বিজ্ঞানের জন্য রয়েছে ল্যাবরেটরী।[২৭৩]

অত্র কলেজে অধ্যক্ষের একটি বাসভবন রয়েছে। ভবনটি বর্তমানে সজ্জন কান্দায় কাজী বাড়ী পার্শ্বে অবস্থিত। অত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে এলাকার জ্ঞানী-গুণীদের মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রথম ৫০ বা ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয়। বর্তমানে রাজবাড়ী সরকারি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০০০ জন।[২৭৪] অত্র কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় কোন ছাত্রাবাস ছিলনা। বর্তমানে কলেজে দু'টি ছাত্রবাস আছে। মীর মশারফ হোসেন হল [২৭৫] ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর হল।[২৭৬]

সারণী- ৪/৪৫

রাজবাড়ী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের তালিকা [২৭৭]

ক্র: নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১	জনাব মোঃ ওসমান গণি	১৮.০৬.১৯৬১	৩১.১২.১৯৬৫
২	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	০১.০১.১৯৬৬	৩১.০৫.১৯৬৬
৩	জনাব মোঃ মিয়া কায়েম উদ্দিন	০১.০৬.১৯৬৬	২৯.০২.১৯৮০
	সরকারি করণ		
৪	জনাব মিয়া কায়েম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)	০১.০৩.১৯৮০	১৬.০৮.১৯৮০
৫	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন	১৭.০৬.১৯৮০	০৩.১২.১৯৮০
৬	মিয়া মোঃ কাযেম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)	০৪.১২.১৯৮০	৩১.১২.১৯৮০
৭	বিধু ভুষণ চন্দ্র	০১.১০.১৯৮১	২৬.০৭.১৯৮৯

কলেজের ১৯৭৩-১৯৭৭ সালের ফলাফল বেশ ভাল। ১৯৭৩-১৯৭৭ সালে এইচ. এস.সির মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৩৯ জন এর মধ্যে পাশ করেছে ৪৬৬ জন। পাশের হার ৪৪.৮৫%।[২৭৮]

---

[২৭৩] মতিয়ার রহমান, *রাজবাড়ী জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২১৭; *প্রয়াস, বার্ষিকী* ২০০১-২০০২, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, পৃ. ৯।

[২৭৪] *তদেব*।

[২৭৫] মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন একজন কথাশিল্পী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁর নামানুসারে এ হলের নামকরণ করা হয় মীর মোশাররফ হোসেন হল।

[২৭৬] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর একজন সাহিহিত্যিক ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁর নামানুসারে এ হলের নামকরণ করা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর হল।

[২৭৭] কলেজ, রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল থেকে সংগ্রহ।

৪.৩.৪.৬ সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ মাদারীপুর

তৎকালীণ প্রশাসক ডাব্লিউ বি. কাদরী, আবু তাহের, এম. মহিউদ্দীন, মরহুম এসকেন্দার আলী খানসহ প্রমুখ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে মাদারীপুর শহরে নাজিম উদ্দিন কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৯ সালে জাতীয়করণ করা হয়।[২৭৯]

নাজিম উদ্দীন কলেজের শুরু থেকে ইন্টারমিডিয়েড পর্যায়ে কেবল মানবকি বিভাগের পাঠ দান করা হতো। এ সময়ে বাণিজ্য বিভাগও খোলা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য বিভাগকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি ছাত্রের অভাবে। নাজিম উদ্দিন কলেজের প্রতিষ্ঠা বছরে ইংরেজি ও বাংলাসহ মোট ৬টি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল, বিষয়গুলো হলো বাংলা, ইংরেজি, আরবী, অর্থনীতি ইতিহাস ও দর্শন। ১৯৫০ সালে নাজিম উদ্দিন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়। এবছরে কলেজটিকে ডিগ্রী কলেজেও উন্নীত করা হয়। ডিগ্রী পর্যায়ে শুধু কলা শাখাই পাঠদান করা হতো। ১৯৫১ সালে মানবিক শাখার ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিষয় চালু করা হয়। ১৯৫৪ সালে পুনরায় বাণিজ্য শাখা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা খোলা হয়। ১৯৬৪ সালে ডিগ্রী পর্যায়ে বাণিজ্য শাখা খোলা হয়। ১৯৬৭ সাল কলেজটিতে বি. এস. সি. শাখা খোলা হয়।[২৮০] ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করে, বিষয়গুলো হলোঃ বাংলা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা এ বিষয়গুলোতে মার্ষ্টাস কোর্সও চালু আছে।[২৮১]

অত্র কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা কত ছিল প্রতিষ্ঠালগ্নে তা সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে বর্তমানে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ মোট ৬১ টি পদ আছে এর মধ্যে ৩২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন আর বাকী পদ শূন্য।[২৮২] অত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার

---

[২৭৮] মতিয়ার রহমান, *রাজবাড়ী জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২১৮; *প্রয়াস*, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ বার্ষিকী, ২০০১-২০০২ পৃ. ৯।

[২৭৯] *প্রয়াস*, বার্ষিকী ২০০১-২০০২, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী, পৃ. ৯।

[২৮০] আব্দুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলার পরিচিতি* (মাদারীপুরঃ বুক সোসাইটি-১৯৯৪) পৃ. ৯০-৯১।

[২৮১] *স্মরনিকা*, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীপূর্ণ মিলন, ১৯৯১, নাজিমউদ্দিন কলেজ, ফরিদপুর, পৃ. ৩৫।

[২৮২] *তদেব*, পৃ. ৩৬।

সময় কোন ছাত্রবাস ছিলনা। বর্তমানে কলেজে ১০০ টি আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস আছে।[২৮৩] এছাড়া কলেজ অধ্যক্ষের একটি বাসভবন আছে।[২৮৪]

মাদারীপুর নাজিম উদ্দিন সরকারি কলেজে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে লাইব্রেরীতে কতটি বই ছিল এর সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে বর্তমানে লাইব্রেরীতে ১০ হাজার বই আছে। কলেজের উন্নতির কল্পে একটি বুক ব্যাংক প্রকল্প চালু আছে।[২৮৫]

সারণী- ৪/৪৬

কলেজে অধ্যক্ষের তালিকা [২৮৬]

ক্র: নং	নাম	কার্যকাল	
		যোগদান	পর্যন্ত
১	ড. এ. এইচ. এম. মহিউদ্দিন	২৫.০৯.১৯৪৮	১১.১.১৯৪৯
২	জনাব এস ফজলুর রহমান	১২.৭.১৯৪৯	০৭.০২.১৯৫০
৩	আবু আসলাম মোঃ আজিজুল্লাহ	৪.০১.১৯৫৩	১৫.৭.১৯৫৩
৪	মো: আবদুল আউয়াল	৪.৯.১৯৫৩	৩০.৪.১৯৫৫
৫	আঃ জলিল মিয়া	১১.৮.১৯৫৫	১৯.৭.১৯৫৮
৬	গোলাম মোঃ আঃ মান্নান	২১.১১.১৯৫৯	১৯.৬.১৯৬০
৭	এম. ইউ. ভুইয়া	১৪.৩.১৯৬৫	২১.৭.১৯৭২
৮	ড. মোজহার উদ্দিন আহমেদ	১.২.১৯৭৩	১.১২.১৯৭৩
৯	জনাব শাহবুদ্দিন আহমেদ	১২.২.১৯৭৪	২৫.৫.১৯৭৫
১০	বাবু অখিল বন্দু সাহা (ভার:)	২৬.৫.১৯৭৫	৬.১.১৯৭৬
১১	জনাব শেখ সদর উদ্দিন মুন্সী	৭.১১.১৯৭৬	০১.০৩.১৯৭৭
১২	জনাব আজিজুর রহমান (জাতীয় করণ)	১৭.২২.১৯৭৭	৬.৫.১৯৭৯
১৩	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	১৮.৪.১৯৮০	৫.৪.১৯৮২
১৪	জনাব মোঃ শরিফ হোসেন	৬.১০.১৯৮৩	২০.৪.১৯৮৪[২৮৭]

[২৮৩] *স্মরনিকা*, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলন ১৯৯১, নাজিমউদ্দিন সরকারি কলেজ, মাদারীপুর, পৃ. ৩৭; আব্দুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলার পরিচিতি*, পৃ. ৯২।

[২৮৪] আব্দুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলার পরিচিতি*, পৃ. ৯২; *স্মরনিকা*, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুর্ণর্মিলন, সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর, পৃ. ৩৫।

[২৮৫] আব্দুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলার পরিচিতি*, পৃ. ৯৩।

[২৮৬] রেজাল্ট রেকর্ড ফাইল, নাজিম উদ্দিন সরকারি কলেজ, মাদারীপুর।

[২৮৭] আব্দুল জাব্বার মিয়া, *মাদারীপুর জেলার পরিচিতি*, পৃ. ৯১।

অত্র কলেজে এইচ. এস.সি পরীক্ষায় ১৯৫১-৫৫ সাল পর্যন্ত ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৩২ জন এবং এর মধ্যে পাশ করে ৬৭ জন। মোট পাশের হার ৫০.৭৫%।

৪.৩.৫ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর্যালোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ স্তরকে 'উচ্চ মাধ্যমিক স্তর' নামে অভিহিত করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে ইন্টার মিডিয়েট কলেজ বলা হয়। আবার অধিকাংশ ডিগ্রী কলেজেও ইন্টার মিডিয়েট স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে আধুনিক উন্নত মানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক মানে উন্নীত করে সেখানে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেই তৎকালীন সরকার উভয় প্রদেশের জন্য শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।[২৮৮] স্বাধীনতা অব্যহতির পরই ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষা সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনের সুপারিশের আলোকে ১৯৪৯ সালে ১৬ই মার্চ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আকরাম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির সুপারিশের আলোকে উল্লেখযোগ্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলতে ৯ম শ্রেণী হতে একাদশ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত হবে এবং অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রির কোর্সের সাথে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীকে নিম্নমাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। প্রতি মহকুমা সদরে একজন করে মহকুমা শিক্ষা অফিসার নিয়োগদান করত নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রথিমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। প্রদেশিক সদরে শিক্ষা দফতরে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একজন সহকারী পরিচালকের পদে থাকবে। মাওলানা আকরাম খানের পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশের আলোকে কিছু কিছু বাস্তবায়িত হয়েছিল তবে সুপারিশের সংস্কার প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নি।[২৮৯]

---

[২৮৮] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৪৯-২৫২।

[২৮৯] Dr. Sekandar Ali Ibrahim, *Reports on sleinila Education and madrasha Educaltion in Bengal*, Dhaka, Islamic Foundution. P. 135; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ ২৬৭-২৮২।

আতাউর রহমান খাঁন কমিশন, ১৯৫৭ সালের রিপোর্ট যে সংস্কারগুলোর করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম সংস্কার ছিল উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কার। উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কারের উপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো পেশ করেন- প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে উঠিয়ে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও মানবিক, বিজ্ঞান, বার্ণিজ্য ও কারিগরি প্রভৃতি বিভাগের ব্যবস্থাও অব্যাহত রাখতে হবে। এদেশের উচ্চতর ডিগ্রিধারীরা যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের ডিগ্রিধারীদের সমপরিবারভূক্ত হতে পারে এবং উন্নতর শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায় সে জন্যে শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয়ে সংযোজন করে শিক্ষাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করতে হবে।[২৯০]

কমিশন গঠনের এফ ১৬/ ৯/ ৫৮ ইং দাপ্তরিক আদেশ বলে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জনাব এস. এম. শরিফকে চেয়্যারম্যান করে ১১ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারীতে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইউব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশনে যে সকল বিষয়ে সংস্কারের কথা বলেছিলেন তার অন্যতম সংস্কার ছিল মাধ্যমিক শিক্ষকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিন্যাস করার প্রস্তাব করে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ ও আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধনের সুপারিশ, উর্দূ ও বাংলা ভাষার দুর্বলতা দূর করা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে চালুর সুপারিশ করেন।[২৯১]

এ কমিশন আরো উল্লেখ করে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝায়। কিন্তু ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা না হলে ততদিন ৬ষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এ কারণেই বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। যথা ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী (অন্তবর্তী), নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (উচ্চ মাধ্যমিক)। উচ্চশিক্ষার জন্য বার বছর অধ্যায়নের পর বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ন হলে কোন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিৎ। মানবিক ও বিজ্ঞান স্নাতক ডিগ্রির জন্য দু'বছরের কোর্সসমূহকে সম্প্রসারিত করে ৩ বছর মেয়াদি বর্ধিত করা উচিৎ। পাস ও অনার্স দু'টি কোর্স থাকা উচিত। মাস্টার ডিগ্রির জন্য অধ্যায়নের কোর্স দুই বছরের মেয়াদী হওয়া উচিত। উচ্চতর ডিগ্রিধারীরা যাতে উন্নত দেশের ডিগ্রিধারীদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে এ জন্য শিক্ষাক্রমে নতুন

---

[২৯০] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৮৭-২৯০; এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ১।

[২৯১] এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ২; মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ২৯২।

বিষয়ের সংযোজন সাধন করে সমৃদ্ধ করতে হবে। উপরোক্ত কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হলেও পরবর্তীতে তীব্র ছাত্রআন্দোলনের মুখে রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়।[২৯২] তীব্র ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করেই সরকার বিচার প্রতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আরো একটি শিক্ষাকমিশন গঠন করেন ১৯৬৬ সালে। এ কমিশনের শিক্ষাথীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করেন।[২৯৩]

পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে একটি স্টাডি গ্রুপ তৈরী করা হয়। স্টাডি গ্রুপের রিপোর্টের ভিত্তিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে জুলাই মাসে 'নিউ এডুকেশন পলিসি' বা 'নতুন শিক্ষানীতি' প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির তৎকালিন সময়ের শিক্ষাব্যবস্থাসমূহের ক্রটি চিহ্নিত করে এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ এবং বিশেষ করে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে অন্যান্য পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন তাদের সমকক্ষ হয়।[২৯৪]

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট তার জাতীয় বেতার ভাষণে এবং পরবর্তীতে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, শিক্ষা সমস্যা নিরসনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে ও চাহিদা পূরণে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা চালাবে। এ উদ্দেশ্যে সরকার শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করার লক্ষ্যে একটি অনুধ্যান কমিটি (Study group) গঠন করেন। এ পর্যালোচনার আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার উপর একটি নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত রিপোর্টটি ১৯৭০ সালের মার্চের ১৩ ও ২৬ তারিখের মন্ত্রী পরিষদ সভায় গৃহীত হয় এবং তা ২৬ মার্চ, ১৯৭০ সালে চূড়ান্তভাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশে বলা হয় মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মানের উপর উচ্চশিক্ষার সুযোগ নির্ভরশীল। এ স্তরের শিক্ষা শেষে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে বাছাই করার পর উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় তাদের প্রবেশের সুযোগ দেওয়া উচিত। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অপারগ বা অমনোযোগী তারা এ নব বৃত্তিমূলক বিষয়ে দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগী জীবিকা

---

[২৯২] *তদেব*, পৃ. ২৯৮।

[২৯৩] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩১১; এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৩।

[২৯৪] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩২৫-৩২৬; এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৩।

অবলম্বন করতে পারবে। কাজেই এ স্তরের শিক্ষার যেমন একদিকে থাকবে জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন ধারার সমাহার তেমনী অন্য দিকে থাকবে জীবন ও জীবিকার লক্ষ্যে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা। বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষত বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা সহকারে উন্নতমানের সুসজ্জিত পরীক্ষাগার নিশ্চিত করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে দেশের এ স্তরের সকল বিদ্যালয়ে একই ধরনের নূন্যতম মান সমতারভিত্তিতে শিক্ষক সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের নিয়মিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে জরুরী ভিত্তিতে ক্রাশ প্রোগ্রামের (crash porgramme) মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী সমন্বিত কোর্সে ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। উপরন্ত ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী শিক্ষাক্রমে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ও কলেজে চালু করা।

আরো সুপারিশ করা হয় যে, শিক্ষা গবেষণা শক্তিশালীকরণার্থে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। শহরের নির্বাচিত কিছু উন্নতমানের কলেজ স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা অনুমতি দিতে হবে। জাতীয় চাহিদার নিরিখে উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে দেশের সকল অঞ্চলে কলেজ স্থাপন করতে হবে। উল্লিখিত সুপারিশের কিছু কিছু বাস্তবায়ন হলেও অধিকাংশই অবাস্তবায়িত থেকে যায়।[২৯৫]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালের কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষানীতি প্রথম শিক্ষা কমিশন। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯জন। কুদরাত-ই-খুদা রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পরই একটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ যা প্রকৃত পক্ষে দেশ ও জাতীর জন্য কল্যাণকর ও যুগোপযোগী এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবতন ও সংস্কার। আবার এমন কিছু সুপারিশ যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিপরীত। কুদরাত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের উচ্চ সুপারিশের উল্লেখ্যযোগ্য অংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হল দুই বছর মেয়াদী যথা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। এ কমিশনের আলোকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সমাপনী শ্রেণী অথাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ধরা হলে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসুত্র বজায় রাখার ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সমতা

---

[২৯৫] মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৩৩২-৩৪২।

নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষা আয়তনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি একটি বিশেষ স্তর হিসেবে গণ্য হতে পারে। কেননা এক দিকে মাধ্যমিক স্তর অন্যদিকে ডিগ্রী স্তর এবং এ দুটির স্তরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ তিন বছরের চেয়ে কম হবে না। ডিগ্রী কলেজগুলোতে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে পারে। মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষামূলক একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত কলেজ তিন বছর মেয়াদী প্রথম ডিগ্রির জন্য উচ্চ মানের কোর্সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়।[২৯৬]

১৯৭৮ সালের তৎকালিন শিক্ষ প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন ও পরে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদকে সভাপতি করে 'শিক্ষা উপদেষ্ঠা পরিষদ' দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে ৪০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে এ পরিষদের উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী ছিল–

উচ্চ মাধ্যমিক হবে ২ বছর। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, মানবিক, কৃষি, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ললিতকলা, শিক্ষা বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিভাগ থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক সব পরীক্ষাই জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করবেন। উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্তের পর শিক্ষার্থী যে কোন পেশায় প্রথম ধাপে নিযুক্তি লাভের উপযুক্ততা লাভ করবে। বেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ ব্যয়বহুল ও বর্তমানে সামাজিক পরিস্থিতির উপযোগী না হওয়ায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে বিধায় এ গুলোকে সাধারণত সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে।[২৯৭]

অধ্যায় উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি এবং নদী বহুল এলাকা হবার কারণে বন্যা, জলোচ্ছাস বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার হয়ে থাকে। অবস্থানগত কারণেই এখানে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো শিক্ষা সুযোগের অনেক বিষয় থেকে বঞ্চিত থাকে। এ অবস্থার মধ্যেও স্থানীয় জনহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের একান্ত প্রেরণা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোকতায় এ অঞ্চলে সনাতন ও আধুনিক শিক্ষার বিকাশ অত্যন্ত সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বলা চলে। প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে বৃহত্তর ফরিদপুরের ঘরবাড়ি সাধারণত টিন ও

---

[২৯৬] *তদেব*, পৃ. ৪৪১-৪৭০।

[২৯৭] এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম*, পৃ. ৪-৯; । মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পৃ. ৪৯৮-৫০০।

বাঁশের তৈরী হয়ে থাকে। ফলে মক্তব, মাদরাসা, স্কুল কলেজসহ সকল প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠালগ্নে টিন ও বাঁশের তৈরী ঘরে তাদের পাঠদান শুরু করে থাকে। পরবর্তীতে প্রশাসনের সহযোগিতা ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠানসমূহের পাকা ভবন তৈরী হয়। বর্তমানে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই অবকাঠামোগত ভাবে উন্নত হয়েছে। সে সাথে শিক্ষার পরিবেশও উন্নত বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হলেও মাদরাসা শিক্ষা ক্রমশ উন্নয়নের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, ফরিদপুর অঞ্চলের সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ অনেকাংশেই সন্তোষজনক।

পঞ্চম অধ্যায়

ফরিদপুর জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার প্রভাব

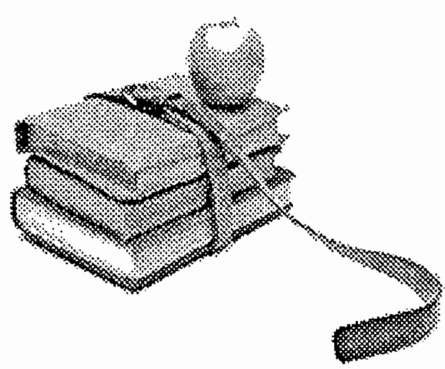

৫.১ ভূমিকা

শিক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। এর অর্থ জানা, বুঝা বা হৃদয়াঙ্গম করা।[১] শিক্ষা বলতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা কিংবা বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ব করাকে বুঝায়। শিক্ষার আরবী শব্দ 'ইলম, এর প্রতিশব্দ তা'লীম[২] এছাড়া আরবী ভাষায় তারবিয়াত[৩], তাদীব[৪], তাদবীর[৫] ও তাদরীস[৬]

---

[১] মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, (ঢাকাঃ খায়রুল প্রকাশনী, ২০০২), পৃষ্ঠা-২৩।

[২] تعليم তালীম শব্দের মূল হচ্ছে علم শব্দের অর্থ:

জ্ঞাপন করা,,Information-

পরামর্শ, উপদেশ, নির্দেশ- Advice

জ্ঞাপন, শিক্ষাদান, শিক্ষা, নির্দেশ- Instruction

নির্দেশ তত্ত্বাবধায়ন, পরিচালনা- Direction

শিক্ষাদান, উপদেশ, শিখানো -Teaching

হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া, অনুশীলন করানো- Training

শিক্ষাদান, শিক্ষিত করে তোলা- Schooling

প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, শিক্ষা- Education

অভ্যাস করানো, শিখানো - Apprticeship

দ্রষ্টব্যঃ Hans Weher, Dictionary of Modern written Arabic (New york, spoken language servicesin, 1976), P. 636; আফজাল হুসাইন (তালীম ও তারবীয়াত অনুবাদ মোঃ মোশাররফ হোসেন (ঢাকাঃ ইফাঃ এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩) , পৃ. ২৬।

[৩] تربيت শব্দটি ربى শব্দ থেকে নির্গত تربيت শব্দের অর্থ

প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, শিক্ষা- Education

লালন পালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা-Upbringin

শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, উপদেশ-Teaching

জ্ঞাপন, শিক্ষাদান, শিক্ষা, নির্দেশ, আদেশ-Instruction

শিক্ষা বিজ্ঞান, শিক্ষাদান-চবফধমড়মু

শিক্ষাদান, লালনপালন, শিষ্ঠাচার-Brecding

উত্তোলন করা, মহতর, করা, অগ্রসর করা- Raising

দ্রষ্টব্যঃ প্রাগুক্ত, ৩২৪।

[৪] তাদীবتاديب শব্দটি গঠিত হয়েছেادب থেকেتاديب শব্দের অর্থ:

সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, উন্নতি সাধন-Culture

সংস্কৃতি, ভদ্রতা, উন্নতি-Refinement

শব্দগুলোও শিক্ষার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী Education শব্দটি শিক্ষার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ অর্থে বিদ্যার্জনকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে সুপ্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনাকে বিকশিত করার পথ নির্দেশক প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যেখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। অন্য কথায়, মানুষের মেধা, জ্ঞান, কর্ম দক্ষতা ও মানসিক শক্তি বিকাশের প্রয়াসকে সাধারণভাবে শিক্ষা বলা হয়। অবশ্য বিভিন্ন

ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, সুশিক্ষা-Good breeding

সুপ্রথা, ভদ্রতা, সুআচরণ, বিনয়-Good manners

সামাজিক গুণাবলী, স্বর্গী প্রভাব-Social graces

শালীনতা,শিষ্ঠতা, ভদ্রতা-Decorum

শিক্ষাদান, শিক্ষা-Education

উপদেশ শিক্ষা, নিয়মাবলী-Discipline

দ্রষ্টব্যঃ Ditionary of modern written Arabic, চ. ১০.

[৫] تدبير তাদবীর অর্থঃ

বাস, বাসস্থান, বাসা-Habitation

অভ্যাস করানো, প্রচলন করানো-Accustoming

অভ্যাস করা, চর্চা করা, অনুশীলন করা-Practice

ছিদ্রকরা, বারবার অনুশীলন করা- Drill

শিক্ষাদান, শিক্ষিত করে তোলা-Schoolin

হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো-Training

শিক্ষাদান, উপদেশ-Coaching

দ্রষ্টব্যঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

[৬] تدريس তাদরীস শব্দটি গঠিত হয়েছে درس থেকে تدريس এর অর্থ

সমূলে বিনষ্টকরা, সম্পূর্ণ ধ্বংস করা-To wipe out

তুলিয়ে ফেলা, মুছিয়ে ফেলা-Blot out

শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া-To teach

জ্ঞাপন, শিক্ষাদান, শিক্ষা-Instruction

শিক্ষাদান, শিক্ষা-Tuition

দ্রষ্টব্যঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, ও মনীষীগণ শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া, এ প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষ আদির্শক ও নৈতিক মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়। পক্ষান্তরে সমাজ অর্থ সহযোগিতা। সমাজ হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহের বিপরীত অবস্থা। যুদ্ধ বিগ্রহ বলতে বুঝায় পারস্পরিক ধ্বংস সাধন। সমাজ বলতে বুঝায় পারস্পরিক সৃজনশীলতা তথা সহযোগিতাও বুঝায়।[৭] পারস্পারিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে মানুষ যখন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বাস করে সেটিই সমাজ।[৮] এছাড়া কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়েও একটি সমাজ গড়ে উঠে। সেই সকল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থার সমাবেশে যে সুসংঘবদ্ধ কাঠামো গড়ে উঠে সেটিও সমাজ। আমরা যে সব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে জীবন ধারণ করি তাদের সংগঠিত রূপই হল সমাজ। এ সমাজে মনের দিক দিয়ে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিই গড়ে তোলে একটি সমাজ। সেই সমাজের মানুষ একই সাধারণ সংস্কৃতির অংশীদার এবং স্বীয় সামাজিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুসংখ্যক মানুষের সমষ্টি। মানব জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কোন একটি সাধারণ ভূখণ্ডে বসবাসরত নিজেদের মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য সমষ্ঠিগতভাবে সহযোগিতারত একটি সংগঠিত যৌথবদ্ধ জনসংখ্যাকে সমাজ বলে; যারা পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ বা ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায়রত এমন এক জনগোষ্ঠী। যারা গড়ে তুলে নিজস্ব সাধারণ

---

৭ *Encyclopaedia of Social Sciences*, Voll. IX-X (New york: The Macmillan Co., 1959 A.D), pp. 552-554.

৮ শ্রী প্রমোদ বন্ধুসেন গুপ্ত প্রণীত ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় পরিমার্জিত, *সমাজ দর্শন* (কলিকাতা: ব্যানার্জি পাবলিশার্স, একাদশ পুর্ণমুদ্রণ, ১৯৮০খ্রি:), পৃ: ৪৭-৫০; নাজমুল করিম, *সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষা* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৯খ্রি:), পৃ: ১২-১৭; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২খ্রি:), পৃ: ৬৪; পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলিকাতা: পশ্চিম বংগ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯২খ্রি:), পৃ: ১১৯; এফ.আর.খান, *সমাজ ইতিহাস* (ঢাকা: শিরিন পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৪খ্রি:), পৃ: ১৫০; ফজলুর রশীদ খান, *সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব* (ঢাকা: শিরিন পাবলিকেশনস, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০খ্রি:),পৃ: ৩৬; ড. মো: মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা* (রাজশাহী: বুকস প্যাভিলিয়ন, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬খ্রি:), পৃ: ৫৩; এ.জেড.এম শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৬খ্রি:), পৃ: ১৬৫; M.R. Maciver and Page, *Society* (London: Macmillan Co., 1967 A.D), p. 15; J.N. Sinha, *Introduction to Philosophy* (Calcutta: new central book agency (P) Ltd., 1998 A.D), p. 217; Ogburn and Nimkoff, *A Handbook of Sociology* (London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1960 A.D), pp. ২৯-৫৮; স্যামুয়েল কোনিগ, *সমাজ বিজ্ঞান* অনুবাদ এ.কে. নাজমুল করিম (ঢাকা: বই বিতান, ১৯৮৩খ্রি:), পৃ: ২৪।

প্রথা ও সংস্কৃতি।[৯] এখানে উল্লেখ্য যে, সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই বুঝিয়েছেন।[১০] ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে সমগ্র মানব জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। আর সংকীর্ণ অর্থে সমাজ বলতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন সমষ্টিকে বুঝায়।[১১]

৫.২ শিক্ষা ও সমাজ প্রসঙ্গ

একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক প্রয়োজন। সমাজের মানুষদেরকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এবং সমাজের প্রয়োজনেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১২] মানুষের প্রথম সমাজে লোকসংখ্যা কম থাকায় এটি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ছিল। বর্তমানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে হলে সমাজের অধিবাসীদেরকে কতকগুলো নিয়ম নীতি পালন করতে হয়। আনুগত্য, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিষ্ঠাচার, স্বদেশপ্রেম, সত্যসাক্ষ্য, পরোপকার, দয়া ও ধৈর্য্য ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে সমাজের শান্তি বজায় থাকে। শিক্ষা দ্বারা একজন শিক্ষার্থী মানবীয় অসৎ গুণাবলীর পরিণতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়। শিক্ষা মানবীয় গুণাবলী তৈরির মাধমে পার্থিব লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসকে উপেক্ষা করে জীবনের মহান আদর্শগুলোকে সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্ঠা করে যাচ্ছে। ফলে সমাজ জীবনে অশান্তি, দুর্নীতি, রাহাজানী, হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি ও ডাকাতির মত অপরাধগুলো সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা কম হওয়ারই কথা।[১৩] সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার নিয়মগুলো শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ অর্জন করে থাকেন। যেহেতু শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ হল সমাজের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচরণ রীতি-নীতির সাথে ব্যক্তির পরিচয় ঘটানো এবং সমাজের ধ্যান ধারণা ও ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় একে অপরের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ ক্ষেত্রে সনাতন ও আধুনিক উভয় শিক্ষাই সমাজ সংরক্ষণ ও প্রগতির উন্নয়নে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের পরস্পরের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও

---

[৯] Ely Chenoy, *Sociological Perspective* (New york: Random House, 1954 A.D), p. 1-60.

[10] G.W. Allport, *Personality: A Psychological Interpretation* (London: Constable and Co., 1937 A.D), pp. 1-10

[১১] William J. Goode, *The Family* (New Delhi: Prentice Hall of India, 1965 A.D), pp. 1-20.

[১২] ড. হাসান জামান, *ইসলামী শিক্ষা অগ্রগতির পথে* (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, ২০০৩খ্রি:), পৃ: ১৩।

[১৩] নূর মোহাম্মদ, *ইসলাম ও আখলাক* (ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৭৬খ্রি:), পৃ: ১; আব্দুল খালেক, *আল কুরআন ও আমাদের সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫খ্রি:), পৃ:১৩৩-১৩৪; সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের সমাজ দর্শন*, আব্দুল মান্নান তালিব অনুদিত (ঢাকা: শতদল প্রকাশনী, ১৯৭৬খ্রি:), পৃ: ১৭; মাহমুদা ইসলাম, *সমাজ ও ধর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩খ্রি:), পৃ:৭০-৮০।

কর্তব্য রয়েছে। বিপদ-আপদে, দু:খ-দুর্বিপাকে মানুষ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এখানেই মানব সমাজের দায়বদ্ধতা।[১৪]

যুগ যুগ ধরে মানুষ পরস্পরে মিলে মিশে বসবাস করে আসছে। মানুষের নিজেদের কিছু কাজের দ্বারা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রকৃতিগত ভাবেও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ সামাজিক প্রধান তিনটি সমস্যা তুলে ধরেছেন।

প্রথমত: মানুষের নিকট প্রকৃতিগতভাবে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের সাথে সমষ্টিগত জীবনের সমন্বয়ের অভাব হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হতে পারে।

তৃতীয়ত: সমাজের মানুষের জীবন যাপনের নানা প্রকারের উপাদানের মধ্যে অসম পরিবর্তনের কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

উক্ত সমস্যাগুলোর কারণে মানুষের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, অপরাধ প্রবণতা, তরুণ বালক-বালিকাদের মধ্যে অশ্লীলতা, বেহায়পনা, মাদকদ্রব্য সেবন, গোত্র-বর্ণ প্রথার বিভেদ, পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রতি অবহেলা এবং জনসংখ্যার বিস্ফোরণসহ নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।[১৫]

শিক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনাকাঙ্খিত দুঃখ বেদনা, অভাব অভিযোগ, হতাশা, না পাওয়ার বেদনা ইত্যাদি বিষয় থেকে সান্তনা দেয়। ধর্মীয় গুণাবলী মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আখিরাতের অনন্ত জীবনের কথা স্বরণ করে দেয়। ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ভবিষৎ উজ্জল সম্ভাবনাময় জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায়। সামাজিক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুশিক্ষা দ্বারা একজন মানুষ নিম্মোক্ত সুবিধা লাভ করে থাকে।

১. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতা প্রভৃতি ভুলে থাকতে পারে বলে সামাজিক বিক্ষোভ এবং অসন্তুষ্টি কম দেখা দেয়।

২. স্বাভাবিক গতিতে সমাজ যেভাবে চলছে তার পরিবর্তন দেখা দিলে মানুষ ক্লান্ত ও অসহায়বোধ করে। সামাজিক রীতি-নীতি, অনুশাসন, কঠিন শৃঙ্খলাবোধ, আইন-কানুন কঠোর হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি ধর্মীয় চেতনার

---

[১৪] সাইয়্যিদ মুসতাফা লুতফী আল মানফালূতী, *মুখতারাতুল মানফালূতী* (বৈরূত: দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭২ খ্রি:), পৃ: ১৪৮-১৫৭।

[১৫] Ogburn and Nimkoff, *A Hand Book of Sociology* (London: Routledge and Kegan Poul Ltd., 1960), pp. 546-547.

আলোকে মানবিক নিয়ম-নীতি মেনে চলে তবে সামাজিক সমস্যাসমূহ আস্তে আস্তে কেটে যায়। যেমন যে সমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন নেই সেই সমাজে বেহায়পনা, অশ্লীলতা, এ্যাসিড নিক্ষেপের প্রবণতা বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সমাজে যদি পর্দা প্রথার প্রচলন করা যায় তবে এ সকল অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে কমে যায়। প্রাথমিকভাবে পর্দা প্রথা সামজের মানুষের কাছে অসহনীয় হলেও এর প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে সামাজিক অনাচারের মাত্রা অনেকাংশে কম লক্ষ্য করা যায়।

৩. সুশিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে তাকে পৃথিবীতে কি জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে বিবেকের তাড়নায় সৎপথে চলতে প্রেরণা যোগায়। সে ইহকাল ও পরকালের মধ্যে তার নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে সামাজিক মানুষ হতে সাহায্য করে। সমাজের সকলের প্রতি তার দায়-দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়সমূহের নির্দেশ করে।

৪. মানুষ অনেক সময় কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় অসামাজিক কর্মকাণ্ড করে বসে। এর ফলে সে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। ফলে কোন এক সময় সে নিজের বিবেকের দংশন অনুভব করে। এর জন্য সে মানসিকভাবে শাস্তি ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে অনুশোচনা করলে তার অপরাধ মুক্তির নির্দেশ দেয়।

৫. সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও শিক্ষার এক বিরাট অবদান রয়েছে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরস্পরে ঐক্য সংহতি সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করে। আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করার ফলে মানুষের মধ্যে পরস্পরে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠে। শিক্ষা মানুষকে এক অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার প্রেরণা যোগায়।

৫.৩ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা

সমাজ উন্নয়নের জন্য নিরক্ষরতা একটি বড় বাধা। এটি একটি সামাজিক অভিশাপও বটে। নিরক্ষর মানুষ সমাজের উন্নয়নে খুব বেশী অবদান রাখতে পারে না। তারাই বেশির ভাগ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। একজন শিক্ষিত ব্যবসায়ী ও শ্রমিক অন্য অশিক্ষিত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের চেয়ে অধিক উন্নয়ন করতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে সমাজের নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মসূচী হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ নিয়ে থাকে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়নের একটি ভিত্তি তৈরী করে। সমাজে 'আলিমগণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর মানুষদেরকে মসজিদ ও মকতবে পবিত্র কুরআন পঠনসহ প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়িল, হিসাব নিকাশ এবং অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন। মসজিদ কেন্দ্রিক মকতবের মাধ্যমে সকাল বিকাল শিশু কিশোরদের শিক্ষা দিচ্ছেন। মাদরাসায় শিক্ষিত মসজিদের ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনগণ মুসল্লিদের প্রয়োজনীয়

শিক্ষা দিচ্ছেন। একজন শিশু জন্মের পরে পিতামাতার কাছে লালিত পালিত হন। এরপর সে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পূর্বেই সে মসজিদে 'আরবী অক্ষরের জ্ঞান লাভ করে থাকে। এ সকল শিক্ষকগণ নিরলস ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি মসজিদ কেন্দ্রীক মকতব ও ইবতিদায়ী মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব দেশ ও সমাজের চাহিদা পূরণে প্রশংসানীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[১৬]

গাছপালা থেকে আমরা অক্সিজেন পেয়ে থাকি। অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বণ ড্রাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। তাই প্রকৃতির সাথে আমাদের জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বেশি পরিমানে গাছ লাগানোর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে। অন্যদিকে গাছপালা কেটে ফেললে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হয় এবং দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য বেশি পরিমানে গাছ লাগানো দরকার।[১৭] এ ক্ষেত্রে ফরিদপুর অঞ্চলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অঞ্চলের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত প্রতি বছরের জুন মাসে বৃক্ষরোপন অভিযানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। জেলার অধিকাংশ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় প্রচুর পরিমাণে গাছ রয়েছে। আবার কতকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ফলের ও কাঠের বাগানও রয়েছে।

সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সকল নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব। একটি সুখী ও সুন্দর সমাজের মানুষ সকল কর্মকাণ্ড সহজ ও সুচারুরূপে সমাপ্ত করতে পারে। 'আলিমগণ সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানুষের কাছে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সমাবেশ ও ওয়াজের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। 'আলিমগণ অজ্ঞ ও ধর্মবিমূখদেরকে ইসলামের বাণী প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞানদান ও ধর্ম পরায়ণ করছে। যাতে কেহ সমাজ ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়। তাঁরা সমাজের কলহ-কোন্দল মেটানোর কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের মানুষকে আত্মসচেতন করছেন। সমাজের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সৌহার্দভাব সৃষ্টি করছেন। ইসলামী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে 'আলিমগণ সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ মাদরাসায় শিক্ষিত তথা 'আলিম সমাজের উপর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। সমাজের লোক তাঁদের কথা শোনে এবং তদনুযায়ী চলে। কারণ সমাজের 'আলিমগণ এখন পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে যে জনসেবা করে যাচ্ছেন তার কোন তুলনা হয় না। তন্মধ্যে রোগীর সেবা, মৃত ব্যক্তির জানাযা ও দাফন

---

[১৬] Dr. A.K.M.Ayyub Ali, *op.cit*, p. 2; এম.এ. জব্বার, *শিক্ষানীতি*, ২য় ইউনিট (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫খ্রি:), পৃ: ২০।

[১৭] এম.এ. জব্বার, *শিক্ষানীতি*, ২য় ইউনিট, পৃ: ১৯।

কাফনের ব্যবস্থা। জন্ম, 'আকীকা, বিবাহ, দীনি দাওয়াত, হেকিমী ও হোমিও দাতব্য চিকিৎসা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁরা সমাজের সাধারণ লোকের নিঃস্বার্থ সেবা করে যাচ্ছেন।

দেশের উন্নয়নে প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের চেতনাবোধ সৃষ্টি হয় একমাত্র শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে। এ প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বাণী, إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ "আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।[১৮] এ থেকে বুঝা যায়, সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন তথা জাতীয় উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। একটি রাষ্ট্র বা জাতীয় উন্নতি শিক্ষাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। তাই এ যুগ সন্ধিক্ষণে নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনা তথা অন্যায় অনাচার, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীভূত করে সমাজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলা দরকার। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে শিশু শিক্ষাসহ বয়স্ক শিক্ষা, হাঁস-মুরগীর খামার, পশু পালন, দাতব্য চিকিৎসা, কৃষি বন, মৎস চাষ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রেরণ করছেন।[১৯] বলা বাহুল্য, এ প্রশিক্ষণার্থীরা সমাজের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য উল্লেখিত কর্মকাণ্ড যত্নসহকারে পালন করে করে যাচ্ছেন। এ ধরনের প্রকল্প বৃদ্ধি করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কর্মস্থলে প্রেরণ করলে তাঁদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পল্লী অঞ্চলের তথা সমাজের উন্নতি ও শান্তি শৃঙ্খলা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাবে- এতে সন্দেহ নেই।[২০]

আমাদের সমাজের মানুষ কোন সমস্যায় পড়লে 'আলিমদের শরণাপন্ন হন। 'আলিম ব্যক্তিগণকে তাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলেন। অনেক সময় কিছু হাদিয়া ও উপঢৌকনও দিয়ে থাকেন। আবার কোন আর্থিক বা সামাজিক কাজে সাফল্য লাভ করলেও 'আলিমদের শরণাপন্ন হন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বা মিলাদ পড়ে দোয়া কামনা করে শুকরিয়া আদায় করেন। এভাবে সুখে-দুঃখে সমাজের মানুষ 'আলিমদের সান্নিধ্যে এসে থাকেন। 'আলিমদের ওসিলায় পরকালীন মুক্তির সওয়াব রেসানী চান।

---

[১৮] সূরাহ রা'দ, আয়াত: ১৫৬।

[১৯] এম.এ. জব্বার, *শিক্ষানীতি*, ২য় ইউনিট, পৃ: ১৯।

[২০] মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, 'আর্থ সামাজিক চাহিদা পুরণে মাদরাসা শিক্ষা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩খ্রি:, পৃ: ৫৯।

সামাজিক বা আর্থিক কোন কাজ আরম্ভ করতে হলে সমাজে এখনো কুরআনখানী, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ-নসিহত ইত্যাদির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এসকল কাজে মাদরাসায় পড়ুয়া লোকদেরকে প্রয়োজন হয়। যে কোন কাজের প্রারম্ভে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট শুধু নিজের চাওয়াই তৃপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ 'আলিম ব্যক্তিদেরকে দীনের পথে চলার কারণে তাঁদের কাছে দোয়া চেয়ে থাকেন। এ সকল মাদরাসা পড়ুয়া ব্যক্তিদেরকে সমাজে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়।[২১]

গ্রাম বাংলায় মুসলিম সমাজ গড়ে উঠার প্রারম্ভ থেকেই মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি বা তার পরিবার কোন না কোন মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। এখনো নবান্নের ফসল উঠলে এবং বিভিন্ন ফলের মৌসুমে, ফল খাবার উপযোগী হওয়ার সময় মসজিদের ইমাম বা সমাজের 'আলিম ব্যক্তিকে দাওয়াত অথবা তাঁর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে মানুষের এ তিনটি স্পর্শকাতর মুহূর্তে মাদরাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রয়োজন হয়।

জন্মের পরই শিশুর একটি সুন্দর নাম রাখার জন্য আত্মীয়-পরিজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন 'আলিমের শরণাপন্ন হন। তিনি আল্লাহর গুণাবলী বিশিষ্ট কোন নাম অথবা রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাহাবীদের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন নাম নির্বাচন করে দেন। ফলে বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যার ৯৯.৫০ ভাগ প্রকৃত নাম আল্লাহর গুণাবলী বিশিষ্ট অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীদের নামের অনুকরণ অনুসরণে রাখা হয়েছে। সন্তান জন্মের সাথে সাথে নবজাত শিশুকে শুনিয়ে আযান দেয়ার নিয়ম বাংলাদেশের সামাজিক প্রথায় এখনো প্রচলিত আছে।

মৃত্যু মানুষের জীবনে অবশম্ভাবী পরিণতির শেষ ধাপ। জন্মের পর মানুষের শত আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, ইবাদত-বন্দেগী, জ্ঞান চর্চা, আবিস্কার সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "প্রত্যেক জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[২২] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করলেও।"[২৩] তখনই প্রয়োজন হয় জানাজা দিয়ে কবরস্থ করার। এরূপ স্পর্শকাতর মুহূর্তে প্রয়োজন হয় একজন মাদরাসায় শিক্ষিত ব্যক্তির। যিনি মৃত্যুর সময় মৃত্যুপথ যাত্রী ব্যক্তিকে তওবা পড়াবেন

---

[২১] ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃঃ ৩৮৮।

[২২] সুরাহ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৮৫; সুরাহ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩৫।

[২৩] সুরাহ আন- নিসা, আয়াতঃ ৭৮।

এবং মৃত্যুর পরে জানাজা পড়াবেন। এছাড়া মৃত্যু ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়-স্বজন কোন 'আলিমের শরণাপন্ন হন দোয়া পড়া ও সওয়াব রেসানির জন্য।

মাদরাসা শিক্ষিত 'আলিম ও শিক্ষার্থীগণ সুন্নাতে রাসুল 'আকিদা সম্মতভাবে অবস্থান করেন। তাদের দেখেই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল (সা:)-এর কথা স্মরণ হয়। মানুষের মনের লোভ-লালসা, চাতুরী, জিঘাংসা ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রশমিত হয়। যেখানে দুনিয়ার সফলতার চেয়ে আখিরাতের অন্বেষা বেশি সেরুপ পরিবেশে অন্তর জগতের পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। সুন্নাতে রাসূলের এ গুণাবলী মাদরাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পুরোপুরি ধারণ করলে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যেন পুর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার একটি গুণগত ও মানগত দিকও আছে। আর তা হলো শিক্ষার সমমানে কর্ম সংস্থান পাওয়া। কর্ম সংস্থান পাওয়ার উপরই শিক্ষার সুফল নির্ভর করে।[২৪] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবস্থা সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। অপরদিকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন কোন ক্ষেত্রে মাদরাসার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের থেকে এগিয়ে আছে। তারা সরকারী সুযোগ সুবিধা বেশী পাওয়ার ফলে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তবে মাদরাসা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও পিছিয়ে নেই। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীগণও প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার প্রায় সকল স্তরের চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান যোগ্যতা অর্জন করছে।

একজন মাদরাসার শিক্ষার্থী ছাত্র অবস্থায় লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কাজে জড়িত হতে পারে। মাদরাসার শিক্ষার্থীগণ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং মকতবের শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদ, মাদরাসা ও মকতবের দায়িত্ব মাদরাসার ছাত্র বা শিক্ষকগণই পালন করে থাকেন।[২৫]

একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর সমাজ ও জাতি গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। পিতা মাতার সন্তানকে জন্ম দিয়ে লালন পালন করে বড় করেন আর শিক্ষকগণ এ সন্তানদেরকে লেখাপড়া ও জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আলোকিত সমৃদ্ধ জীবন গঠনের প্রেরণা দেন। সমাজ দেশ ও জাতির

---

[২৪] ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃ: ৩৯৫।

[২৫] ড. মো: আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃ: ৩৯২-৩৯৫।

উন্নতি অগ্রগতিতে শিক্ষকগণ বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকগণ সমাজের মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সুশিক্ষা দিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ফরিদপুর অঞ্চলের 'আলিয়া, কওমী ও হাফিজিয়া মাদরাসা এবং প্রাইমারী, হাইস্কুল ও কলেজসমূহে হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ পেশায় যেমন নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছেন তেমনি সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করছেন।

আমাদের সমাজের জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা একবারে অপ্রতুল। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এক্ষেত্রে এম.বি.বি.এমসহ বিভিন্ন ডিগ্রী নিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ শাখায় পারদর্শী হবার পাশাপাশি কেউ কেউ গ্রাম্য ডাক্তার হিসেবে এ্যালোপ্যাথিক, হেকিমী, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে এ পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন। এ সকল ডাক্তারগণ আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে দেশ ও জাতির প্রভুত সেবা করে যাচ্ছেন। আবার তারা নিজেরাও চিকিৎসা পেশা গ্রহণের ফলে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছেন।[২৬] এতদ্ব্যতীত হেকিমী, ইউনানী ও হোমিও চিকিৎসা চালিয়ে একদিকে আর্ত মানবতার সেবা করছেন অন্য দিকে নিজেরাও স্বচ্ছল জীবিকা নির্বাহ করছেন। অল্পে তুষ্টি তাঁদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে।[২৭]

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাঝারি ও বড় ব্যবসা করে থাকেন। এ ছাড়া পোল্ট্রি ফার্ম, ধান চাউলের মিল-খোলা, মুদির দোকান, কাপড়ের ব্যবসা, বিভিন্ন যানবহানের যন্ত্রাংশের দোকান, মনোহারী দোকান, লাইব্রেরী দোকান, স্টেশনারী দোকান, মাছের চাষ, ও স্টক ব্যবসা ইত্যাদিসহ বিভিন্নভাবে কৃষি কাজে জড়িত রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ– "আমি তো মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।"[২৮] পৃথিবীতে মানুষ যেন সত্য ন্যায়ের পথে চলতে পারে সে জন্য তিনি যুগে যুগে নবী রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করেছেন।[২৯] রাসুল (সাঃ) এর দেখানো পথই সঠিক পথ। আল্লাহর কিতাবসমূহ মানবতার মুক্তির একমাত্র ঠিকানা। পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে তার

---

[২৬] মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, "আর্থ সামাজিক চাহিদা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষা", *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯।

[২৭] মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, "আর্থ সামাজিক চাহিদা পুরণে মাদরাসা শিক্ষা", প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯; Dr.Sekander Ali Ibrahimy, *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987 A.D), pp. 29-32. এম.এ. জব্বার, *শিক্ষনীতি*, ২য় ইউনিট, পৃঃ ২০-২১।

[২৮] সূরাহ তীন, আয়াতঃ ৪।

[২৯] সূরাহ আল বাকারা, আয়াতঃ ১৫১।

বিবেকের স্বাধীনতার কারণে। মানুষ বিবেক বিবেচনার মাধ্যমে ভাল ও মন্দ জিনিসটি জানতে ও বুঝতে পারে। বিবেক ও নৈতিকতা বোধের দ্বারা সে ভালমন্দ পার্থক্য করতে পারে। ভালমন্দ বুঝবার এবোধ শক্তিই হল মানুষের নৈতিকতাবোধ।[৩০] নীতি থেকে নৈতিক শব্দটি এসেছে। যে মানদন্ড বা মূল্যবোধের সাহায্যে মানুষ ভাল-মন্দের বিচার বা যাচাই করতে পারে তাকে নৈতিক মুল্যবোধ বলে।[৩১] আবার মূল্যবোধ হল যে অন্তর্নিহিত অনুভূতি চেতনা, বিশ্বাস ও প্রত্যয় জীবন এবং জগত সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও ধারণা মানুষের সামষ্ঠিক জীবন ধারাকে নীতি নৈতিকতা কর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে।[৩২]

একটি সমাজের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্তহল উন্নত মানের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ। নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের কারণে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সুশিক্ষা একজন মানুষকে মূল্যবোধ এবং দায়িত্ব সচেতন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। সমাজ জীবনে পরিবেশ ও সমাজের পরস্পরের মধ্যে অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জেগে উঠে। ফলে সে ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধ ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়। নিজের দেহ, মন, আত্ম ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। অপরদিকে যথাযথ নৈতিক শিক্ষার অভাবে মানুষ বিবেক বর্জিত কু-প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আখিরাতের জবাবদিহির দৃঢ় প্রত্যয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আচরণ বিধির বাস্তবায়ন ছাড়া নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। ফরিদপুর অঞ্চলের সনাতন শিক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুভূতি ও পরকালের আল্লাহর নিকট জবাবদিহির চেতনাই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও উন্নত চরিত্রবান জনগোষ্ঠী ও সুনাগরিক তৈরী করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিমূলক মানসিকতা তৈরী করে। সুশিক্ষার মূল চেতনা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব।[৩৩]

---

[৩০] Dr. Muhammad Muslehuddin, *Morlity its Concept and role in Islamic Order* (Lahore: Islamic Publication Limited, 1998 A.D), pp. 1-5; ড. এস. হুদা, *নীতি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব* (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮ খ্রি:), পৃ: ৬৯।

[৩১] এ. কি.উ. এম. ছিফাতুল্লাহ, *কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি* (ঢাকা: আর. আই. এস পাবলিকেশন্স, , ২০০১ খ্রি:), পৃ: ৯৯।

[৩২] *প্রাগুক্ত*।

[৩৩] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি:), পৃ: ১০৬-১০৯।

মাদরাসা শিক্ষা ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে চায়। এ আলোকেই একটি ইসলামী সমাজ নির্মাণের রূপরেখা প্রদান করে। সনাতন শিক্ষা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ইসলামী সমাজ নির্মাণের এ কাজে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। ইসলামী মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সমাজ উন্নতি লাভ করবে। শিক্ষা মানুষকে সমাজ পরিচালনা করার জন্য সৎ পথে জীবন যাপন করার জন্য সৃষ্টির উপর দয়া দাক্ষিণ্য এবং ন্যায় বিচার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

কুরআনের বিধি বিধানসমূহ সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন না থাকার ফলে নৈতিক অবক্ষয় মহামারী আকার ধারণ করেছে। নাচ-গান, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেপর্দা, মদ-গাজায় সর্বত্র সয়লাব চলছে। অথচ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষার যথাযথ সমন্বয় না থাকায় শিক্ষিত মানুষের হার বৃদ্ধি ফেলেও নৈতিক অবক্ষয় কমছে না।

ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বচিত সংখ্যক আলীয়া মাদরাসা, কওমী, মাদরাসা, প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজকে আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি, ইতিহাস ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, কোর্স পরিচিতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে ফরিদপুরে জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা জনজীবনে যে প্রভাব ফেলেছে তার মূল্যায়নে দেখা যায়, সনাতন ও মাদরাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিমকে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৫ এবং ১৯৮৭ সালে এস. এস. সি. ও এইচ. এস সির সম্মান দেয়ার ফলে ফরিদপুর জেলার উল্লেখযোগ্য দাখিল আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যন্ত পল্লী গ্রামাঞ্চলেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অত্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। খেটে খাওয়া দরিদ্র ব্যক্তিদের ছেলে মেয়েরা বলতে গেলে ন্যূনতম খরচে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে একদিকে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জীবনের প্রতিষ্ঠান লাভের সুযোগ করতে পেরেছে। ফলে দেখা যায় যে, হাই স্কুলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে দাখিল পর্যন্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে বাস্তবমুখী শিক্ষা লাভ করে মাদরাসা পাশ করা ছাত্রগণ আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার কারণে দেশ ও জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে কোনরূপ অলসতা করছেনা। চারিত্রিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠনে সহায়তা

করে এবং এ কারণে যে কোন কাজ করতে গিয়ে তারা অন্যায় ও অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকে। সাধারণ জনগণও মাদরাসা শিক্ষায় ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের কথা ও কাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফরিদপুর জেলার নির্বাচিত মাদরাসাসমূহের প্রদত্ত তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের প্রচেষ্টায় এসব মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে এবং তাদের সন্তানাদি ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষালাভ করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে এবং ন্যায় নিষ্ঠার সাথে তাদের কর্তব্য পালন করছে। লক্ষণীয় যে, মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী যে সব প্রতিষ্ঠান কর্মরত আছে যেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রশংসিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে জনগোষ্ঠির মধ্যে এবং বিশেষ করে নারীদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে সুশীল সমাজ গঠনের পথ অনেকটা সহজ করে তুলেছে। উপজেলাভিত্তিক কোন কোন মাদরাসার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত করে যে তথ্য বেরিয়ে আসছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তাদের স্বঃস্বঃ অঞ্চলের মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের সন্তান সন্ততিদের কথাবার্তা ও আচরণে ইসলামী জীবন ধারা ও মূল্যবোধের বাস্তব রূপ পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। পূর্বের কর্মশিথিলতা পরিহার করে তাদের শিক্ষার পাশাপাশি শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বৈধ পন্থায় উপার্জন করে পরিবার, সমাজে ও দেশের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করছে। এটি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ফরিদপুরবাসীর ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চল ছাড়াও উপজেলা শহর নগর ও জেলা শহরে মাদরাসা শিক্ষা পূর্বের চেয়ে ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এতে জনগণের ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।

ফরিদপুর জেলার শহর ও নগর ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থায়ী জনগণের অনুদান এবং বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অল্প খরচে শিক্ষালাভ প্রত্যেক অঞ্চলের শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে অবদান রাখছেন। তাদের মধ্যে পৌর ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করছে এবং নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করছে এবং নৈতিক মূল্য বোধে উদ্বুদ্ধ করছে। পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে তরুণ ও যুবকদের মধ্যে আড্ডা দেয়া ও অনর্থক সময় অপচয় করার যে প্রবণতা ছিল তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা অংশ গ্রহণ করছে। স্ব-স্ব অঞ্চলের পরিবেশকে উন্নত করতে এসব কিশোর ও তরুণরা বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এটি ফরিদপুর জেলার জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। ফরিদপুর জেলার প্রত্যেক থানা বা উপজেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক নির্বাচিত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফরিদপুর সদর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশী। এ তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, এ তিনটি মহুকুমায় শিক্ষার হার অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশী। এটি বাস্তব জরিপের ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফরিদপুর জেলায় মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে দাখিল ও আলিম এর উচ্চ শিক্ষার জন্য মোট ৭টি কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১টি ফরিদপুরে, ২টি রাজবাড়ী, ২টি গোপালগঞ্জে, ২টি মাদারীপুর সদরে, ১টি শরিয়তপুরে ড্যামুড্যায় অবস্থিত। এটি মাদরাসায় ইসলামী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষ অবদান রাখছে। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক সিড়ি পেরিয়ে ফরিদপুর জেলায় প্রত্যেক থানায় একাধিক ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেগুলো স্ব স্ব অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এছাড়াও অনার্স ও মাষ্টার্স শিক্ষাক্রমে ফরিদপুর সদরে তিনটি সরকারী কলেজ, রাজবাড়ী ২টি, গোপালগঞ্জ ২টি, শরীয়তপুর ২টি, মাদারীপুর ২টি সরকারী কলেজ আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্র কলেজগুলোতে কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্সে পাঠদান করা হয়ে থাকে। অত্র কলেজগুলোতে স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করায় নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার শেষ পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান ফরিদপুরে অবস্থিত সেগুলো জনগণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে সাড়া জাগিয়েছে এবং জনজীবনের সর্বস্তরে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ফরিদপুর জেলার দরসে নিজামি বা কওমী মাদরাসাগুলো জনজীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। গ্রামে মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। নিম্নবিত্ত মাধ্যম পরিবারের ছেলেমেয়েরা মাদরাসায় লেখাপড়া করে মাদরাসা শিক্ষার হার বৃদ্ধি করেছে। অত্র মাদরাসা গুলো প্রতিষ্ঠা থেকে এলাকার ছেলেরা ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়েছে এবং নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার বীজ বপন করেছে এবং অন্যায় অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

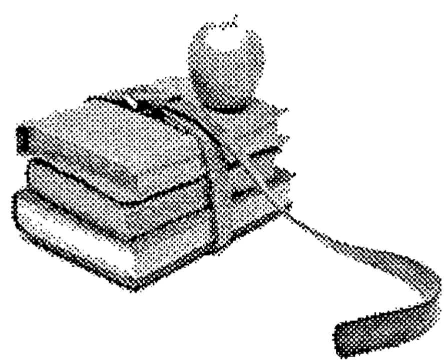

ফরিদপুর বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের অন্যতম। এটি বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটি মূলত বঙ্গোপসাগর থেকে জেগে ওঠা একটি ভূখণ্ড। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ দিকে এ ভূ-খণ্ডে জনবসতি গড়ে ওঠে এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। ফরিদপুর পূর্বে বকদ্বীপ, ধলেশ্বর পরগণা, ভূষণা পরগণা, মোজাফফরাবাদ, জালালপুর, ফতেহাবাদ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। তবে এটি ফতেহাবাদ নামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৫০ সালে ফতেহাবাদ থেকে ফরিদপুর নামকরণ করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর ফরিদপুর জেলা ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জসহ মোট ৫টি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এক অধ্যাদেশ বলে প্রতিটি মহকুমা স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়।

ফরিদপুর বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলাগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জেলা। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, মধুমতি, গড়াই, কুমার, আড়িয়াল খাঁ এ জেলার উল্লেখযোগ্য নদী। এ জেলার দক্ষিণাঞ্চল বিল প্রধান এলাকা। তবে এ জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও বিল, হাওড় ও জলাভূমি রয়েছে। গোপালগঞ্জের মকসুদপুর থানার সমগ্র এলাকাই জলাভমি। এ সমস্ত নদ-নদী, বিল হাওড় ও জলাভূমি ফরিদপুর জেলার জন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলার পশ্চিম ও পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলের স্থলভাগ ও জনবসতি অনেকটা স্থিতিশীল এবং প্রাচীনত্বের দাবীদার। এ জেলার প্রাচীন ভূ-ভাগ এক সময় গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্ম প্রধান ছিল। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বসবাস শুরু হয়। এ জেলায় মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম বিশ্বাসের মানুষের বসবাস রয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এ জেলার লোকবসতি কোন একক এলাকা বা কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী থেকে আগত নয়, বরং নতুন চর জেগে ওঠার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার লোকজন এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্বেই এ অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে আরব বণিকদের আগমন ও বসতি স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়। এছাড়া মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ও পরে আওলিয়া কিরামের মাধ্যমে ফরিদপুর অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়। আওলিয়া কিরাম বিভিন্ন স্থানে খানকার সঙ্গে মসজিদ মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে লোকদেরকে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁরা আদর্শ চরিত্র ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর দ্বারা

মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেন। যে সমস্ত আওলিয়া কিরাম এ অঞ্চলের ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর, শাহ্ সুলতান বলখী, বাবা আদম শহীদ, বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার, শাহ্ আলী বাগদাদী, শাহ্ বদিউদ্দীন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ফরিদপুর মূলত একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। এ জেলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম। এ জেলার মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। হাজী শরীয়তুল্লাহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনৈতিকভাবে ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর এ আন্দোলন বাংলা থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এরপর তাঁর সুযোগ্য সন্তান মহসিন উদ্দীন আহমদ দুদুমিয়া পিতার নীতি অনুসরণ করে সমাজে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া এ জেলার কৃতি সন্তান মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সামজে কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সনাতন শিক্ষা বলতে প্রাচীন শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এ শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হতো। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলায় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা পরিচালিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীলা, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ময়নামতি, লালমাই বিহার মহাস্থানের ভাসুবিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ শাসনামলে বিহার কেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান অর্জন করা জনগণের জন্য খুবই সহজ ছিল। খ্রিষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের শাসনামলে শিক্ষার পরিধি সংকুচিত হয়ে আসে। এ সময় সংস্কৃত ভাষায় উৎকর্ষ সাধিত হয়। এমনকি সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার চর্চা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সেন শাসনের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে বাংলা বিজিত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়। সুলতানগণ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ধর্মীয়, ব্যবহারিক ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়াবলী পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসী, আরবী ও বাংলা। ফারসী রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষ ফরাসী শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসন পর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে অনুসৃত হতো। বৃটিশ শাসনের পর বাংলায় মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা অবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। এসময় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। তবে ১৭৮০

সালে মুসলমানদের জন্য দারসে নিজামিয়া পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদানের জন্য কলকাতায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবতীতে এটি আলিয়া মাদরাসায় রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এর সাথে ইংরেজী শিক্ষা সম্পৃক্ত না হওয়ায় মুসলমানরা সরকারী চাকুরী হতে বঞ্চিত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ১৯১৫ সালে কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করে নিউস্কিম মাদরাসা শিক্ষা চালু করা হয়। এ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা মেট্রিকুলেশন পাশ করার পর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করে। সরকারী চাকুরীতেও তাদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের জন্য আলিয়া ও হাই মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতি সনাতন শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষাক্রম আধুনিক শিক্ষা নামে অভিহিত হয়। পাকিস্তান শাসনামলেও কিছু সংস্কার সাপেক্ষে আধুনিক ও সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে মাদরাসা শিক্ষার উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করা হয় এবং ইহা সাধারণ শিক্ষা সমমানের সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এরপরেও আলিয়া ও কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতিকে সনাতন শিক্ষা এবং সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, ফরিদপুর অঞ্চলের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি ছিল পরিবার কেন্দ্রীক। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে পাঠশালা ও গুরুগৃহে শিক্ষা দেয়া হতো। টোল শিক্ষা ছিল সনাতন শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষাসহ কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ, উপন্যাস, গীতা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হতো। এছাড়া মুসলিম আমলে সনাতন শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল খানকাহ, মক্তব, মাদরাসা, মসজিদ প্রভৃতি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া হতো।

ফরিদপুর অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল ১৮৩৬ সালে একটি ইংলিশ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে দু'জন ইউরোপীয়ান শিক্ষাবিদ পর্যায়ক্রমে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। স্কুলটি আধুনিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে স্কুলটি জেলা স্কুলে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া ১৯৪০ সালে গোয়ালন্দ মহকুমার পদমদীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ফরিদপুর অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। একাডেমীক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এ অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরী শিক্ষার জন্য ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য মুক বধির স্কুলসহ অনেক ক্লাব ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সহায়তার কারণে দ্রুত বিকাশ লাভ করে, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে

সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশ অবনতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। তবে আধুনিক কালের মাদরাসা শিক্ষা সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত হলেও এটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় সনাতন ও আধুনিক উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে। তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করে অগ্রসর হচ্ছে। এমন কি বর্তমানে এটি আধুনিক শিক্ষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন একটি মাদরাসা মক্তবের মাধ্যমে শুরু হলেও পরবর্তীতে মক্তবটি ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরে উন্নীত হয়েছে। মাদরাসাগুলোর অনেক অবকাঠামোগত উন্নয়নও হয়েছে। মক্তব বা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে একটি ছোনের ঘর বা টিনের ঘরে ক্লাস শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে তা পাকা ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে গুটি কয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে মক্তব বা মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার প্রতি মানুষের ধারণা ছিল যে, মাদারাসায় পড়লে শুধু মিলাদ পড়বে এবং মোল্যাগিরী করবে। এ ধরনের হীন ধারণা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কারণ মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই অর্জন করছে না বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়েও তারা যথেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করছে। বর্তমানে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই দাখিল ও আলিম স্তর অতিক্রম করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল, ইঞ্জিরিয়ারিং, কৃষি কলেজসহ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যায়ন করে দেশের সেবায় নিয়েজিত আছে। আবার অনেকেই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করছে। এভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে মাদরাসার ছাত্রী-ছাত্রীরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উপনিবেশিক আমলে মাদরাসা শিক্ষা বহুলাংশে ধ্বংস করা হলেও কলকাতা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ মাদরাসা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান আমলেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পরেও পাঠদান পদ্ধতিতে পাকিস্তান আমলের পাঠ্যসূচীর অনুসরণ করা হতো। সে সময় দাখিল শ্রেণীগুলো দাহম, নাহম, হাশতম, হাফতম নামে পরিচিত ছিল। হাফতম শ্রেণীতে একটি বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সাথে এর কোন মান নির্ধারিত ছিল না। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৫ সালে মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় বিধান করার জন্য নতুন পাঠ্য তালিকা প্রনয়ণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে পুনরায় এ পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা

হয়। এ পরিবর্তন ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৮৫ সালের ৫ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে এবং ১৯৮৭ সালে আলিম স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমমান দেয়া হয়। এছাড়া ২০০৭ সালে ফাযিল ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমমান দেয়া হয়। এভাবে মাদরাসা শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয় এবং এ শিক্ষার মান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সনাতন শিক্ষার অপর একটি প্রতিষ্ঠান হলো কওমী মাদরাসা। বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাগুলো দারুল উলূম দেওবন্দের আদলে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম কওমী মাদরাসা হলো *মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা*। ১৯০১ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও অসংখ্য কওমী মাদরাসা গড়ে ওঠে। ফরিদপুর অঞ্চলেও অসংখ্য কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কওমী মাদরাসায় কেবল কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, কালাম, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, উর্দু ও ফারসী পড়ানো হয়। সাধারণ ও আধুনিক বিষয়গুলো এ মাদরাসার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে সাম্প্রতিককালে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক কিছু বিষয় এ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা কওমী মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত না থাকায় এ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য হারে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। এমনকি এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা নেই। এতে করে দেশের নারী জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কওমী মাদরাসাগুলো দুটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। একটি *আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস* বাংলাদেশ ও অপরটি *বেফাকুল মাদরাসিলিন আরাবিয়া বাংলাদেশ*। সরকারের আওতাবহির্ভূত এ সকল মাদরাসা স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে।

ফরিদপুর জেলায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল ও কলেজগুলোতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার যথেষ্ট পরিবেশগত উন্নয়নও হয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে যে প্রতিষ্ঠানটি টিন ও বাঁশের তৈরী ঘরের মাধ্যমে শুরু করেছিল পরবর্তীতে প্রশাসনের সহযোগিতা ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানসমূহের পাকা ভবন তৈরী হয়েছে। ১৯৭৩ সালে প্রাইমারী স্কুলগুলো সরকারীকরণ করার ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় ফরিদপুর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোযোগী হয় এবং স্কুল মুখী হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে লেখাপড়া শুরু করে।

প্রাইমারী স্কুলের পাশাপাশি বর্তমানে অনেক কেজি স্কুল, ইংরেজী স্কুল ও কিন্ডার গার্ডেন স্কুল গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত স্কুলে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে পাঠদান করানো হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার ল্যাবের ব্যবস্থার রয়েছে। কলেজগুলো শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। বেশ কিছু কলেজে অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রশস্ত হয়েছে। অধিকাংশ কলেজেই আবাসিক সুবিধা থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্বল্প খরচে লেখা পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। এভাবে ফরিদপুর অঞ্চলের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটেছে।

এ গবেষণা পরিচালনা করার সময়কার লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে,

১. স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোকে প্রাইমারী স্কুলের সমমান করা এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণের মতই ইবতেদায়ী মাদারাসা শিক্ষকদের বেতন স্কেলের ব্যবস্থা করা উচিত।
২. স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসার অবকাঠামো আরো উন্নত হওয়া উচিত।
৩. স্বতন্ত্র মাদরাসার সিলেবাস প্রাইমারী স্কুলের সিলেবাসের সাথে আরো সমন্বিত করতে হবে।
৪. মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণার্থে অতি শিঘ্রই শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী ও দাখিল কোর্সের বিষয়বস্তুকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে হবে।
৬. মাদরাসায় উর্দূ ভাষা শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।
৭. পি.টি.আই গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামিয়াত শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা।
৮. জেলায় অবস্থিত মাদরাসাগুলোর অবস্থান ও সংখ্যাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহকল্পে মাদরাসাগুলোর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জেলা সার্ভে কমিটি গঠন করে মাদরাসার প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা।
৯. বেসরকারী স্কুল কলেজ, মাদরাসার গর্ভর্নিং বোডির সদস্যদের শিক্ষাগতযোগ্যতা বিষয়টি বিবেচনা করা।
১০. বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন কাঠামো আরো উন্নত করা, যাতে সমযোগ্যতা নিয়ে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের বেতনের সমকক্ষ হয়।
১১. গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

১২. মাদরাসাগুলোতে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে ইসলামী শিক্ষার আদর্শ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ও স্বীকৃতমান সম্পন্ন করে উন্নত করার দরকার, যাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ কাংখিত মানের সেবা দানে সক্ষম হয়।

১৩. দক্ষ জনশক্তি তৈরীর উদ্দেশ্যে সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান ও কারিগরিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা উচিত।

১৪. কওমী মাদরাসার শিক্ষাকে সরকারি পরিকল্পনার আওতায় এনে এর আধুনিকীকরণ প্রয়াস চলাতে হবে।

ফরিদপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের জীবনযাত্রার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে শিক্ষার্থীগণ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়েছে। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে আনুগত্য, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা, শিষ্ঠাচার, স্বদেশ প্রেম, পরোপকার, দয়া, ধৈর্য ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ লাভ করেছে। সমাজে হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী প্রভৃতি অপরাধগুলো কম সংগঠিত হচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করেছে। আলিমগণ সমাজের অজ্ঞ ও নিরক্ষরদেরকে মসজিদ ও মক্তবে পবিত্র কুরআন পাঠসহ প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল, হিসাব নিকাশ ও অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। এছাড়া আলিমগণ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন আলোচনা সভা, সামাবেশ ও ওয়াজের ব্যবস্থা করছে। সমাজের কলহ-কোন্দল মেটানোর জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সামাজ সেবামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ডাক্তারগণ রোগী দেখছেন, বিনামূল্যে সেবা করছেন। এছাড়া মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ মৃত ব্যক্তি জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করছে। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ শিশু শিক্ষাসহ বয়স্ক শিক্ষা, হাস-মুরগীর খামার, পশুপালন, দাতব্য চিকিৎসা, কৃষি, বন, মৎস চাষ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রেরণ করছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে শহরের সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব গ্রামাঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। অনেকে দেশের জাতীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে থেকে জনগণের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। সর্বোপরি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি পরিচয় নির্ণয় করা যায়, ফরিদপুর অঞ্চলেও এ বিষয়টি প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

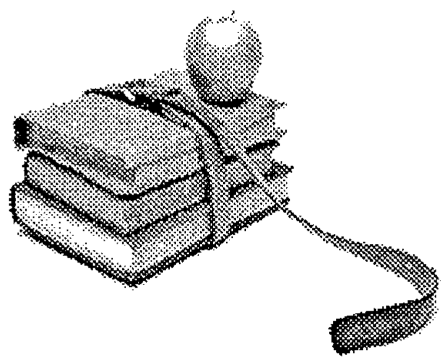

বাংলা উৎস

আনন্দনাথ রায়, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলকাতাঃ কনওয়ালিস স্টীল, কার্তিক, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

আসকার ইবনে শাইখ, *পীর দুদু মিয়া*, ফরিদপুরঃ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০।

আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

আনম আব্দুস সোবহান, *ফরিদপুরের ইতিহাস*, ফরিদপুরঃ সূর্যমুখী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

আব্বাস আলী খাঁন, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ১৯৮৫।

মোঃ আব্দুল করিম, *সুলতানী আমলে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

মুহাম্মদ আলমগীর, *ইসতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আব্দুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

এ কে এম নাজির আহমেদ *বাংলাদেশ ইসলামের আগমন*, ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯।

আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রামঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, অক্টোবর, ১৯৮০।

আবুল হোসেন ভূঞা, *গোপালগঞ্জ শহরের ইতিকথা*, গোপালগঞ্জঃ ছাপাঘর, ১৯৮৯।

আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

আবদুল ওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রুপান্তর*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৬।

আবদুল হক ফরিদী, *মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আবদুল্লাহ আল মূতি, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৬।

আ খ ম আব্দুল মান্নান, *শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষানীতির মূলকথা*, ঢাকাঃ ১৯৭৮।

আফজাল হুসাইন, *শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (তালিম ওয়া তাবরিয়াত)*, ঢাকাঃ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৩।

আ.ফ.ম আব্দুল বারী, *আমাদের শিক্ষার ইতিহাস*, ময়মনসিংঃ এনাম প্রেস, ১৯৭২।

আব্দুল খালেক, *আল কুরআন ও আমাদের সমাজ*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৭৬।

এ কে এম আজহারুল ইসলাম ও শাহ্ হাবীবুর রহমান, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম* যুক্তরাজ্য: দি ইসলামিক একাডেমী, ২০০৩।

এ. কি.উ. এম. ছিফাতুল্লাহ, *কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ও আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি*, ঢাকা: আর. আই. এস পাবলিকেশন্স, ২০০১।

এ কে এম নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: ইসলমিক সেন্টার, ১৯৯৯।

এ জে এম শামসুল হক, *মাদরাসা শিক্ষা*, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ২০০২।

এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ২০০২।

এ কে এম ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ঐতিহ্য*, ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০২।

এম এ জব্বার, *শিক্ষানীতি, ২য় ইউনিট* ঢাকা: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫।

ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

এস হুদা, *নীতি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব*, ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮।

কেদার নাথ মজুমদার, *বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য*, ময়মনসিংহ: নরেন্দ্র মজুমদার, ১৯১৭।

খন্দকার ফজলুল করিম, *ঐতিহাসিক সাতৈর মসজিদ*, ফরিদপুর, ১৯৮৬

খন্দকার আব্দুর রহিম, *টাংগাইলের ইতিহাস*, জেলা প্রশাসক, টাংগাইল, ১৯৭২।

গোরদাস হালদার, *শিক্ষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস* (আধুনিক যুগ), কলিকাতা: ব্যানার্জি পাবলিকেশন, ১৯৯৪।

গোলাম সাকলায়েন, *বাংলদেশে সুফি সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩।

চৌধুরী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, *জেলা পাবনার ইতিহাস*, ঢাকা: ওয়াল্ড এজেন্সী, ১৯৮৬।

জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, চট্টগ্রাম: সমতট, ১৯৯০।

তোফায়েল আহমদ, *যুগে যুগে বাংলাদেশ*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১।

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা: দাশগুপ্ত এন্ড সন্স, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

নীহার রঞ্জন রায, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

নাজমুল করিম, *সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষা*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৯।

নূর মোহাম্মদ, *ইসলাম ও আখলাক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫।

পরিমল ভূষণকর, *সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা: পশ্চিম বংগ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯২।

ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

ফজলুর রশিদ খান, *সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব*, ঢাকা: শিরিন পাবলিকেশনন্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০।

ভিক্ষু সুখী আনন্দ, *বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, (ঢাকা: আজাদ অফিস, ১৯৮৭।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *মোজাহেদে আজম হযরত মাওলানা শামছুল হকের জীবনী*, ফরিদপুর: খাদেমুল ইসলাম জামাত, ১৯৭৯।

মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একোডেমী, ১৯৮২।

মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তান ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স এন্ড কো:, ১৯৪৮।

মঈনুদ্দীন খান আহমদ, *ফরায়েজী আন্দোলন*, অনুবাদক মো: আজিজুল হক খান, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ১৯৮২।

মোহাম্মদ আজিজুল হক, অনুবাদ: মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

মোঃ আবদুর রহিম, *বাংলা মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

মনোয়ার হোসেন, *ঐতিহ্য লালিত ফরিদপুর*, ফরিদপুর: ফরিদপুর মিডিয়া সেন্টার, ২০০০।

মোঃ মতিয়ার রহমান, *রাজবাড়ী জেলা ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: দেশ প্রকাশনী, ২০০০।

মোঃ আসাদুজ্জামান, *যশোর জেলার ইতিহাস*, ঢাকা: কাকলী প্রক ইন্সটিটিউট অব লোকাল গর্ভনমেন্ট প্রকাশনী, ১৯৮৯।

মোঃ আব্দুল করিম, *সুলতানী আমলে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা: জাগরনী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

মোঃ আব্দুস সাত্তার, *তারিখ-ই-মাদরাসা-ই-আলীয়া*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ, ২০০৪।

মুহাম্মদ লুতফুল হক, *ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩।

মাওলানা মুহাম্মদমিয়া, *উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেদাপট*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

মুহামদ মোস্তাফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭।

মোহাম্মদ আজহার আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।

মোঃ আজহার আলী ও বেগম হোসনেয়ারা, *মুসলিম শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২।

মোঃ মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা* (রাজশাহী: বুকস প্যাভিলিয়ন, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬।

মাহমুদা ইসলাম, *সমাজ ও ধর্ম*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭।

রংপুর জেলার ইতিহাস, রংপুর জেলা প্রশাসন, রংপুর, ২০০০।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশরে ইতিহাস*, ১ম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৬।

শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার, *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ, মাওলানা শামছুল হক, ঢাকা: সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৪।

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: কাসুফুল নদী প্রকাশনী, ১৯৩৯।

শহিদুল ইসলাম, *শিক্ষা ভাবনা*, ঢাকা: শিক্ষাবার্তা প্রকাশনী, ২০০১।

শ্রী প্রমোদ বন্ধুসেন গুপ্ত প্রণীত ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় পরিমার্জিত, *সমাজ দর্শন*, কলিকাতা: ব্যান্যার্জি পাবলিশার্স, একাদশ পূর্ণমুদ্রণ, ১৯৮০।

সতীষ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: লেখক সমবায়, ২০০৬ খ্রিঃ।

সৈয়দ ফরিদ আহমাদ, *মাদরাসা-ই-আযম*, বঙ্গানুবাদ মোঃ পিয়ার আলী নাজির, ঢাকা: কাজেমিয়া ফাউন্ডেশন, ১৪০৪ হিজরী।

সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া*, খণ্ড ৬, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ।

সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে রাজনীতি ও ইসলাম*, ঢাকা: কালি কলম প্রকাশনী, ১৩৯৪।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ওপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, ঢাকা: বাংলা একোডেমী, ১৯৮৪।

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, *উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন*, কলিকাতা: রত্না প্রকাশনী, ১৯৭৪।

সেকেন্দার আলী ইব্রাহিমী, *বাংলদেশে ইসলামী শিক্ষা: অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: জাতীয় পাবলিশার্স ১৯৯১।

হযরত মাওলানা উবাইদুল হক (সম্পাদনা পরিষদ), *ফতাওয়া ও মাসাইল*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮০।

হাসান জামান, *ইসলামী শিক্ষা অগ্রগতির পথে*, ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, ২০০৩।

সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের সমাজ দর্শন*, আব্দুল মান্নান তালিব অনুদিত, ঢাকা: শতদল প্রকাশনী, ১৯৭৬।

প্রবন্ধ

অধ্যাপক আবদুল গফুর, *মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)*, প্রকাশ আলামা শামদুল হক ফরিদপুরী (র.) স্মরনিকা, ১৯৮৪।

কাজী আবদুল মান্নান, *বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলন ও বাঙালী সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

মোঃ নিজামউদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ১৯৭১-২০০০*, অপ্রকাশিত এম ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, "আর্থ-সামাজিক চাহিদাপূরণে মাদরাসা শিক্ষা", *ইসলামি ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৩।

মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ফেরদৌস আলম ছিদ্দিকী, "বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ধারা ও প্রকৃতি", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫।

মুহাম্মদ আবদুস সামান, 'ফতেহাবাদ থেকে ফরিদপুর' *স্বরণিকা*, রোটারী ক্লাব, ফরিদপুর।

স্মরণিকা, বার্ষিকী ও সাময়িকী

ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩২ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৩।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫।

ইসলামিক বিশ্বকোষ, ১৪তম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

ইসলামী শিক্ষা সংকলন, ঢাকাঃ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৮৭ ইং।

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন, ঢাকাঃ বিআইসিএস, ১৯৯৭ ইং।

শিক্ষা সেমিনার সংকলন, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইসিএস, ২০০১।

স্মরণিকা, শতবর্ষপুর্তি, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ হাইস্কুল, ১৮৯২-১৯৯২।

শতবর্ষ স্মারক, ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয়, ১৯৯২।

প্রত্যয় বার্ষিকী, ২০০৩, পালং তুলাসার গুরদাস সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, শরীয়তপুর।

সাময়িকী, ২০০১, ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর।

প্রয়াস, বার্ষিকী, ২০০৩, ফরিদপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

রাহাবার, মাদরাসা বাষিকী, সামছুল উলূম মাদরাসা, ফরিদপুর,

বাষিকী, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ।

পদ্মা, রাজন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বার্ষিক ২০০২-২০০৩, ফরিদপুর।

বার্ষিকী ২০০২-২০০৩, সরকারী সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর।

প্রয়াস, রাজবাড়ী সরকারী কলেজ, বার্ষিকী ২০০১-২০০২, রাজবাড়ী।

বার্ষিকী-২০০৫, বঙ্গবন্ধু সরকারী কলেজ, গোপালগঞ্জ।

সৌরভ, সরকারী ইয়াছিন কলেজ, বার্ষিকী- ২০০১-২০০২, ফরিদপুর।

বার্ষিকী- ২০০৫, ফরিদপুর জিলাস্কুল, ফরিদপুর।

বার্ষিকী- ২০০১, ফরিদপুর জিলাস্কুল, ফরিদপুর।

বার্ষিকী- ২০০৫, রাজবাড়ী জিলা স্কুল, রাজবাড়ী।

বার্ষিকী- ১৯৯১, ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর।

রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষা কশিনের রিপোর্ট-১৯৬১।

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার-১৯৭৮।

জাতীয় সেমিনার-১৯৭৬।

শিক্ষা সম্মেলন স্মারক-২০০১।

মাওলানা আকরাম খাঁন কমিটি (১৯৪৯-১৯৫১) রিপোর্ট।

আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি রিপোর্ট, ১৯৫৬।

আতাউর রহমান খাঁন কমিশন, ১৯৫৭।

এস.এ শরীফ কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৯।

হামিদুর শিক্ষানীতি, ১৯৬৬।

নূর খান শিক্ষানীতি, ১৯৬৯।

শামসুল হক, কমিটি শিক্ষানীতি, ১৯৭০।

কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন কমিটি, ১৯৭৬।

অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৭৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ৫.১১.১৯৮৫ তারিখ স্বারক নং শাঃ ৯/৬ এনসি-১৩/৮৪/৭৪১(১১) এর আদেশ।

পরিসংখ্যান

ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা।

জেলা মুহাফিজখানা, ফরিদপুর।

ফরিদপুর জেলা, আঞ্চলিক পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮১।

বাংলাদেশ আদম শুমারী, ১৯৯১; ইউনিয়ন পরিসংখ্যান, ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান, ১৯৯১

বেন বেইস শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯২।

গ্রাম জনসংখ্যা, ফরিদপুর জেলা, পরিসংখ্যান অফিস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৭৪।

ইংরেজী উৎস

A. K. M Yaqub Ali. *Education for Muslim under the Bengal Sultanate*, Islamic Studies, Vol. XXIV, No.4, Islamabad, Pakistan, 1985.

A. K. M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra, (1200-1576) A.D*, Rajshahi: "Shalimar", 1998.

A.C. Hartley, *Final Report of the Rangpur Survey and Settlement Operations*, 1931-1938. Alipore: Bengal Government Press, 1940.

A.H.M Moesen, *Teacher Education in England and East Pakistan*, Mymenshingh: Ruby Press.

A.K.M Yaqub Ali, "Oriental and Western Education in Bogra District: from the second Half of 19th Century to mid 20th Century A.D." *University Grants Commission Research Project*, Rajshahi: Rajshahi University, 1986.

A.K.M Yaqub Ali, *The Education System in British Bengal*, Research Journal, Vol.I, Rajshahi University.

Abdul Manan, *History of Education*, Rajshahi: Rajshahi Population Press.

Abid Ali Khan, *Memories of Gaeur and Pandua*, Calcutta: 1931.

Ahmed, *Inscription of Bengal*, Vol.IV. Rajshahi: Varendara Research Museum, 1960.

Bangladesh District Gazetteer, Vol.-II, Faridpur District, Calcutta, 1913.

Bangladesh District Gazetteer, Vol.-II, Faridpur District, Calcutta, 1923.

Bangladesh District Gazetteer, Vol.-II, Faridpur District, Calcutta, 1933.

Bangladesh District Gazetteer, Vol.-II, Faridpur District, Calcutta, 1947.

Dr. A.H Dani, *Early Muslim Contact with Bengal*, Pakistan: Preredings of the Pakistan Historical Conference, 1951.

Dr. A.K.M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, First Edition, 1983.

Dr. Sekander Ali Ibrahimy. *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal*, Vol.-3, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1985, 86, 87.

Dr. Sekander Ali Ibrahimy. *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal*, Vol.-4, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1986.

Dr. Sekander Ali Ibrahimy. *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal*, Vol.-5. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987.

Edword Gait, *A History of Assam*, Calcutta and Simla: Thackbr Spink & Co. 1926.

Ely Chenoy, *Sociological Perspective*, New York: Random House, 1954 A.D.).

Encyclopaedia of Socials Sciences, Voll.-IX-X, New York: The Macmillan Co, 1959 A.D)

G.W. Allpart, *Personality: A Psychological Interpretation*, Lodon: Constable and Co., 1937 A.D.)

Hans Weher, *Dictionary of modern written Arabic*, New York: spoken language servicesin, 1976.

Imperial Gazetteer of India, Vol.I (Calcutta, 1909.

Improvement of teacher Education. Education Extension Centre, Dhaka.

Iswari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, Vol.II, Dacca: University, 1st Published, 1948.

J.A. Richter, *History of School in India*, London, 1908.

J.N. Sirha, *Introduction to Philosophy*, Calcutta: New central Book Agency Pvt. Ltd., 1998, A.D.).

Jadunath Sarker, *History of Bengal*, Vol.II, Dacca: University, 1st Published, 1948.

Jagadish Narayan Sarker, *Islam in Bengal* (Thirteenth to Nineteenth Century), Calcutta: 1972.

K. Fazli Rabbi, *The origin of the Musalman of Benga Culturel*, 1895.

K.K. Mukharjee, *New Education and its Aspects*, Calcutta: Education Public Press, 1967.

M. Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education*, Dhaka: Polwel printings Press, 1973.

M. Major Basu, *Education in India.* under East India Company.

M. Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, Chittagong: The Mehrub Publication, 1965.

M. Mohar Ali. *The Bengal Reaction of Christian Missionary Activities*, 1855-1857, Dhaka, 1965.

M.A. Larid, *Missionaries and Education in Bengal 1793-1837*, Oxford: University Press, 1972.

M.R. Maciver and Page, *Society*, London: Macmillan Co., 1967 A.D)

Minhaj-I-Siraj, *Tabaqat-I-Nasiri*, Translated by Resursty.

Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslim of Bengal*, Vol. I A, Riyadh: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. First Edition. 1995.

Muhammad Abdur Rahim, *Social and Culture History of Bengal*, Vol. I & II, Karachi: Pakistan Publication House, 1967.

N.G. Majumder, *Inscriptions of Bengal*, Vol-III, Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929.

Nuruk Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteers*, Faridpur, Dhaka: Bangladesh Govt. Ptess, 1977.

Ogburn and Nimkoff, *A Hand Book of Socilogy*, London: Routledge and Kegan poul Ltd, 1960, A.D..

Pradip Kumar Lahiri, *Bengali Muslim Thought* (1818-1947), (Calcutta: K.P.Bagchi and Company, 1991.

Proposal for a new Educaton policy, 1969.

R.C. Majumder, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta: Firmark L. Mukhopadhya, 1960.

S.M Jaffor, *Education in Muslim India*, Delhi: 1973.

Santosh Kumar Das, *The Education System of the Ancient Hindus*, Calcutta: Mitra Press, 1930.

W. Adam, *Report on the state of Education in Bengal*, Calcutta University, 1836.

Willam Adam, *Report on the state of Education in Begal*, Calcutta: University of Calcutta, 1836.

William J. Goode, *The Family*, New Delhi: Prentice Hall of India, 1965, A.D.).

Report

A Hand book of Educational of Statistics of Bangladesh, 1981-82.

Annual Reports of Calcutta Madrasah, 1927-28,1931-32, 1936-37.

Bangladesh population census-1991, District: Madaripur

Bangladesh Populations Cersus-1981, District: Faridpur.

Bengal Education, Code. 1931.

Reoport of the Educationa Reforme Commission, East Pakistan, 1957.

Report of the Calcutta University, University Commission, (Sadler Committee)

Report of the commission on National Education, 1959

Report of the Islamic University (Dr. A Bari) Committee, 1976-77.

Report of the Madrasah Syllabus. Muazzamuddin Committee, 1946-47.

Report of the Madrashah Educaton (Maula Boksh Committee), 1938-41.

পরিশিষ্ট

মানচিত্র

৫০ ০ ৫০ ১০০কিমি
বিমান বন্দর
বিভাগীয় শহর
আন্তর্জাতিক সীমারেখা
জেলা সীমারেখা
নদী
প্রধান সড়কপথ
ব্রড গেজ রেলপথ
মিটার গেজ রেলপথ
বিমানপথ
নদীপথ (বিআইডব্লিউটিএ)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
আরাকান (মায়ানমার)
চিন (মায়ানমার)
তেঁতুলিয়া
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
দিনাজপুর
রংপুর
কুড়িগ্রাম
তিস্তা নদী
নওগাঁ
নবাবগঞ্জ
বগুড়া
রাজশাহী
গঙ্গা নদী
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঝিনাইদহ
যশোর
বেনাপোল
খুলনা
ফরিদপুর
গোপালগঞ্জ
বরিশাল
পটুয়াখালী
ভোলা
শেরপুর
নেত্রকোনা
ময়মনসিংহ
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
পদ্মা নদী
চাঁদপুর
কুমিল্লা
ফেনী
নোয়াখালী
সন্দীপ
হাতিয়া
নিঝুম দ্বীপ
কুয়াকাটা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
তামাবিল
হবিগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ
মৌলভীবাজার
খাগড়াছড়ি
কাপ্তাই লেক
রাঙ্গামাটি
চট্টগ্রাম
বান্দরবান
মহেশখালী
কক্সবাজার
টেকনাফ
সেন্টমার্টিন দ্বীপ
সু ন্দ র ব ন
ব ঙ্গো প সা গ র

মানচিত্র ১: বাংলাদেশ

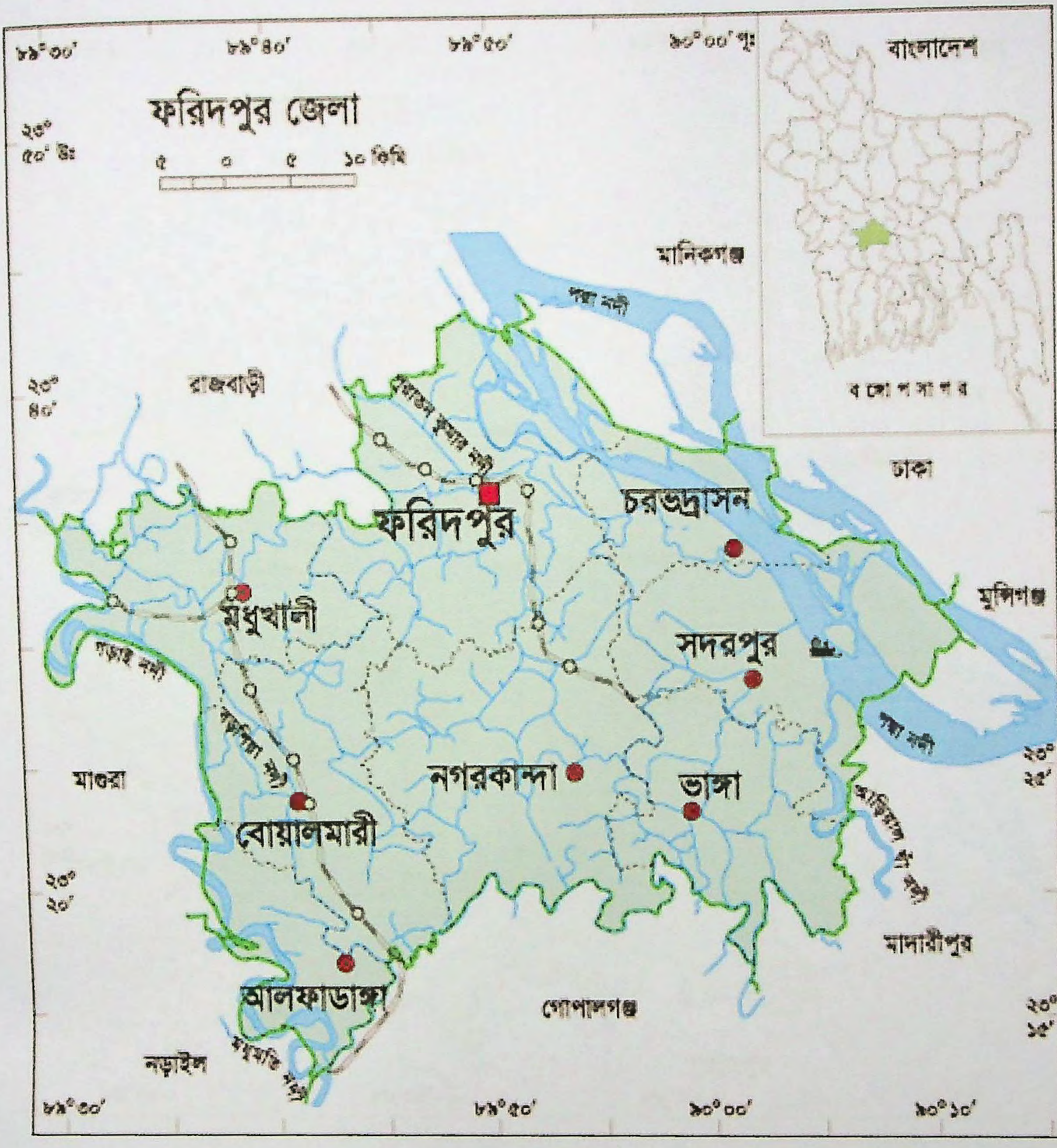

মানচিত্র ২: ফরিদপুর জেলা

মানচিত্র ৩: রাজবাড়ী জেলা

মানচিত্র ৪: মাদারীপুর জেলা

মানচিত্র ৫: শরিয়তপুর জেলা

মানচিত্র ৬: গোপালগঞ্জ জেলা

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No. D-2971
Date....12/8/09.....